৩ ৪

আমাদের

বিজ্ঞান জগৎ

ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা / দ্বিতীয় বর্ষ / ১৯৮৩

সংখ্যা : পরিবেশ দূষণ সমস্যা



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ



আমাদের বিজ্ঞান জগৎ

২য় বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা | ত্রৈমাসিক | সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৮৩

Appd for ISES
27/7/91

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

লেখকের প্রতি

1. ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে চারিদিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে। দুটি লাইনের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রাখতে হবে। লাইনটানা কাগজে লিখতে হলে দুটি লাইন লেখার মধ্যে একটি লাইন খালি রাখতে হবে।

2. প্রবন্ধের প্রথমে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা প্রয়োজন।

3. আধুনিক বানান পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। লেখার মধ্যে সর্বত্র একই বানান অনুসরণ করতে হবে। সর্বত্র ইংরেজি সংখ্যা সূচক (English numerical) ব্যবহার করতে হবে। লেখার ভাষা সর্বসাধারণের উপযুক্ত এবং লেখার ভঙ্গি সরল ও সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন।

4. লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (লাইন ড্রয়িং / হাফটোন) থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি ছবি (figure), রেখাচিত্র (graph) ও ছকের (table) সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (caption) থাকা প্রয়োজন। প্রবন্ধের ভিতর কোন জায়গায় কত নম্বর ছবি বসবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। রেখাচিত্রে বিষয়টি বর্ণিত হলে তার ছক দেবার প্রয়োজন নেই। ছবি, রেখাচিত্র, ছক বা রচনার কোন অংশ অন্য কোন বই থেকে গৃহীত হলে তার স্বীকৃতি অতি অবশ্য জানাতে হবে। প্রবন্ধে তথ্যসূত্র (reference) হিসেবে ব্যবহৃত পুস্তক বা পত্রিকার নাম উল্লেখ করতে হবে।

5. রচনার কপি রেখে পাঠাতে হবে। রচনা হারালে বা নষ্ট হলে রাজ্য পুস্তক পর্ষদ দায়ী থাকবে না।

6. প্রতিটি রচনা উপযুক্ত পর্যবেক্ষক ও সমালোচকের দ্বারা পরীক্ষার পর রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হ'লে প্রকাশিত হবে। লেখকদের প্রবন্ধের জন্য সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হবে।

7. রচনা গ্রহণযোগ্য কিংবা নয়— এটা যথাশীঘ্র রচয়িতাকে জানান হবে। প্রাপ্তি সংবাদ জানতে হলে লেখক যেন তাঁর ঠিকানা লেখা স্ট্যাম্পযুক্ত একটি খাম তাঁর রচনার সঙ্গে পাঠিয়ে দেন।

ব্যবসা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্য প্রশাসন আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আর্য ম্যানসন, (নবমতল), ৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলিকাতা-৭০০০১৩, ফোন—২৬-৭৮৫৪

আমাদের কথা

বিজ্ঞান জগতের তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা একত্রে পরিবেশ দূষণ ও তার সমস্যা বিষয়ক আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হ'ল। পত্রিকার রেজিস্ট্রেশনের কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পত্রিকার নাম পাল্টাতে হ'ল। বর্তমান সংখ্যা থেকে এই পত্রিকা 'আমাদের বিজ্ঞান জগৎ' নামে পরিচিত হবে। পূর্বের সংখ্যাগুলির মত এই বিশেষ সংখ্যাটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলে কৃতার্থ বোধ করব।

পরিবেশ নিয়ে ভাবনা

বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে দিয়েছে অপরিসীম ক্ষমতা। প্রাকৃতিক সম্পদের দরজা মানুষের কাছে অবারিত। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিষয়ক কলাকৌশল মানুষ এমনভাবে আয়ত্ব করেছে যে আক্ষরিকভাবেই সে পর্বতকে স্থানান্তরিত করতে পারে, নদীর গতিপথ পাল্টে দিতে পারে, নতুন সমুদ্র সৃষ্টি এবং মরুভূমিকে মরুদ্যানে রূপান্তরিত করতে পারে, মহাকাশে পাড়ি জমাতে পারে; বিশ্বপ্রকৃতি প্রায় তার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। কিন্তু এই ক্ষমতার যথেচ্ছ ও অবিবেচনা প্রসূত ব্যবহার পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবনের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলতে পারে। প্রযুক্তিবিদেরা প্রকৃতির যা কিছু সম্পদ আছে তা আহরণ করে নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার পথ গ্রহণ করার পক্ষপাতী। কিন্তু জীবক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষিত না হলে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসবে—এই বলে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন তাকে অস্বীকার করে প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে প্রকৃতি লুণ্ঠন করার নীতি গ্রহণ ইতিমধ্যেই পরিবেশ দূষণের সমস্যা নিয়ে এসেছে। বিংশ শতাব্দীতে শিল্পায়ন, নগরায়ন, বিভিন্ন শক্তির ব্যবহার, খনিজ সম্পদ আহরণ, কাঁচামালের যথেচ্ছ ব্যবহার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যবসায়িক কারণে উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের বিনাশ—ইত্যাদি শুধু যে পরিবেশ দূষণের সমস্যাই সৃষ্টি করছে তাই নয়, জীবক্ষেত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে বিপদ ডেকে আনছে। আজ তাই পরিবেশ দূষণ সমস্যা ও তার প্রতিকারের দিকে বাধ্য হয়েই সকলকে নজর দিতে হচ্ছে।

উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলি পরিবেশ দূষণ রোধে বিভিন্ন ধরণের উপায় অবলম্বন করেছে। ফলে লণ্ডনের মত বিভিন্ন শহর প্রায় দূষণ মুক্ত হতে পেরেছে। উন্নতিশীল দেশগুলিতে কিন্তু এই ধরণের বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক কৌশল আয়ত্ব না থাকায় পরিবেশ দূষণের সমস্যা প্রকট। বিশেষজ্ঞের মতে উন্নতিশীল দেশগুলিতে গড়ে প্রতি বছর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমি ভূমিক্ষয়ের দরুন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের বনভূমিতে প্রতি দুই থেকে আড়াই মিনিটের মধ্যে এক হেক্টর এলাকা বৃক্ষশূন্য করে ফেলা হচ্ছে। এই গতিতে ধ্বংস অব্যাহত থাকলে এই গ্রহের ক্রান্তীয় অঞ্চলের সম্পূর্ণ বনভূমি বর্তমান শতকের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। এর কারণ হিসাবে সাধারণতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও স্থানীয় লোকেদের অজ্ঞতা ও প্রকৃতি লুণ্ঠনের প্রবণতার কথা বলা হয়ে থাকে। তা ঠিক নয়। আসলে উন্নত দেশগুলির বহুজাতিক ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি এই সব দেশে একচেটিয়া ব্যবসায়ের সুযোগে নির্মম ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, লাটিন আমেরিকা, আফ্রিকার দেশগুলিতে এই ধরণের লুণ্ঠন প্রকট। গত দশ বছরে থাইল্যাণ্ড চার ভাগের এক ভাগ বনভূমি হারিয়েছে, ফিলিপাইন্‌স গত পাঁচ বছরে বনভূমির 14 শতাংশ হারিয়েছে, লাতিন আমেরিকায় বিশেষ করে আমাজনীয় বনভূমিতেও একই ছবির পুনরাবৃত্তি। মাত্র 20 বছরের মধ্যই সমস্ত বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অথচ বনাঞ্চল নতুন করে সৃষ্টি

হতে লাগে একশত বছর। পশ্চিমী বহুজাতিক সংস্থাগুলির কার্যকলাপের ফলে বিস্তির্ণ অঞ্চল জুড়ে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ পরিবর্তন, আবহাওয়া পরিবর্তন, বিপুল সংখ্যক জীবজন্তু ও মাছের অবলুপ্তি এবং মৃত্তিকার ক্ষতিকর রাসায়নিক পরিবর্তন জনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

এই বহুজাতিক সংস্থাগুলির যথেচ্ছ খনিজ সম্পদ আহরণের ফলে চিলি ও মেক্সিকোকে নানা রকম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড বহুজাতিক সংস্থাগুলির ওপেন কাষ্ট অপারেশনের ফলে অন্ততঃপক্ষে 4,00,000 হেক্টর উর্বর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আসলে বহুজাতিক সংস্থাগুলি উন্নতিশীল দেশগুলির পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে যথাযথ আইনের অভাবের সুযোগ নিয়ে কেবলমাত্র নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। নিকারাগুয়ার Institute of Natural Resources জানিয়েছেন যে একটি আমেরিক্যান কেমিকেল কর্পোরেশন গত 12 বছর ধরে 2 থেকে 4 টন পারদ (mercury) প্রতি বছর ম্যানাগুয়া হ্রদে ফেলেছে এবং এর ফলে হ্রদের মাছগুলি খাওয়ার একেবারে অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। এই রকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে। পশ্চিমী দেশগুলি উত্তেজক দ্রব্য, দুর্লভ বন্যজন্তু, মাছ, চারাগাছ ইত্যাদি উন্নতশীল দেশগুলি থেকে সংগ্রহ করে এবং পরিবেশ দূষিত করে। 1976-এ যুক্তরাষ্ট্র 32 মিলিয়ন চামড়া, 91 মিলিয়ন বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে তৈরী জিনিষপত্র এবং 1977-এ 450,000 দুষ্প্রাপ্য পাখী এই সব দেশ থেকে আমদানি করে*। এই ধরণের ব্যবসা নিঃসন্দেহে হাজার হাজার বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছে। বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকার প্রয়োজনেই এত সব বলা। অনেকেই জানেন এই বহুজাতিক সংস্থাগুলি আফ্রিকার অন্যান্য দেশে কেমন করে বেবীফুডের প্রচলন করেছে, যে বেবীফুড নিজেদের দেশে তারা ব্যবহার করে না। যে ওষুধপত্র তারা ব্যবহার করে না তাই তারা অন্য দেশে চালায়।

বর্তমানে উন্নতিশীল দেশগুলি পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছে। ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে পরিবেশ দপ্তর গঠন করা হয়েছে। পরিবেশ দূষণ রোধে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এই সুবাদে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। অনেক সময় পুরোন বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর (ধ্বংস হয় মানুষের দ্বারাই নিছক ঝোঁকের লোভের বশে এবং পরিবেশ সচেতনতার অভাবে) যে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি করা হয় তাতে নতুন ধরনের গাছ লাগানো হয়। এতে পূর্বের প্রাকৃতিক অবস্থা বিশেষ করে পূর্বের বনাঞ্চলে যে পাখী বা জীব-জন্তু থাকতে পারত নতুন সৃষ্ট বনাঞ্চলে থাকতে পারবে কিনা ভেবে দেখা দরকার, কোন নতুন কারখানার প্রয়োজনে যে গভীর নলকূপ খোঁড়া হয় তার ফলে কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত অগভীর নলকূপগুলি অদূর ভবিষ্যতে অকেজো হয়ে যাবে কিনা তাও ভেবে দেখা দরকার। পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে বনাঞ্চল সৃষ্টি, কলকারখানা স্থাপন, নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের কথা চিন্তা করে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে চলা তখনই সম্ভব যখন একটি দেশ আর্থিক ও অন্যান্য সর্বদিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিদেশী প্রভাবমুক্ত। দেশী ও বেদেশী পুঁজি শক্তিশালী থাকলে তারা মুনাফার জন্য নির্মমভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করে জীবনের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলবে। পরিবেশ দূষণ সমস্যা মোকাবিলা প্রশ্নটি স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রেখে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সুখের কথা এই মানুষ আজ বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে তাদের ক্রিয়াকলাপ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশ জীবক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা এবং

* তথ্যগুলি 'সোভিয়েট ল্যাণ্ড' পত্রিকার অগাষ্ট 1983 সংখ্যা থেকে গৃহীত।

পরিবেশ দূষণ থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছে। আমাদের দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশ দূষণ বিরোধী এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়। দূষণমুক্ত সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কে না চায়।

এই সংখ্যায় বিশিষ্ট গবেষক ও বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দেশ, বিদেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গগুলি থেকে পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতার যেমন একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে তেমনি তার থেকে মুক্তি পাবার উপায়গুলিও খুঁজে পাওয়া যাবে।

পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করার জন্য সম্পাদকমণ্ডলী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

দিব্যেন্দু হোতা
কার্যনির্বাহী সম্পাদক

পরিবেশ সম্পর্কে সামগ্রিক উপলব্ধি

সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়

ভিতরে কঠিন পৃথিবীর শিলাস্তর, অব্যবহিত উপরে অপেক্ষাকৃত পাতলা একটি জল ও বাতাসের আবরণ তার বাহিরে প্রায় অসীম শূন্য আকাশ। শিলাস্তরের অভ্যন্তরে সামান্য অংশ আর ঐ জল ও বাতাস নিয়ে যে ক্ষেত্রটি সীমায়িত করা যায় তাকে আশ্রয় করেই উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং অবশেষে বিনাশ। এই সৃষ্টিকর্মের জন্যে প্রয়োজন শক্তির উৎস হল সূর্য। পৃথিবীর জন্মকালে জল বাতাস আলোর পরিবেশ প্রাণরক্ষার অনুকূল ছিল না। সেই কারণে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হয়েছিল জলের তলায়, সমুদ্রে। বিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর স্থলদেশ প্রাণ সৃষ্টি ও রক্ষার পক্ষে উপযুক্ত হতে আরম্ভ করল। প্রথমে উদ্ভিদ পরে ছোট ছোট এবং পরে বৃহদাকার প্রাণীর সৃষ্টি হল। এমনি করে পাঁচ শ' কোটি বছর লাগল মানুষের উপযোগী পরিবেশ তৈরী হতে। জল বাতাস আলোর পরিবেশ থেকে ক্রমশঃ তৈরী হল জল বাতাস আলো উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের পরিবেশ। সেখানে নিত্য সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ কর্ম চলেছে মন্দ গতিতে, যাতে করে প্রত্যেকটি পরিবর্তন ধাপে ধাপে এগোতে পারে, এবং নূতন সৃষ্টি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে অথবা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। হঠাৎ বড় রকমের পরিবর্তন যে হয় নি তা নয়, তখন ঘটেছে প্রলয় এবং উলট-পালট তার পরে পরিবেশে এসেছে স্থিতি, পুনরায় নূতন সৃষ্টির পালা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলার মতন পরিবেশের মধ্যে ব্যবস্থা নেই। যেখানেই দেখা যায় পরিবর্তন দ্রুত ঘটেছে, হয়েছে প্রলয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি এবং সেখানে শক্তি ব্যয়িত হয়েছে অত্যুচ্চ মাত্রায়। তাকে বলা হয় অপ্রাকৃতিক, কারণ প্রকৃতির নীতি হল স্থির ও মন্দ গতিতে বিবর্তন আনয়ন করা। এইজন্যেই বলা যায় যে জীবনক্ষেত্রটি (biosphere) সীমায়িত, সেখানে বস্তুর সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ চক্রাকারে চলে এবং নানাবিধ বিক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শক্তি সংগ্রহ করে সূর্যের আলো থেকে।

সৃষ্টি ও স্থিতিকর্মে বস্তুসামগ্রী ও পৌষ্টিক এবং শক্তির প্রয়োজন মেটে পরিবেশের ভাঙন-গড়নের মাধ্যমে। সুতরাং পরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদানের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক রয়েছে তা প্রধানতঃ পারস্পরিক বিনিময়ের ভিত্তির উপর রচিত। সৃষ্টিস্থিতিবিনাশচক্র নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যে এবং নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্যে। প্রকৃতিকে যদি তার নিজস্ব ধারায় চলতে দেওয়া যেত, তা হলে কচিৎ তার রীতিনীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটলেও এমন সংকটের সম্মুখীন হতে হত না যার প্রতিকার প্রকৃতির সামর্থ্যের বাইরে।

দশ হাজার বছর আগেও যে অল্পসংখ্যক জীবজন্তু ছিল তাদের ভরণপোষণের পক্ষে প্রকৃতিজাত খাদ্যই যথেষ্ট ছিল। সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের অভাব ঘটলে তারা অন্যত্র চলে যেত, পূর্ব অধ্যুষিত অঞ্চল যাতে পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। কৃষিবিদ্যা জানার পর থেকেই সংকটের শুরু। প্রথমতঃ মানুষের যাযাবর বৃত্তি সীমাবদ্ধ হল এবং খাদ্যের অভাব দূর হওয়াতে বংশবৃদ্ধির প্রধান বাধা রইল না। তাৎক্ষণিক সংকটের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে সে পরিবেশকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে লাগল, যার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হল এবং চক্রাকারে যে-বস্তু ও শক্তির বিনিময় ও রূপান্তর জাগতিক প্রক্রিয়াকে চিরন্তনতা দিয়েছিল তা ব্যাহত হল। মানুষ ক্রমশঃ তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করল এবং দায়িত্ব গ্রহণ করল। পরিবেশের সঙ্গে আর সখ্য ও বিনিময়ের সম্পর্ক রইল না, প্রতিষ্ঠিত হল দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক। ক্রমশঃ সে পরিবেশের বস্তু ও শক্তি সংক্রান্ত সব রকম ন্যায়নীতি ভঙ্গ করতে লাগল, অন্য সকল উপাদানকে অগ্রাহ্য করে মানুষ নিজের বংশবৃদ্ধি ও প্রয়োজনের মাত্রা বাড়াতে থাকল। উদ্ভূত সংকটের প্রকৃতি ও পরিণতি নিয়ে বিজ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করল এবং সংকট সমাধানের পথনির্দেশ করল। তা সত্ত্বেও পরিবেশ লুণ্ঠন প্রবৃত্তি হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধিই পেতে থাকল।

বিংশ শতাব্দীতে মানুষ জীবক্ষেত্র জয় করে পৃথিবী যে তার একারই বাসস্থান এটিই ঘোষণা করেছে। তার মস্তিষ্কের ক্ষমতাই তাকে এই প্রভুত্বের অধিকার দিয়েছে। সে বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক ক্ষমতায় বলীয়ান এবং মনে করে যে সে সকল প্রতিকূলতা দূর করে তার অভাব ও প্রয়োজন মেটাতে পারে। এই দাম্ভিকতার পরিণাম এই হয়েছে সে দিশেহারা বোধ করছে। মানুষ-কেন্দ্রিক পৃথিবীতে সে কোটি কোটি বছরের পারস্পরিক সহযোগিতার অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে, না তার পুরানো দিনের সহমর্মী সহকর্মিদের সখ্য ও সহানুভূতির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবে। বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক বিদ্যায় পারদর্শিতা এত অগ্রসর লাভ করেছে যে তার পক্ষে এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তিবিদ্ ইঞ্জিনিয়ার বলে যে প্রকৃতির সম্পদ আয়ত্তে এনে সব রকম

প্রয়োজন মেটানো যাবে আর পরিবেশ বিজ্ঞানীর ধারণা যে প্রকৃতিকে অধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে তার সঙ্গে সখ্য ভাব রাখাই বাঞ্ছনীয়, তার জন্যে হয়ত প্রয়োজনের অবাধবৃদ্ধি রোধ করতে হবে। এই দুই পন্থার বিরোধ উপলক্ষ্য করেই 1972 সালের জুন মাসের স্টকহোমে এক উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন থেকেই পরিবেশ সচেতনতা ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সারা বিশ্বে সাড়া পড়ে যায়। তার ঢেউ ক্রমশঃ বৃহদাকার ধারণ করেছে।

প্রাণিজগতের সকল সদস্যই প্রাণ বাঁচাতে এবং বংশবৃদ্ধির জন্যে পরিবেশ পরিবর্তন করতে বাধ্য। কিন্তু মানুষ তার মস্তিষ্কের ক্ষমতার এবং হাতের অঙ্গুলি চালনায় দক্ষতা অর্জনের ফলে প্রাণিজগতের আর সকলকে হার মানিয়েছে। কৃষিবিদ্যার প্রয়োগকল্পে সে ভূমি অধিকার করে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ এবং তার উপর নির্ভরশীল জীবজন্তুর বিনাশ সাধন দ্রুততর করেছে। পরিবেশ বিনাশের এই হল প্রথম পদক্ষেপ। যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের উপর ভিত্তি করে পরিবেশ তার প্রত্যেকটি সদস্যকে সমাদরে রাখতে পেরেছিল, মানুষের লুব্ধতা সেই গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন করে দিল। মানুষ যে-সব শস্য নিজের প্রয়োজন মেটাতে পরিবেশের মধ্যে নিয়ে এলো তারা মানুষের পরিচর্যা ব্যতীত বাঁচতে পারে না। মানুষ গরুর প্রাকৃতিক অবস্থাকে রূপান্তরিত করে একটি চলমান দুধের কারখানা তৈরী করেছে। ফলে, গরু তার রোগপ্রতিরোধ এবং খাদ্য নির্বাচন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

মানুষের অগ্রগতির পরবর্তী অধ্যায় হল শিল্পপ্রসার; ফলশ্রুতি, এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি। মুখ্য লক্ষ্য মানুষের নূতন নূতন প্রয়োজন মেটান। মানুষ বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সেচের জল সরবরাহের জন্যে বাঁধ তৈরী করেছে, তাতে প্রাকৃতিক জল-নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ হয়েছে এবং বৃহৎ অঞ্চল জলপ্লাবিত করে সেখানকার জলের লেভেল সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। কারখানায় তৈরী বস্তুসামগ্রী মানুষের এক ধরনের চাহিদা মিটিয়েছে বটে কিন্তু নির্গত ধোঁয়া, নিষ্কাশিত আবর্জনা বাতাস ও জল দূষিত করেছে; ফলশ্রুতি, নানাবিধ নূতন রোগের আবির্ভাব এবং অসুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি। শিল্পপ্রসারের পরিণতি নূতন নূতন শহর তৈরী, তার জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ, যেমন কাঠ, ধাতব পদার্থ, ইঁট ইত্যাদি। এর সব কয়টিই পরিবেশ থেকে আহরণ করতে হয়। ফলে, পরিবেশের উপর চলে যথেচ্ছ অত্যাচার ও অবমাননা। বনসম্পদ ধ্বংসের পথে, ধাতব বস্তু ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, উর্বর মৃত্তিকার ঘটছে অবক্ষয়। প্রকৃতিতে চল্লিশ হাজারের উপর উদ্ভিদ রয়েছে, কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে লাগে যে কয় ডজন তারাই ক্রমশঃ সমগ্রভূমি জুড়ে রয়েছে, বাকিরা থাকল কি অবলুপ্ত হল সে নিয়ে তার ভাবনাচিন্তা নেই। গুটিকয়েক পশুর জন্যে মানুষ মাথা ঘামায়, তাদের মধ্যে কিছু গৃহপালিত 'পেট্', বাকি খাদ্য জোগায়। কত হাজার হাজার জীবজন্তু যে মানুষের উদগ্র প্রয়োজনের চাপে লুপ্ত হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু তাই নয়; মানুষ নিজের খাদ্য সুরক্ষার জন্যে এবং কীটপতঙ্গ ও অবাঞ্ছিত আগাছার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাঁচানর জন্যে সে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। তার ফলে পরিবেশ অধিকতর দূষিত হতে লাগল। অথচ প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদ জীবজন্তু এমন কি কীটপতঙ্গ সবাই শরীক। সুতরাং এদের অভাবে এক নূতন পরিবেশের সৃষ্টি হল। মানুষের কাঠের প্রয়োজন মেটাতে সে বনধ্বংস ক'রে শুধু সেই ধরনের গাছ লাগাতে থাকল যারা দ্রুতবৃদ্ধি পায়। এইভাবে আদিম পরি-বেশের উপযুক্ত গাছপালার ঘটলো উচ্ছেদ, তার জায়গায় জুটলো এসে নূতন গাছপালা এবং ঘটল পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্তন।

শিল্পপ্রসারের আর একটি আনুষঙ্গিক হল দ্রুতগতি যান-বাহন এবং যন্ত্রাদির ব্যবহার। তার জন্যে কোন না কোন রকমে হয় পেট্রোলিয়াম, নয় তো কয়লা পোড়াতেই হয়। বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রাদির জন্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্রধান সম্পদ হল ঐ পেট্রোলিয়াম এবং কয়লা। এইসব জ্বালানির মুখ্য উপাদান কার্বন এবং ব্যবহারের শেষে কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়; তাছাড়া ধোঁয়ার সাথে কার্বনকণা এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্যান্সারধর্মী রাসায়নিক দ্রব্যাদিও নির্গত হয়। শহরাঞ্চলে যে হারে পেট্রোল চালিত গাড়ীর সংখ্যা বাড়ছে তাতে লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটছে ও রোগাক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পৃথিবীতে যে হারে ঘটছে তাতে খাদ্য-বস্ত্র আশ্রয়স্থলের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে এবং পরি-পরিবেশকে অধিকতর হারে এই বিরাট প্রয়োজন মেটাবার ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে; ততই পরিবেশকে পুনরুজ্জীবিত করার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে। বস্তুতঃ পক্ষে অনেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশকে বিপর্যস্ত করার প্রধানতম কারণরূপে চিহ্নিত করে থাকে। অতএব পরিবেশ সংরক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায় হল জনসংখ্যা বাড়তে না দেওয়া। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা পরিপোষণ ক্ষমতা যতই বাড়ান যাক না কেন, তাকে জনসংখ্যার সঙ্গে তাল রাখতে গেলে "দ্বিগুণ করার সময়ও" সমান হতে হবে। তা কখনও সম্ভব হ'বে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করে না। তাছাড়া পৃথিবীর সীমিত সম্পদের কথা স্মরণ রাখতে হবে।

সংক্রামক ব্যাধি, খাদ্যাভাব অথবা দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ জনসংখ্যা কতখানি কমাতে পারে তার হিসাব করা সম্ভব নয়। সুতরাং জন-সংখ্যার বৃদ্ধি ও হ্রাস সংক্রান্ত নিয়মাবলী মানুষের এখনও অজ্ঞাত। অন্যান্য প্রাণি এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান আরও সীমিত। বস্তুতঃ পরিবেশ সংরক্ষণ করার উপায় এবং পদ্ধতি নিয়ে আন্দাজ করা যেতে পারে, নিশ্চিত পন্থা অনুসরণ করার মতো অথবা সামগ্রিক প্রকল্প তৈরী করার মতো তথ্য জানা নেই। যুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে এই অনিশ্চয়তা আরও বেড়ে গেছে। পারমাণবিক অস্ত্র, কিম্বা রাসায়নিক এবং বীজাণুকে যুদ্ধাস্ত্ররূপে প্রয়োগ করা হলে পৃথিবীর পরিবেশ কীভাবে বিপর্যস্ত হবে, তা ধারণার বাইরে। যুযুধান রাষ্ট্রগুলি সবরকম যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করে চলেছে। কার গুদামে কত মজুত জানা নেই। কিন্তু অনুমান করা হয় যে, মজুত রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করেই চার হাজার গুণ পৃথিবীর জনসংখ্যা হত ও আহত করা যেতে পারে। পারমাণবিক যুদ্ধের (এমন কি শান্তিকালীন পার-মাণবিক শক্তি ব্যবহারের) ফলশ্রুতি তেজস্ক্রিয় রশ্মি এবং তেজস্ক্রিয় মৌল। তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব বিভিন্ন জাতের প্রাণি ও উদ্ভিদের উপর বিভিন্ন। প্রায়শঃ দেখা যায় যে উপকারী কীটের তেজস্ক্রিয়তার প্রবণতা ক্ষতিকারী কীটের থেকে

অধিকতর। তার ফলে মাত্রার উপর নির্ভর করে, তেজস্ক্রিয় রশ্মি ক্ষতিকারী কীটের সংখ্যা হঠাৎ বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। অন্যদিকে তেজস্ক্রিয় মৌল অল্পমাত্রায় জলে বা খাদ্যে মিশে থাকলেও কোন কোন মৌল দেহমধ্যে সঞ্চিত হতে পারে এবং ক্ষতিসাধন করতে পারে। এই সম্পর্কে তথ্য এখনও সীমিত।

মানুষ তার বহু পুরাতন ও পরিচিত জীবক্ষেত্রে (biosphere) থেকে বহুদূরে সরে গেছে—তৈরী করেছে একটি মনঃক্ষেত্র (noösphere)—বিদ্যাবুদ্ধির বৈভবে সৃষ্ট একটি নূতন পরিবেশ। আত্মসমালোচনা তাকে ভাবতে শিখিয়েছে পথ ত' ঠিক মনে হচ্ছে না। কিন্তু ফিরে যাওয়ার পথ থাকলেও সঠিক জানা নেই। অতিশূন্য সুস্থিত অবস্থা মানুষের চিন্তার মধ্যে নেই। পরিবর্তনই প্রাকৃতিক নিয়ম। মনে হয় মানুষ প্রকৃতিকে শাসন করার রীতিনীতি জানার অনেক আগেই শাসনভার নিয়ে ফেলেছে। মানুষ পরমাণু ভেঙে তার শক্তিকে ব্যবহার করেছে, মহাকাশে উপগ্রহ নিক্ষেপ করেছে ঠিকই, কিন্তু সে প্রকৃতির একটি নিয়মও লঙ্ঘন করতে পারে নি। মহাকাশ থেকে অবতরণ কালে তাকে প্যারাস্যুট ব্যবহার করতেই হচ্ছে। মানুষ অনায়াসে বনকে নিষ্পত্র করতে পারে এবং নদীর স্রোত বাঁধতে পারে, কিন্তু প্রাণের ধারা যেদিকে চলেছে তাকে বিপরীত পথে ঘুরিয়ে দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য। প্রকৃতিকে মান্য করেই তাকে নিয়ন্ত্রণ বা শাসন করা যায়, অবহেলা করে বা অমান্য করে নয় এই শিক্ষা মানুষের উপলব্ধির বাইরে, এখনও অধিগত হয়নি।

ডিউডেনাল আলসার (Duodenal Ulcer)

খালি পেটে অথবা খাওয়ার একঘণ্টা পরে উপরের পেটে অসহ্য ব্যথা। মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গে ব্যথার জন্যে। খেতে ভয় হয়। টক-বমি ওঠে যখন তখন। ডাক্তারের শরণাপন্ন হতেই হয়। ডাক্তার দেখে একটা বেরিয়াম একস্‌-রে করার পরামর্শ দেন। ধরা পড়ে ডিওডেনাল আলসার বা ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষত। 1746 সালে জার্মান শল্য চিকিৎসক জর্জ এরার্ড হামবারজার প্রথম এই ডিওডেনাল আলসার নামক রোগের বর্ণনা দেন। এরপরে সাবেব ডাক্তার বি. কারলিং একজন পুড়ে যাওয়া লোকের পেটে ঐ ধরনের আলসার বা ক্ষত দেখতে পান। তাঁর নামকরণে পুড়ে যাওয়া লোকের পেটের ক্ষতের নাম হয় কারলিংস্‌ আলসার। সরকারিভাবে প্রথম ডিওডেনাল আলসারের কথা উল্লেখ করা হয় 1842 সালে।

প্রদীপ কুমার দাস।

[*Source* : Milestones in Medical Breakthroughs ; East India Pharmaceuticals Works Limited, Cal-700071]

বিশেষ সংবাদ

সম্প্রতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রাঙ্গণে সংস্কৃত স্কুলের নীচতলায় পর্ষদের পুস্তক বিপণন কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে। উক্ত বিপণন কেন্দ্র থেকে পর্ষদের পুস্তক সংগ্রহ করার জন্য পুস্তক ব্যবসায়ী ও অন্যান্যদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিপণন কেন্দ্রটি রবিবার ও ছুটির দিন বাদে সবদিন খোলা থাকে। আপাতত ৩টা থেকে ৬.৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকে।

পরিবেশ—ভারতীয় প্রেক্ষাপট

রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশ—তারই মাটিতে আমরা বেঁচে বেড়ে উঠেছি ; প্রাণ পেয়েছি বাতাসে ঘ্রাণ নিয়ে। এরই আলো, বাতাস, নদীর জল, বনাঞ্চল, পাখীর কূজন আর এর অধিবাসী এবং তাদের কান্না-হাসি, আশা-আকাঙ্ক্ষা মিলিয়ে আমাদের পরিবেশ। আমাদের জীবন এরই অঙ্গাঙ্গী ছিল ; এরই সঙ্গে গাইত আমাদের প্রাণ, নাচত আমাদের অশান্ত হৃদয়। ক্রমশঃ সভ্যতা এসেছে, পুরোন পরিবেশের সঙ্গে যেমন যুক্ত হয়েছে নবলব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আর তার সাহায্যে মানুষের এগিয়ে চলার নব, নবতর সৎ প্রচেস্টা, তেমনই যুক্ত হয়েছে অতিরিক্ত লোভ, প্রযুক্তির নির্বোধ প্রয়োগ। এই সব মিলিয়ে আমাদের আজকের দেশ, আমাদের পরিবেশ।

এরই কয়েকটি মাত্র দিক সম্পর্কে সংকলিত নিছক কিছু তথ্য প্রায় বিনা মন্তব্যে পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি। মন্তব্য, তাত্ত্বিক আলোচনা, সচেতন পঠেকের জন্য নিষ্প্রয়োজন ; তথ্যই যথেস্ট।

এই প্রবন্ধে ভারতীয় পরিবেশের ছ'টি দিক আলোচিত হচ্ছেঃ (1) জল, (2) মাটি, (3) বাতাস, (4) বনভূমি (5) বন্যপ্রাণী আর সর্বশেষে তবু সর্বোপরি (6) মানুষ।

I. জল

1. ভারতে, লভ্য জলের 70 শতাংশই দূষিত জল। 7 কোটি 30 লক্ষ কর্মদিবস স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে নষ্ট হয়েছে জলবাহিত রোগের জন্য।

2. ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যার 90%-এর কোন শৌচাগার নেই ; 70%-এর নেই নিরাপদে ব্যবহারযোগ্য জলের উৎস।

3. দিল্লী শহরে ঢোকার পূর্বে যমুনা নদীর প্রতি 100 ml (প্রায় আধ গ্লাস) জলে প্রায় 7,500 কোলাই জীবাণু থাকে। শহরের ব্যবহৃত জলরাশির সঙ্গে মেশাবার পরে এই পরিমাণ দাঁড়ায় 24,000,000 এ।

4. হুগলী নদীর 158 Km দৈর্ঘ্যের মধ্যে অদূষিত অঞ্চলে মাছের গড় বার্ষিক উৎপাদন 719 টন। দূষিত অঞ্চলে এই মান 125 টন।

5. কালু নদীর তীরবর্তী আম্বিবলি গ্রামকে এখন বোম্বের "মিনামাটা" নামে অভিহিত করা হচ্ছে। কমবেশী 150টি শিল্পকেন্দ্রের বর্জ্য পদার্থে বিষিয়ে ওঠা এই নদীটির জলের পারদ দূষণ সৃষ্টি করেছে মরা মাছ, মৃতপ্রায় বৃক্ষলতা, বিষিয়ে যাওয়া প্রাণীকূল, পক্ষাঘাত পীড়িত মানুষ এবং জড়বুদ্ধি শিশুর।

6. সেন্ট্রাল প্রিভেনশন অব ওয়াটার পলিউশন অ্যাক্ট (1974), অনুসারে 1981-তে কয়েকশ'টি অভিযোগ আনা হয়েছিল। তার মধ্যে দুটি মাত্র ক্ষেত্রে অপরাধী সাজা পেয়েছে।

II. মাটি

1. ভূমিক্ষয় ভারতের এক গুরুতর পরিবেশগত সমস্যা। প্রতি ছ'মাসে শুধু বৃষ্টির জলে যত মাটি ধুয়ে চলে যায়, তা দিয়ে গোটা দেশের সব পাকা বাড়ীর সব ইঁট তৈরী করলেও মাটি বেশী থাকত।

2. সেচ ব্যবস্থার অধীন—এমন অঞ্চলের অর্ধাংশই চিরতরে কৃষিকাজের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে। সেচ ব্যবস্থার দরুণ জমিতে অতিরিক্ত জল জমা এবং অতিরিক্ত লবণাক্ততা এর মুখ্য কারণ।

3. বিগত দশ বছরে দেশে বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের পরিমাণ 20 লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে 40 লক্ষ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে।

4. নিবিড় কৃষিকাজের ফলে জমিতে গাছেদের খাবার দ্রুত কমে যায়। জৈব সার দিয়ে তার যথাযথ পূরণ ভারতে হচ্ছে না। 1980-81-তে ভারতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছিল, তা মাটি থেকে পুষ্টিদ্রব্য গ্রহণ করেছিল 18 লক্ষ টন। কিন্তু মাটিকে এই পুষ্টিদ্রব্য বিভিন্ন সারের মাধ্যমে চাষীরা আবার ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন মাত্র 11 লক্ষ টন।

5. লুধিয়ানা ছিল সবুজ বিপ্লবের পুরোভাগে। বহু শস্যের সর্বোচ্চ উৎপাদন পাঞ্জাবের এই এলাকাটি থেকে হয়েছে। জমিতে গাছেদের পুষ্টিদ্রব্যের সর্বোচ্চ অভাবও আজ এখানেই।

III. বাতাস

1. পশ্চিমের বেশ কয়েকটি বড় শহরে যখন বায়ু দূষণের হার কমছে, সে সময়ে ভারতে এই হার বাড়ছে।

2. কার্বন ডাই-অক্সাইড অন্যতম সুপরিচিত বায়ু দূষক (যদিও অধুনা এর কিছু সুফলও লক্ষ্য করা গেছে)। বিভিন্ন উৎস থেকে পৃথিবীর বায়ুতে যত কার্বন ডাই-অক্সাইড বছরে

নিঃসরিত হয় / হবে তাতে বিভিন্ন দেশের / অঞ্চলের শতকরা অবদান নীচে দেখান হল ঃ

	তৃতীয় বিশ্ব	চীন	আমেরিকা	পশ্চিম ইউরোপ	রাশিয়া
1974 এ যা ছিল ঃ	13	8	29	25	25
2025 এ যা হবে ঃ	33	15	7	16	29

3. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইড ও ভাসমান কণিকার যে বিপদসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ভারতের বেশ কয়েকটি শহরের বাতাস সেই সীমারেখা অতিক্রম করে গেছে।

4. কলকাতার 60% বাসিন্দা বায়ু-দূষণ-জাত শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ভুগছেন।

5, তুঙ্গভদ্রার তীরে নালাভাগালু গ্রামে বিড়লা গোষ্ঠী 25 কোটি টাকা ব্যয়ে 'হরিহর পলিফাইবার' তৈরী করেছেন। এর পরিচালকগোষ্ঠীর মতে এখানকার বাতাস পর্বতশীর্ষে লব্ধ বাতাসের মতই তাজা আর বিশুদ্ধ। 'ইণ্ডিয়া টু-ডের' এক প্রতিনিধি দল ওই গ্রাম থেকে ফিরে রিপোর্ট দিয়েছেন যে আধঘন্টার বেশী ওই গ্রামে থাকলে শ্বাসকষ্ট, চোখজালা অবশ্যম্ভাবী। গ্রামের অধিবাসীরা মরিয়া হয়ে গেছেন। বাঁচবার তাগিদে 40 একর বসতজমি মাত্র নতুন কোন অঞ্চলে তারা ভিক্ষে চান। কে দেবে ?

6. প্রত্যহ কলকাতায় নিঃসৃত দূষক পদার্থের মোট পরিমাণ ঃ

উৎস	পরিমাণ (টন / প্রতিদিন)
ভাসমান কণা	557
সালফার ডাই-অক্সাইড	122
কার্বন মনোক্সাইড	448
হাইড্রোকার্বন	102
নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড	70
মোট	1,299

IV. বনভূমি

1. নিবিড় বনাচ্ছাদিত, একদা বিশ্বের আর্দ্রতম কেন্দ্র—চেরাপুঞ্জী আজ সম্পূর্ণ অনুর্বর নীরস এক অঞ্চল।

2. প্রতি বছর 1 কোটি হেক্টর বনাঞ্চল কেটে ফেলা হয়। বিবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য জমি তৈরী করতে যায় আরোও প্রায় 1·5 লক্ষ হেক্টর।

3. হিমাচল প্রদেশে আগামী আট বছরে 1.5 লক্ষ গাছ কেটে ফেলা হবে শুধু আপেল রাখার বাক্স বানাতে।

4. দক্ষিণ ভারতে পেপার মিলে ব্যবহারের জন্য বাঁশের বন ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। স্থানীয় মানুষদের যারা ঝুড়ি বুনে জীবিকা নির্বাহ করতেন, তারা খেতে পাচ্ছেন না। এই অঞ্চলে পেপার মিলগুলি বাঁশ কেনেন 15 টাকা টন হিসেবে ; সাধারণ দরিদ্ররা বাড়ী তৈরী করতে সেই বাঁশ কেনেন প্রতি টন 1200 টাকা দিয়ে।

5. বনভূমির বিনাশ ভারতের 4·5 কোটি উপজাতীয় মানুষকে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। একান্তভাবেই বননির্ভর এই অতি দরিদ্র, কারিগরী শিক্ষাহীন, নির্দয়ভাবে শোষিত মানুষেরা সভ্যতা ব্যাপারটাকেই বিষদৃষ্টিতে দেখছেন।

বন্যপ্রাণী

1. প্রাণবৈচিত্র্যে ভারতের বনাঞ্চল বিশেষ সমৃদ্ধ। ভারত বিশ্বের মোট স্থলভাগের মাত্র 2% এর অধিকারী হয়েও 5% প্রাণীকুলের আশ্রয়স্থল।

2. ভারতে লভ্য 15,000 বৃক্ষলতা এবং 75,000 প্রাণী-গোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ আজ পরিবেশের ওপর মানুষের হস্তক্ষেপে বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

3. 10% এরও অধিক ভারতীয় বৃক্ষলতা বিনাশের সম্মুখীন। বহু গোষ্ঠী হয়ত বা আমরা সমাজে তাদের প্রকৃত মূল্য জানার আগেই চিরতরে হারিয়ে যাবে।

VI. মানুষ (জনস্বাস্থ্য)

1. আন্ত্রিক রোগে প্রতি মিনিটে একটি ভারতীয় শিশুর মৃত্যু ঘটছে—বছরে প্রায় 15 লাখ।

2. সেচ ব্যবস্থার অগ্রগতি রোগ পরিবাহী মশাদের জন্য অনবদ্য চারণক্ষেত্রেরও সৃষ্টি করেছে। 30 বছর আগেও ভারতে যা সম্পূর্ণ অজানা ছিল আজ সেই জাপানী এন্‌কেফেলাইটিস-পরিবাহী মশা আমাদের দেশে অজস্র। 15 লক্ষ মানুষ বর্তমান ভারতে ফাইলেরিয়া-গ্রস্ত।

3. বিগত কয়েক বছরে হেপাটাইটিস অতি দ্রুত হারে বাড়ছে। কিন্তু এটা যে একটা নজর করার মত অসুখ, সরকার সে কথাও মানতে রাজী নন।

4. এদেশে প্রতি তৃতীয় মৃত্যুটি পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যু। এরা দারিদ্র্য, অপুষ্টি, দূষিত পরিবেশ এবং অপেয় পানীয় জলের শিকার।

5. অধিকতর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার, অধিক ধূমপান ইতিমধ্যেই ভারতে প্রতি বছর 5 লক্ষ লোকের ক্যানসারে মৃত্যু ঘটিয়েছে।

6. প্রতি বছর ভারতে 70 বিলিয়ন সিগারেট আর 100 লক্ষ বিড়ি বিক্রি হয়। তামাকজাত পণ্যের ওপর রাজস্ব খাতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তামাক উৎপাদক ভারত সরকার 1967-68 সালে আয় করেন 153 কোটি টাকা। 1980-81 তে সেই পরিমাণ দাঁড়ায় 732 কোটিতে।

উৎস ঃ

The State of India's Environment—1982 ; A Citizen's Report 'Centre for Scienee & Environment, New Delhi'.

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা

রবীন চক্রবর্তী

পরিবেশ ভাবনার শুরু

পরিবেশ নিয়ে ভাবনা সাম্প্রতিক ঘটনা—বিশেষ করে আমাদের মত দেশে। ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছুকাল আগেই এ ভাবনা শুরু হয়েছে। অবশ্য শুরু হয়েছে না বলে, বলা ভাল শুরু করতে বাধ্য হয়েছে। —এবং বাধ্য হয়েছে বেশ কিছু বিপর্যয় ঘটার পর। যখন পঞ্চাশের দশক থেকে মানুষ লণ্ডন নিউ ইয়র্কের ভয়ঙ্কর বায়ু দূষণে এক এক রাত্রে কয়েক শ' থেকে কয়েক হাজার লোক মরতে দেখল, মিনিমাটা নাগাটায় পারদ দূষণের চরম পরিণতি চাক্ষুষ করল, উত্তর আমেরিকার গ্রেট লেকের জলজ প্রাণ শিল্প আবর্জনার দূষণে প্রায় ধ্বংস হতে দেখল, ডি ডি টি ও বিভিন্ন কীটনাশক ওষুধের প্রভাবে শত শত পাখী মারা যেতে দেখল, টোরি ক্যানিয়নের দুর্ঘটনায় সামুদ্রিক জীবন বিপর্যস্ত হতে দেখল, একের পর এক নিউক্লিয় বিস্ফোরণ ও নিউক্লিয় শক্তিকেন্দ্রের দুর্ঘটনায় মানুষের জীবন বিপন্ন হতে দেখল তখন আর মানুষের এ ব্যাপারে নীরব থাকা সম্ভব হল না।

একটি দু'টি রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভাবনা

দূষণ সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা সামান্য অগ্রসর হতেই মানুষ বুঝতে শুরু করে এটি নিছক প্রযুক্তিগত সমস্যা নয়। যদিও শুরুতে তেমনই মনে করা হচ্ছিল এবং সেইমত প্রতিকারের পথ অনুসন্ধান চলছিল। ক্রমে বোঝা গেল এই সমস্যার সাথে জড়িত সমাজ ও রাজনীতির প্রশ্ন, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের প্রশ্ন, দেশবিদেশের সম্পর্ক ও সহযোগিতার প্রশ্ন। ফলে প্রশ্নটা আর বিচ্ছিন্নভাবে গুটিকয়েক দেশের মধ্যে আবদ্ধ হল না। রাষ্ট্রসমূহের যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজন অনুভূত হল। পরিণতিতে 1972 সালে রাষ্ট্রসংঘের অধীনে গঠিত হল United Nation Environmental Programme বা সংক্ষেপে UNEP। এই UNEP-এর পরিকল্পনা ও কর্মসূচী সম্পর্কে সামান্য পরিচয় দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ সনদ

1972 সালের 5ই জুন সুইডেনের স্টকহোম শহরে 'মানব পরিবেশ' নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের প্রথম ঐতিহাসিক অধিবেশন বসে। বিশ্বের 113টি দেশের প্রতিনিধি এতে যোগ দেয়। মোট 109টি বিভিন্ন কার্যক্রম পেশ হয়। বিস্তৃত আলোচনার শেষে ঘোষিত হয় পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের ছাব্বিশটি 'অধিকার ও কর্তব্যের' কথা। এই স্টকহোম ঘোষণা 'The Magna Carta of Human Environment' বলে পরিচিত।

এই দলিলে ঘোষণা করা হয় স্বাধীনতা, সাম্য ও নির্মল পরিবেশ মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার অর্জনের জন্য প্রয়োজন পৃথিবীর বুক থেকে বর্ণবিদ্বেষ, জাতিভেদ ও শোষণের প্রক্রিয়াসমূহের মূলোচ্ছেদ করা। বলা হল মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উপকরণ যদি বেশীর ভাগ মানুষের নাগালের বাইরে থাকে তাহলে পরিবেশ সংরক্ষণের যে-কোন প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা এই লক্ষ্য অর্জনের একটি প্রধানতম শর্ত। বলা হল প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাই আত্মহত্যার সামিল। বনজঙ্গল পশুপক্ষী জীবজন্তু সামুদ্রিক জীবন এ সবই মানব পরিবেশের অঙ্গ। এর সংরক্ষণের দায়িত্ব মানুষেরই। প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনক। অতিরিক্ত জনসংখ্যা পরিবেশ সমস্যা জটিলতর করছে। ধৈর্যের সাথে এই সমস্যা মোকাবিলার দিকে এগুতে হবে। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা পরিবেশ সুসংরক্ষণের অন্যতম প্রধান শর্ত।

সব চেয়ে বড় দূষণ – দারিদ্র্য

'আন্তর্জাতিক পরিবেশ সনদ' মোটামুটি স্পষ্ট করেই বলেছে একথা। পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে থাকবে অথচ দূষণ থাকবে না এমন হতে পারে না। এই স্বীকৃতিটা পরিবেশ সমস্যা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভংগীতে এক নতুন অর্থ যোগ করেছে। সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে এই উপলব্ধি ও স্বীকৃতির জন্য রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগ বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে এবং বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রাথমিক প্রয়োজন নির্ভুল তথ্য

পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন এ সম্পর্কে নির্ভুল ও বিস্তৃত তথ্য। তাই প্রাথমিক কাজ ঠিক হয়েছে পরিবেশ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি একত্র করা এবং নতুন তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কাজে উদ্যোগী হওয়া। আর যেহেতু এমন একটি সমস্যা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক মানুষের সচেতন প্রয়াস তাই

প্রচারের কাজটিকেও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। কাজ পরিচালনার ব্যাপারে UNEP এর ভূমিকা হবে Catalyst বা অনুঘটকের। দেশবিদেশের বিভিন্ন উদ্যোগে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন হবে এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হবে

এমন একটি উদ্যোগে কাজের ক্ষেত্র একটি কি দুটি বিষয়ে আবদ্ধ থাকতে পারে না। এ সম্পর্কে সামান্য ধারণার জন্য গুটিকয়েক বিষয়ের উল্লেখ করা হল।

বসতি ঃ পরিবেশ অক্ষত রেখে মনুষ্য বসতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা রচনা হচ্ছে। একাজে রাষ্ট্রসংঘের সংশ্লিষ্ট দপ্তরও সহযোগী।

স্বাস্থ্য ঃ দূষণের ফলে উদ্ভূত শারীরিক অসুস্থতা প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য গবেষণা চলছে। শিল্প আবর্জনা, মানসিক পীড়ন, শব্দ, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্ট রোগের সাথে অপুষ্টি ও সংক্রামক ব্যাধির বিষয়টিও বিবেচিত হবে।

মরু এলাকার বিস্তার প্রতিরোধ ঃ এ সম্পর্কে গবেষণা ও প্রতিকার প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ স্থলভূমি জুড়ে বিস্তৃত শুষ্ক বা আধা শুষ্ক এলাকা। এর উর্বর ক্ষমতা প্রায় নেই বা থাকলেও ক্রমশঃ কমের দিকে। হিসেবে দেখা গেছে দু'হাজার সালের মধ্যে বিশ্বের মরু এলাকার পরিমাণ বিশ শতাংশ বেড়ে যাবে। বর্তমানে বছরে প্রায় দুই কোটি হেক্টরের মত জমি ক্রমে অকেজো হয়ে পড়ছে। এই প্রবণতা রুখতে নতুন পদ্ধতির অনুসন্ধান চলছে। পরিত্যক্ত জমির পুনরুদ্ধারেরও চেষ্টা চলছে।

বন ও প্রাণী সংরক্ষণ ঃ জল ও স্থলের উদ্ভিদ ও প্রাণীজীবন বিপন্ন আজ। এর সংরক্ষণের উদ্যোগ UNEP এর অন্যতম প্রধান কাজ।

শক্তি ঃ প্রচলিত শক্তি উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা পরিবেশের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস সন্ধান চালানো এর অন্যতম কাজ। এ কাজের উদ্দেশ্য দূর পল্লী এলাকায় শক্তির যোগান দেওয়া।

লাগসই প্রযুক্তি ঃ চেষ্টা চলছে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিবেশের উপযোগী উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবনের।

শিল্প ও পরিবেশ ঃ দূষণ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী সমস্যা সৃষ্টি করে যে সমস্ত শিল্প ও কলকারখানা যেমন রাসায়নিক, তেল, ইস্পাত, এ্যালুমিনিয়াম, চিনি, কাগজ, সিমেণ্ট ইত্যাদি, এসব প্রতিষ্ঠার আগে পরিবেশ উপযোগী পরিকল্পনা রচনা, স্থান নির্বাচন, নির্মাণকার্য রূপায়ণ এবং কাজ চালানোর ব্যাপারে পরামর্শ দানের জন্য বিশেষজ্ঞ দল গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।

সমুদ্র দূষণ ঃ সমুদ্র দূষণ নিয়ে কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যেমন, ভূমধ্যসাগর এলাকার এবং কুয়েত এলাকার প্রকল্প দু'টির উল্লেখ করা যায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ সামুদ্রিক ঝড়, বন্যা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি নানান দুর্যোগে ঘন ঘন বিপর্যস্ত পৃথিবীর বহু এলাকা। এ সম্পর্কে গবেষণা, পূর্ব-সংকেত ব্যবস্থা, দুর্যোগের তীব্রতা প্রশমনের ব্যবস্থা, এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

উন্নয়ন ও পরিবেশ ঃ সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশের প্রশ্নটি কিভাবে বিবেচিত হবে সে বিষয়ে বিস্তর কাজকর্ম চলছে। প্রযুক্তিগত বিধান থেকে আরম্ভ করে অধিক লাভক্ষতি ও দায়দায়িত্বের বিষয় বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে এই প্রকল্পে।

পরিবেশ আইন ঃ পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়ম নীতি আইন নির্ধারণের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদল গড়ে তোলা হয়েছে। প্রয়োজনে যে কোন দেশ এদের সাহায্য নিতে পারে।

পরিবেশ শিক্ষা কার্যক্রম ঃ পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট কাজে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মীদল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষাক্রম গড়ে তোলা হচ্ছে।

কিছুটা এগিয়েছে এমন কাজ

UNEP গঠিত হবার পর দশ বছরের কিছু বেশী সময় অতিক্রান্ত। স্বাভাবিক ভাবেই জানতে ইচ্ছে করে কাজের অগ্রগতির বিষয়টি। তেমন দু'একটি কাজের নমুনা দেওয়া হল। যদিও উপরোক্ত কাজের সবগুলিই কিছু কিছু এগিয়েছে।

এক—দূষণ প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কিত যে সমস্ত পদ্ধতি ইতিমধ্যেই জানা গেছে এবং পরীক্ষায় সুফল পাওয়া গেছে সেগুলি অন্যান্য দেশের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। উৎসাহী দেশ এর সাহায্য পেতে পারে।

দুই—পৃথিবী পৃষ্ঠের কিছু উপরে অবস্থিত ওজোন স্তর (Ozone layer) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার কাজ হয়েছে। এই ওজোন স্তর মহাবিশ্ব থেকে আগত প্রাণের পক্ষে বিপজ্জনক অতি বেগুনী রশ্মি শোষণ করে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব রেখেছে। কিন্তু মানুষের ব্যবহৃত বেশ কিছু রাসায়নিক যেমন কীটনাশক ওষুধ, রাসায়নিক সার, অতিশীতলীকরণের কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক তরল এই ওজোন স্তরকে ক্রমশঃ ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে। এই অবস্থা প্রতিরোধে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ওজোন স্তর ক্ষয়ের হার বর্তমানে কিছুটা কমের দিকে। এ সম্পর্কে গবেষণার জন্য আরও উন্নত ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ চলছে।

তিন—INFOTERRA নামে একটি আধুনিক তথ্য সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এর সাহায্যে পরিবেশ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য অতি দ্রুত আদান প্রদান করা

সম্ভব হবে। বছর বছর নতুন তথ্য সম্বলিত পুস্তক প্রকাশেরও ব্যবস্থা হয়েছে। এ পর্যন্ত 350টির মত বই প্রকাশিত হয়েছে UNEP এর উদ্যোগে।

চার—সচরাচর ব্যবহৃত রাসায়নিকের বিবরণসহ একটি তথ্য-পঞ্জী তৈরী করা হয়েছে। এর নাম The International Register of Potentially Toxic Chemicals বা সংক্ষেপে IRPTC। এ পর্যন্ত 45 হাজারের মত রাসায়নিকের বিবরণ এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বছরে 1 হাজারের মত নতুন তথ্য সংযোজিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে নিয়মিত IRPTC বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে।

শেষ ভরসা মানুষের জাগ্রত চেতনা

পরিবেশ সমস্যা যে দৃষ্টিভংগী দিয়ে দেখা হয়েছে এবং এই সমস্যা যত গভীর বলে স্বীকার করা হয়েছে তার তুলনায় উপরোক্ত এসব উদ্যোগ নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। সমস্যা সমাধানের পথ জুড়ে আছে দেশে দেশের রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থ নৈতিক কাঠামোর পাহাড়প্রমাণ বাধা। এই বাধা অপসারণ কিছু সদিচ্ছা ও ক'টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সম্ভব নয়। —তেমন আশা করাটাও মূর্খতা। তবে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব যেই মানুষদের দ্বারা তাদের চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে এই সংগঠন কিছু কাজ করতে পারে—এ বিশ্বাস রাখা যায়।

স্বীকার করতেই হবে কিছু কিছু ফল ফলতে শুরু করেছে। মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে দেশে দেশে। সংখ্যায় ও শক্তিতে এখনও দুর্বল এই আন্দোলন। তবে দুর্বল থাকবে না আগামী দিনে। তবে আশার কথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে আলোড়ন শুরু হয়েছে।

টুকিটাকি খোঁজ খবর

যে সমস্ত ব্যক্তি বা গ্রুপ পরিবেশ সংক্রান্ত কিছু কিছু কাজ শুরু করতে চান তাদের লাগতে পারে এমন কিছু খোঁজখবর দেওয়া হল।

- পরিবেশ সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো বই আছে। তার ফিরিস্তি দিতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে। তাই একটি বইয়ের উল্লেখ করছি যেটি এ সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভংগী গড়তে খুবই সাহায্য করবে। বইটি কলকাতাস্থ ইউনাইটেড স্টেটস লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে।

  The Closing Circle
  —Barry Commoner,
  Alfred Knopff Publ. (1971)

- পরিবেশ সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য পেতে এবং UNEP এর প্রচার পুস্তিকা পেতে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

  Information Service,
  UNEP
  P.O. Box 30552
  Nairobi, Kenya.

- স্টকহোম ঘোষণার ছাব্বিশটি অনুচ্ছেদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" পত্রিকার মে-জুন ১৯৮৩-র সংখ্যায়। সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। এক টাকা তিরিশ পয়সা পাঠালে ডাকযোগেও পাওয়া যেতে পারে।

  R. N. Chakraborty,
  Department of Applied Physics,
  92, A.P.C. Road, Calcutta-700009

- পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের একটি বিভাগ আছে। ঠিকানা—

  Dept. for the Prevention &
  Control of Pollution,
  10, Camac Street, (3rd Floor),
  Calcutta-700 016.

- পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত শিল্প কারখানা ও তাদের নিঃসৃত আবর্জনা সম্পর্কে একটি তথ্যপঞ্জী উপরোক্ত দপ্তরের অধীনে প্রস্তুতির পথে। Environment Action Group-গুলির কাজের জন্য এই দলিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- CMDA-র অধীনে কলকাতার বায়ু দূষণ সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার কাজ চলছে। এই তথ্যগুলিও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

- ভারত সরকারের প্ল্যানিং কমিশনের অধীনে সারা উত্তর ভারত জুড়ে গঙ্গার অববাহিকায় পরিবেশ সমীক্ষার জন্য একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এর নাম গঙ্গাপ্রকল্প। এই প্রকল্পের ভার পড়েছে গঙ্গার উপকূলবর্তী রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজে ভারপ্রাপ্ত। কাজের ফলাফল ও অগ্রগতি সম্পর্কে Action Group-গুলির আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। এজন্য কাছাকাছি বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজখবর করতে পারেন।

- ভারতের পরিবেশ সমস্যা নিয়ে সম্প্রতি একখানি তথ্য-সম্বলিত বই প্রকাশিত হয়েছে।

  State of the Environment Report
  —1982
  Centre for Science & Environment
  807, Vishal Bhavan,
  95, Nehru Place,
  New Delhi—110 019.

পরিবেশ ও সাইবারনেটিকস

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

সাইবারনেটিকস কথাটির অর্থ হচ্ছে, মোটামুটিভাবে, যোগাযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ (communication and control)। গ্রীক ভাষায় 'কুবারনেটিস' বলতে বোঝায় চালক বা নিয়ন্ত্রক—ইংরেজী 'গভর্নর' কথাটির উৎপত্তি ঐ একই সূত্রে। নৌকোর হাল যিনি ধরে থাকেন, সেই হালীকেও 'কুবারনেটিস' বলা যায়। ওয়েবস্টারের মার্কিন অভিধানে সাইবারনেটিকসের অর্থ করা হয়েছে এইভাবে ঃ স্নায়ুতন্ত্র এবং মস্তিষ্ক মিলে যে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, তার সঙ্গে বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক যোগাযোগ সংস্থার তুলনাত্মক চর্চা। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, যে-কোন জৈব অথবা অজৈব সংগঠনকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তবে সেই সংগঠনের বিভিন্ন অংশের অবস্থা এবং ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিশদ খবর ক্রমাগত পাওয়া চাই। যিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন, তাঁর কাছে এই খবর যেমন পৌঁছনো দরকার, তেমনি তিনি নিজে আবার যে-সব আদেশ দেবেন সেগুলিও সংগঠনের বিভিন্ন অংশে গিয়ে পৌঁছনো চাই। অর্থাৎ যোগাযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ এই দুটো ব্যাপার পরস্পর খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। মানুষের শরীরকে যদি এই ধরনের একটা সংগঠন বলে ভাবি, তবে স্নায়ুতন্ত্র হবে তার যোগাযোগ সংস্থা। এই স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে আবার কেন্দ্রীয় তন্ত্রের (central nervous system) ভূমিকাই হচ্ছে প্রধান—সমস্ত শরীরকে সে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া যে স্বয়ংক্রিয় সংস্থা (autonomic nervour system), সেটা মানুষের সচেতন নিয়ন্ত্রণের অধীন নয়। তার কাজ হচ্ছে শরীরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা ; হৃৎপিণ্ডের গতি, খাবার হজমের জন্য দায়ী নানাধরনের রসের ক্ষরণ, অন্ত্রের ক্রিয়া, স্বেদগ্রন্থির কাজ, এইসব ঘটনা তার এক্তিয়ারে পড়ে। এই যে জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, এটা নির্ভর করে প্রচুর পরিমাণ খবরের আদান-প্রদানের উপরে। স্বয়ংক্রিয় সংস্থা থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থায় খবর যায় অন্তর্মুখ (afferent) স্নায়ুকোষের মাধ্যমে, আর কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে স্বয়ংক্রিয় সংস্থায় খবর যায় বহির্মুখ (efferent) স্নায়ুকোষের মাধ্যমে। এই খবর যে তড়িৎ প্রবাহের আকারে যায়, সেটা বোধ হয় সকলেই জানেন।

এখন, যোগাযোগ আর নিয়ন্ত্রণের এই যে ব্যবস্থা, মানুষের তৈরী অনেক যন্ত্রেই এর অনুকরণ করা হয়। অনুকরণ যতটা সার্থক হবে, যন্ত্রটি ততই উঁচুদরের হবে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বলতে আমরা এই ধরনের জৈব সংস্থার অনুকরণের কথাই ভাবি। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ধারণা এখন অবশ্য খুবই ব্যাপক হয়ে গেছে, তাই অনেক সময় আমরা তার ভিতরকার নিয়ন্ত্রণ এবং যোগাযোগের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ভাবি না, গোটা ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিই। বহুতল বাড়ীর লিফট কিংবা হাওড়া স্টেশনের চত্বরে মানুষের ওজন নেবার যন্ত্র থেকে শুরু করে আকাশচারী সুদূর কৃত্রিম উপগ্রহ, স্বয়ংক্রিয় এইসব যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপে আজকাল আর আমরা অবাক হই না। কবি স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ যাকে বলতেন অবিশ্বাসকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে মুলতুবি রাখা, যন্ত্রবিশেষের স্বয়ংক্রিয়তার রহস্য না বুঝলেও আমরা অনেক সময় সেই পন্থা অবলম্বন করি। যদি তা না করি, যদি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের মূলনীতিটুকু বুঝতে চেষ্টা করি, তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাইবারনেটিকসের কথাই ভাবতে হবে।

1939 সালে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল, তখন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিট্যুট অফ টেকনলজীর গণিতের অধ্যাপক নরবার্ট হ্বিনার তাঁর কোন কোন সহকর্মীর সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সমস্যা নিয়ে ভাবছিলেন। যুদ্ধ বাধার ফলে তাঁদের চিন্তা আরো তাড়াতাড়ি দানা বাঁধবার সুযোগ পেল। এর মধ্যে একটা সমস্যা দাঁড়াল, জার্মান বোমারু বিমানের হাত থেকে ইংল্যাণ্ডকে বাঁচানো। দেখা গেল, বিমান-বিধ্বংসী কামানের সাহায্যে বোমারু বিমানকে আঘাত করতে হলে কামানের মুখ এমনভাবে ঘোরাতে হবে যাতে দ্রুত সঞ্চরণশীল বিমানের গতিকে সে অনুসরণ করতে পারে। বিমানের গতি যে-হেতু খুব দ্রুত, সেই হেতু তার তাৎক্ষণিক অবস্থান লক্ষ্য করে কামান দাগলে চলবে না। এমনভাবে দাগতে হবে যাতে খানিক পরে বিমানটি যেখানে গিয়ে পৌঁছবে কামানের গোলা তাকে সেইখানে গিয়ে আঘাত করে। অর্থাৎ বিমানের গতিপথ মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে যে-ভাবে বদলাচ্ছে তার টানা হিসেব কষে চলতে হবে। এই হিসেব, বলা বাহুল্য, কোন মানবিক গোলন্দাজের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে কষা সম্ভব নয়। হিসেবটা কষতে হবে কামানের নিয়ন্ত্রণকারী কোন স্বয়ংক্রিয় সংস্থার সাহায্যে। সেই সংস্থা ক্রমাগত বিমানের গতিপথ হিসেব করে চলবে এবং সেই হিসেব অনুযায়ী কামানের অগ্নিবর্ষণের দিক নিয়ন্ত্রণ করবে। পরিভাষায় একে বলা হয় সার্ভো-মেক্যানিজম (servo-mechanism)। আজকালকার চলতি ভাষায় আমরা বলব, কামানটি গণিত্রের (computer) সাহায্যে চালিত হচ্ছে।

এখন, এই যে স্বয়ংক্রিয় সংস্থা, এর মূল কথাটা কি ? না,

যে-কোন মুহূর্তে বিমানের প্রত্যাশিত অবস্থান যদি হয় ক বিন্দুতে এবং কামানের মুখ যদি তাক করে থাকে খ বিন্দুর দিকে, তবে ক এবং খ এই দুটি বিন্দুর ভিতরে দূরত্বটা হিসেব করতে হবে। দূরত্ব বলতে এখানে কৌণিক দূরত্বই বোঝাবে। কামানটা যেদিকে তাক করে আছে আর বিমানের প্রত্যাশিত অবস্থান যেদিকে, সেই দুটো দিকের মধ্যবর্তী কোণকেই আমরা বলব তাদের কৌণিক দূরত্ব। এই কৌণিক দূরত্ব যত বেশী হবে, বলা বাহুল্য বিধ্বংসী কামানের ব্যর্থতার সম্ভাবনা ততই বেশী হবে। সুতরাং এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ঐ ক্রমিক দূরত্ব যথাসাধ্য কমিয়ে ফেলা যায়। এটা করা হয় কৌণিক দূরত্বের সমানুপাতিক একটা বার্তা (signal) কামানের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে, যাতে তার মুখটা উল্টোদিকে ঘুরে যায় এবং কৌণিক দূরত্ব কমে যায়। এই ব্যাপারটা কোন-একটি বিশেষ মুহূর্তে একবার মাত্র করলে চলবে না, যতক্ষণ যুদ্ধ চলবে ততক্ষণ ক্রমাগত বার্তা পাঠিয়ে কামানের দিক সংশোধন করে নিতে হবে। বিমানের প্রত্যাশিত দিক এবং কামানের লক্ষ্যের দিক যখন কাছাকাছি থাকবে, তখন সংশোধনকারী বার্তার পরিমাণ কম হবে। আবার দুটি দিকের মধ্যে কৌণিক দূরত্ব বেশী হলে বার্তার পরিমাণ বেশী হবে। ব্যাপারটা ঘটবে যোগাযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের একটি সুনিয়ন্ত্রিত চক্রের মাধ্যমে। (1) কৌণিক দূরত্বকে কমাবার জন্য যে বার্তা কামানের উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছে তাকে আমরা বলি নিবেশ (input)। (2) সেই নিবেশ কামানের মুখ কতটা ঘোরাল, তার খবর আবার নিয়ন্ত্রকের কাছে ফিরে আসছে। সেই খবরকে আমরা বলছি উৎপাদন (output)। এই উৎপাদন অনুযায়ী আবার নিবেশকে বদলে নেওয়া যাবে। যন্ত্রটির ক্রিয়া এইভাবে চক্রবৎ চলবে। এক পর্যায়ের উৎপাদন এসে পরবর্তী পর্যায়ের নিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এইভাবে যন্ত্রটির মধ্যে সাম্যের অবস্থা যদি আসে, তবে তার কাজ ভালভাবে চলবে। কোন কারণে যদি নিবেশের মাত্রা খুব বেশী হয়ে যায়, তবে উৎপাদনও তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে এবং যন্ত্রটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। ভিনার দেখালেন, এই ধরনের দুর্ঘটনা যে শুধু যন্ত্রের বেলায় ঘটে তাই নয়, মানুষ বা অন্য উচ্চতর প্রাণীর স্নায়বিক বিকারও এইভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। পার্কিনসনের অসুখে (Parkinson's disease) হাত-পায়ের পেশীর চালক-স্নায়ুর (motor nerves) উপর মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়, ফলে কোন জিনিষ ধরতে বা ছুঁতে গেলে প্রয়োজনীয় বার্তা আর নিয়ন্ত্রণের সাম্য থাকে না।

নিবেশ আর উৎপাদন মিলিয়ে স্বয়ংক্রিয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণের এই যে চক্র, একে বলা হয় পুনর্নিবেশ (feed back)। একটা পর্যায়ের উৎপাদনকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে পরবর্তী পর্যায়ের নিবেশে পরিণত করে সংস্থার মধ্যে একটা সঙ্গতি আনা হয়, যাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্থাটি নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন ধরুন, বহুতল বাড়ীর একটি লিফটে চড়ে আপনি পাঁচ নম্বর বোতামটি টিপলেন। অমনি লিফটের ইলেকট্রনিক পরিপথে (circuit) বার্তা চলে গেল এবং লিফটের মেঝের সঙ্গে বাড়ীর পাঁচতলার মেঝের দূরত্ব মাপা হতে লাগল। এবারে সেই দূরত্বের সমানুপাতিক একটি বার্তা পরিপথের উৎপাদনের স্তর থেকে এসে নিবেশের আকারে তার মধ্যে চালিত হল এবং দূরত্বটিকে কমাতে লাগল মোটরের সাহায্যে। ক্রমাগত এই ব্যাপারটা ঘটতে ঘটতে শেষ পর্যন্ত যখন লিফটের মেঝে পাঁচতলার মেঝের সঙ্গে এসে মিলল, তখন পুনর্নিবেশের চক্র বন্ধ হয়ে লিফটের দরজা খুলে গেল।

শুধু লিফট বা বিমান-বিধ্বংসী কামান নয়, পুনর্নিবেশের প্রয়োগ নানাভাবে সংসারের নানা জায়গায় চলছে, সপ্রাণ এবং অপ্রাণ দুরকম সংস্থাতেই। ভিনার প্রমুখ গবেষকদের কৃতিত্ব এই যে তাঁরা সপ্রাণ এবং অপ্রাণ সংস্থার মধ্যে পুনর্নিবেশের এই মূলগত সাদৃশ্য বা উপমাটুকু ধরতে পেরেছিলেন। স্নায়ুবিজ্ঞান থেকে শুরু করে গণিত্র বিজ্ঞান (computer science) পর্যন্ত নানা ক্ষেত্রে তার ফল আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি।

এবারে প্রশ্নটা দাঁড়াবে এই : পরিবেশ আর সাইবারনেটিকস বলতে কি বোঝায়? পরিবেশ তো কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নয়, আবার সপ্রাণ সংস্থাও নয়। তাহলে সাইবারনেটিকসের সঙ্গে তার যোগটা কোথায়? একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন বার্তা আর নিয়ন্ত্রণের যে চক্রের কথা আমরা এতক্ষণ বলেছি, তাতে সপ্রাণ বা অপ্রাণ স্বভাবের কোন প্রশ্ন ছিল না। পুনর্নিবেশ ব্যাপারটা আসলে খুব ব্যাপক এক ধরনের ঘটনা। যে-কোন সংস্থায় বার্তা এবং নিয়ন্ত্রণ, নিবেশ এবং উৎপাদন এই ধারণাগুলি প্রয়োগ করা গেলেই তাকে আমরা সাইবারনেটিকসের আওতায় আনতে পারি। অবশ্য শুধু শুধু নয়, সংস্থার ক্রিয়াকলাপ বোঝার ব্যাপারে ধারণাগুলি কাজে লাগা চাই।

যে-কোন প্রাণীর পরিবেশ বলতে আমরা কি বুঝি? না, তার আশেপাশের যাবতীয় প্রাণী এবং প্রাকৃতিক সংগঠন। প্রাকৃতিক সংগঠন বলতে গাছপালা (যারা নিজেরাও সপ্রাণ সংস্থা), মাটি, জল-হাওয়া, ইত্যাদি সব কিছুকেই বোঝায়। এই যে পরিবেশ, প্রতিটি প্রাণীই এর কাছ থেকে অহরহ নানারকম বার্তা পাচ্ছে। পরিভাষায় যাকে উদ্দীপক (stimulus) বলা হয়, তার প্রত্যেকটিকেই আমরা বার্তা বলে ভাবতে পারি। উষ্ণতার বদল হল এক ধরনের বার্তা। সেই বদলের ফলে প্রাণী-দেহে নানারকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। গরমের সময় আমরা ঘামি, তাতে শরীর ঠাণ্ডা হয়। এইভাবে পরিবেশের উষ্ণতা বাড়লেও শরীরের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ায় (interaction) পুনর্নিবেশের ভূমিকার এটা একটা সহজ অথচ সুন্দর দৃষ্টান্ত। প্রাণতত্ত্বে যাকে হোমিওস্টাসিস (homeostasis) বলা হয়, এটা তারই সুপরিচিত উদাহরণ।

বিকারগ্রস্ত সংস্থার প্রশ্ন যদি বাদ দিই, তবে পরিবেশের সঙ্গে যে-কোন সপ্রাণ সংস্থার শেষ পর্যন্ত একটা রফা হয়ে যায়, যাকে আমরা সাম্যের অবস্থা বলি। অভিযোজন (adaptation) নামক প্রক্রিয়াটি এই সাম্যের সহায়ক হয়ে থাকে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা পুনর্নিবেশেরই ব্যাপার। কোন একটি মাত্র প্রাণীর মধ্যে এই অভিযোজন সহসা আত্মপ্রকাশ করে না, বেশ কিছুকাল ধরে বড় একটা প্রাণীগোষ্ঠীর আচরণ লক্ষ্য করলে ব্যাপারটা বোঝা যায়। 'কিছুকাল' বলতে ঠিক কতটা সময় বোঝাবে, সেটা নির্ভর করবে প্রাণীগোষ্ঠীটির উপর। Escherichia coli বা E. coli হচ্ছে মানুষের অন্ত্রের নীচের দিকে

কোলন নামক অংশটির বাসিন্দা একজাতের জীবাণু। শরীরের বাইরে এগার (agar) দ্রবণের মধ্যেও এদের পালন করা যায়। টাটকা দ্রবণে 98 ডিগ্রী ফারেনহাইট উষ্ণতায় রাখলে এরা প্রতি কুড়ি মিনিট অন্তর ভাগ হয়ে বংশবৃদ্ধি করে। একদিনে এই-ভাবে একটি E. coli জীবাণু থেকে কয়েকশ কোটি বংশধর পাওয়া যায়। এখন, এক লিটার পরিমাণ এগার দ্রবণে যদি মাত্র 25 মিলিগ্রাম স্ট্রেপটোমাইসিন মিশিয়ে দিই, তবে সেই দ্রবণে আর ই কোলাই জীবাণু পোষা যাবে না। স্ট্রেপটোমাইসিন-দূষিত কিন্তু অন্যথা পুষ্টিকর দ্রবণে কয়েকশ কোটি ই কোলাই জীবাণু ছেড়ে দিলে তাদের মধ্যে প্রায় সব কটি মারা পড়বে। প্রায় সব কটি, কিন্তু সব কটি নয়। গুটিকতক বেঁচে যাবে এবং বংশবৃদ্ধি করতে থাকবে। এই শেষোক্ত-শ্রেণীর ই কোলাই-রা স্ট্রেপটোমাইসিনের প্রভাব প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। মজা এই যে এই নতুন জাতের জীবাণুগুলি শুধু স্ট্রেপটোমাইসিন প্রতিরোধ করেই ক্ষান্ত হয় না, এরা স্ট্রেপটো-মাইসিন ছাড়া বাঁচতে পারে না। এদের মধ্যে এক ধরনের উৎ-পরিবর্তন (mutation) ঘটেছে যাতে স্ট্রেপটোমাইসিন নামক বস্তুটি তাদের বাঁচবার পক্ষে প্রয়োজন হয়ে ওঠে।

এই যে বদল, এখানে স্ট্রেপটোমাইসিনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কার্যত এক ধরনের অভিযোজন ঘটছে। এই অভিযোজনকে আমরা ই কোলাই জীবাণুগোষ্ঠীর উপর পরিবেশঘটিত উৎপাদন বলে ভাবতে পারি। অবশ্য শুধু স্ট্রেপটোমাইসিন নয়, পরিবেশের মধ্যে অন্য অনেক উপাদান থাকে। যেমন ধরুন, খাদ্যের পরিমাণ কিংবা উষ্ণতা। খাদ্যের পরিমাণ কমে গেলে কোন অভিযোজনই বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করবে না।

সমুদ্র, ভূখণ্ড আর বায়ুমণ্ডল মিলিয়ে পৃথিবীতে প্রাণের যে ভঙ্গুর একটি মণ্ডলী তৈরী হয়েছে, তাকে আমরা বলি প্রাণমণ্ডল (biosphere)। ব্যক্তিগতভাবে প্রাণীমাত্রেই মৃত্যুর অধীন, কিন্তু সমগ্রভাবে এই প্রাণমণ্ডলে এ পর্যন্ত বেশ একটা সাম্য এবং স্থৈর্য দেখা গেছে। একটা ছোট উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা যদি গড়ে মাত্র এক ডিগ্রী সেন্টি-গ্রেড পরিমাণ বেড়ে যায়, তবে মেরু অঞ্চলের বরফ ব্যাপকভাবে গলতে শুরু করবে এবং সারা পৃথিবীতেই সমুদ্রের জলের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে বন্যা হবে। ফলে প্রাণমণ্ডল অবশ্যই বিপন্ন হবে। সমস্ত সভ্যজাতির যৌথ স্মৃতিতে যে মহাপ্রলয়ের ঘটনা এখনও জাগরূক রয়েছে, খুব সম্ভবত তা এই ধরনেরই কোন ব্যাপার ছিল। তারপর অনেক হাজার বছর তেমন কিছু ঘটে নি। প্রাণমণ্ডলের সাম্য, বোঝা যাচ্ছে, খুবই সুবেদী (sensitive)। তবু এ-যাবৎ মানুষ এবং তার উপর নির্ভরশীল কিছু কিছু উন্নত প্রাণীর সংখ্যা বেড়েই গেছে। বায়ুমণ্ডল যে প্রাণের পক্ষে অপরিহার্য, একথা তো সর্বজনবিদিত। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের গড়নও তো পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বের ফলে বদলে গেছে— গোড়ার দিকে তাতে অক্সিজেনের পরিমাণ ছিল নগণ্য। উদ্ভিদের জন্মের পর থেকেই ক্রমশ অক্সিজেনের ভাগ বেড়ে গেছে। সেই অক্সিজেন আবার উন্নততর প্রাণীর অস্তিত্বের সহায়ক। এই ধরনের ঘটনাগুলিকে তলিয়ে দেখলে মনে হবে, গোটা প্রাণ-মণ্ডলটাই যেন একটা বিশাল সাইবারনেটিক সংস্থার মত কাজ করে চলেছে। এই সংস্থার ভারসাম্য এ পর্যন্ত ক্রমশ প্রাণের উন্নততর প্রকাশের সপক্ষেই কাজ করেছে। বায়ুমণ্ডল যেমন প্রাণের অস্তিত্বকে সম্ভব করেছে, তেমনি নানা প্রাণী এবং উদ্ভিদ মিলিয়ে বায়ুমণ্ডলের গড়নকেও সাম্যের দিকে নিয়ে এসেছে। সেই সাম্য অবশ্যই গতিশীল, কেননা একটু একটু করে আমাদের পরিবেশ অবশ্যই বদলাচ্ছে। তবু সব মিলিয়ে মনে হয় যেন নিবেশ আর উৎপাদনের মধ্যে এক ধরনের স্থিতাবস্থা এসেছে, যার ফলে সমগ্র প্রাণমণ্ডলকে একটি আত্ম-সঙ্গত সংস্থা বলে ভাবা যায়। লাভলক এবং মার্গুলিস এর নাম দিয়েছেন 'গেয়া অনুমান' (Gaia hypothesis)। গেয়া হল পৃথিবীর পৌরাণিক নাম। এই পৃথিবীর যে-অংশে মরুভূমি, সূর্যের আলো সেখান থেকে বেশী পরিমাণে প্রতিফলিত হয়। আবার অরণ্য এবং সমুদ্র থেকে সে-তুলনায় কম আলো প্রতিফলিত হয়। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় অ্যালবিডো (albedo)। এর উপরে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা এবং প্রাণমণ্ডলে লভ্য শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে। অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলের উপরের অংশে যে ওজোনের স্তর আছে, তার ফলে সূর্যের আলোর অতিবেগুনী অংশ ভূপৃষ্ঠে আসতে পারে না। প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে এটাও সহায়ক। এই যে সুবেদী ভারসাম্য, সম্প্রতি আমরা এর তাৎপর্য বুঝতে শুরু করেছি। নানা ধরনের জটিল প্রাকৃতিক নিবেশ এবং উৎপাদনের এই চক্রে আমরা মানুষেরাও ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করেছি। সেই হস্তক্ষেপের ফলাফল কি হতে পারে, কিভাবে প্রাণমণ্ডলের সাম্যকে আরো সুরক্ষিত করা যায়, সেই চিন্তা এখন ক্রমশ ছড়াচ্ছে। পরিবেশের এই চর্চায় সাইবারনেটিকসের ধারণা-গুলিকে কতদূর কাজে লাগানো যায়, সেটা একটা লক্ষ্য করবার মত ব্যাপার হবে।

পরিবেশ দূষণের শিক্ষা

দিলীপ কুমার চক্রবর্তী

আমাদের মানবসভ্যতা এক বিশ্বব্যাপী সংকটের সম্মুখীন। কিন্তু কোন মহাযুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা এই সংকটের হেতু নয়। আমাদের পরিবেশ ক্রমাগত দূষিত হয়ে এই সংকট সৃষ্টি করেছে। আমরা যতই বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছি, ততই আমাদের পরিবেশের জলবায়ু প্রভৃতি ক্রমাগত বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষেও এই সমস্যা ধীরে ধীরে জটিল আকার ধারণ করছে। এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত নানা দিক নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশের পক্ষে সমস্যা হল এদেশের জনসাধারণ এখনও এই সমস্যা সম্পর্কে আদৌ সচেতন নয়। ফলে তারা পরিবেশ দূষণের সমস্যাটি উপলব্ধিই করতে পারে না, কিন্তু এ দেশের জনগণের মধ্যে যদি এ সমস্যাটি সম্পর্কে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে না ওঠে, তাহলে এরকম একটি ব্যাপক সমস্যার মোকাবিলা করা সহজ হবে না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে জনসাধারণের মধ্যে এ সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা যাবে কিভাবে ? এ প্রশ্নের উত্তর হল, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় এই সমস্যাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ হল, আমাদের দেশে এখনও প্রায় বেশীর ভাগ লোকের পড়াশুনা মাধ্যমিক পর্যায়েই শেষ হয়ে যায়, যার জন্য 1917 সালে স্যাডলার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার কথা বলেন। সুতরাং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য-ক্রমে যদি পরিবেশ দূষণের সমস্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে জনসমষ্টির একটি বৃহৎ অংশ এই সমস্যাটি সম্পর্কে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পাবে।

এখন দেখা যাক কিভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় এই সমস্যাটি অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পরিবেশ দূষনের যে যে দিক সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন সেগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ—বায়ু দূষণের সমস্যা। কলকারখানা থেকে বিভিন্ন ধরনের ধোঁয়া নির্গত হয়ে প্রতিনিয়ত বায়ু দূষিত করছে। তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের জ্বালানী প্রতিনিয়ত পোড়ার ফলে যে ধোঁয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, তার ফলেও পরিবেশের বায়ু দূষিত হয়। আবার, আমাদের দেশে কোথাও কোথাও গাছ কেটে কাঠ পুড়িয়ে জ্বালানী সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে। গাছ কাটার ফলে বায়ুতে অক্সিজেন ও আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যায়। তার ফলে ফুসফুসের রোগ ও অন্যান্য রোগ হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—জলদূষণের সমস্যা। বিভিন্ন কলকারখানা থেকে বর্জ্য পদার্থগুলি বড় বড় নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে তাদের জলকে ক্রমাগত দূষিত করে তুলছে। এইভাবে গঙ্গানদীর জল বর্তমানে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। নদীর জল দূষিত হওয়ার ফলে জলজ প্রাণীগুলি ক্রমে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে পুকুর, দীঘি প্রভৃতির জলেও নানা আবর্জনা নিক্ষেপ করে বা পাট পচিয়ে দূষিত করে ফেলা হচ্ছে।

তৃতীয়তঃ—রাসায়নিক দূষণজনিত সমস্যা, কৃষিকাজে আজকাল প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহৃত হয়। এর ফলে, শাকসব্জীর সাথে নানা ধরনের রাসায়নিক বিষাক্ত পদার্থ মানব শরীরে প্রবেশ করে এবং নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে।

চতুর্থতঃ—শব্দদূষণ জনিত সমস্যা। বর্তমানে শহরাঞ্চলে সর্বদা এত বিচিত্র ও তীব্র ধরনের শব্দ সৃষ্টি হয় যে তার ফলে আমাদের শ্রবণযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এমনকি স্নায়ুমণ্ডলী বিপর্যস্ত হতে পারে।

এ ছাড়াও আছে বিকিরণজনিত দূষণের সমস্যা। তবে এই সমস্যা আমাদের দেশে এখনও তত তীব্র হয়ে ওঠেনি।

এখন দেখা যাক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কিভাবে এ সমস্যাগুলি সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। এখন, যে কোন স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য মূলতঃ ত্রিমুখী—প্রথমতঃ শিক্ষার্থীদের বিষয়টি সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করা, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযুক্ত মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা এবং তৃতীয়তঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে দক্ষতা সৃষ্টি করা। পরিবেশ দূষণ বিষয়টি এত জটিল যে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মনে এ সমস্যাটি সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা খুবই কঠিন। কারণ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ মূলতঃ প্রাক সম্পাদনা (pre operational) স্তরে ও বাস্তব সম্পাদনা স্তরে (concrete operational) সীমিত থাকে। শিশুদের মধ্যে যুক্তিনির্ভর ধারণা সৃষ্টি করা যায় প্রথাগত সম্পাদনা (formal operational) স্তরে, যা কিনা মাধ্যমিক স্তরের নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়। কাজেই, পরিবেশ দূষণের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বা উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা যাবে মাধ্যমিক স্তরে এবং এ

সম্পর্কে দক্ষতা সৃষ্টি করা যাবে অর্থাৎ পরিবেশ দূষণের মাত্রা নিয়ে বিভিন্ন পরিমাপ করা, বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দক্ষতা সৃষ্টি করা যেতে পারে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতক-পরবর্তী স্তরে। এখন দেখা যাক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ দূষণ বিষয়টি কিভাবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

প্রাথমিক স্তর—আমাদের পরিবেশ, পরিবেশের বিভিন্ন দিক, পরিবেশের সাথে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা। পরিবেশের জল, বায়ু প্রভৃতি দূষণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা।

পরিবেশের সাথে আমাদেরও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিভিন্ন সহজ উদাহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করতে হবে, যেমন, গাছের সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড এর প্রয়োজন হয় এবং ঐ প্রক্রিয়ার ফলে গাছ অক্সিজেন ত্যাগ করে। কাজেই, এই প্রক্রিয়ার ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়তে পারে না এবং অক্সিজেনও কমতে পারে না।

বায়ু দূষণ ও জল দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে পরিস্ফুট করা যায়। যেমন, বায়ু দূষিত হলে প্রাণীর উপর কিরূপ ক্ষতিকর প্রভাব হয় তা ইঁদুর ও বেলজার পরীক্ষাটির সাহায্যে বোঝান যেতে পারে।

মাধ্যমিক স্তর—বিশুদ্ধ পরিবেশ ও দূষিত পরিবেশ। পরিবেশ দূষিত হয় কি কি ভাবে, পরিবেশ দূষণে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব, কি কি ভাবে পরিবেশ দূষণ রোধ করা যেতে পারে। দূষিত জলকে বিশুদ্ধ করার উপায়—থিতান, ছাঁকন, পরিস্রাবন,বাষ্পীভবন, গৃহে বায়ু সঞ্চালন ও দূষিত বায়ুর নির্গমন ব্যবস্থা।

মাধ্যমিক স্তরে যে জীবনবিজ্ঞান (লাইফ সায়েন্স) পাঠক্রম আছে সেটি 'রিভাইজ' করা দরকার এবং তার মধ্যে "পরিবেশ বিজ্ঞান" ভালভাবে রাখা যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাথমিক স্তরে প্রকৃতি-বিজ্ঞানে এই "পরিবেশ বিজ্ঞান" অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক 'সিলেবাস'গুলি নূতন করে সাজান দরকার যাতে পারস্পরিক পারম্পর্য বজায় থাকে।

পরিবেশ ও পরিবেশ দূষণ বিষয়টি একত্র করে একটি স্বতন্ত্র পরিবেশ দূষণ সমস্যাটি সম্পর্কে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারণা গড়ে তোলার জন্য প্রদীপন ব্যবহার করা দরকার, যেমন এই উদ্দেশ্যে চার্ট, মডেল, এপিডায়াস্কোপ প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে জীবন্ত করা যায়। বেতার ও দূরদর্শনের প্রচারেও বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

ঘরের হাওয়াও বিষিয়ে ওঠছে !

আজকাল বায়ু-দূষণ, জল-দূষণ, শব্দ-দূষণ নিয়ে খুব চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। দূষণ রোধে বড় বড় পরিকল্পনাও রচনা হচ্ছে। নদীর জল, সমুদ্রের জল বিষিয়ে ওঠছে ঠিক কথা, সেই সঙ্গে কি ঘরের হাওয়াও খুব বিশুদ্ধ ? আমরা নড়বড়ে ভাঙ্গা গাড়ীর দোষ দিই, কল-কারখানার চিমনীর দোষ দিই, সঙ্গে সঙ্গে যে নিজেরাই বাড়ীর পরিবেশকে কলুষিত করে তুলছি একটু ভেবে দেখেছি কি ? লোডশেডিং-এ কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালাচ্ছি, কয়লার আঁচে, গ্যাস-উনানে, কাঠের আগুনে, কেরোসিনের স্টোভে রান্না করছি, এর থেকেও ঘরের হাওয়া বিষিয়ে ওঠছে। প্রথম প্রথম চোখ জ্বালা, চোখ থেকে জল পড়া, নাক জ্বালা, হাঁচি-কাসি-সর্দি, থেকে থেকে শ্বাস টান পরে ক্রনিক ব্রংকাইটিস, হাঁপানী ইত্যাদি হতে শুরু করে।

বই-এর তাকে, সেল্ফের কোণে, ঘরের মেঝেয় যে ধুলো জমে সেগুলো নিয়মিতভাবে পরিষ্কার না করলে ঘরের হাওয়া বিষিয়ে ওঠতে পারে। এ্যালার্জীর অন্যতম কারণ হল ঘরের ধুলো, বর্ষাকালে, শীতকালে জানলা-দরজা বন্ধ রাখলে, বন্ধ বাতাসে ও আর্দ্রতায় ব্যাকটেরিয়া, ফ্যাংগাস বাড়তে থাকে দ্রুতগতিতে। ঘরে এয়ার কুলার লাগালে ঘরের হাওয়া ঠাণ্ডা হয় ঠিকই, তবে ঐ ঠাণ্ডা হাওয়ায় লিজোনেরিয়া ব্যাকটেরিয়া খুব দ্রুত বাড়ার সুযোগ পায়। এয়ারকুলার বা এয়ার কণ্ডিশনিং ঘরে বেশি দিন থাকলে লিজোনেরিয়া ব্যাকটেরিয়ার জন্যে নিউমোনিয়া হতে পারে। তাই ঘরের বাতাসকে খোলা-মেলা হতে দিন, বই, সেল্ফের ধুলো, মেঝের ধুলো ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করুন। অনেক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবেন।

ডাঃ প্রদীপ কুমার দাস।

[*Source* : Science]

পরিবেশ দূষণে বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল ও তার প্রভাব

তারকমোহন দাস

আমাদের ভারতে গ্রাম, জনপদ ও অরণ্যের মধ্য দিয়ে মাইলের পর মাইল পরিভ্রমণ করলেও রিজার্ভ ফরেস্ট ছাড়া বন্য জন্তু-জানোয়ারের দেখা আজ আর বড় একটা পাওয়া যায় না। জাতীয় সড়কগুলির দু-পাশের গাছপালা গত এক দশকের মধ্যেই সুপরিকল্পিত ভাবে লুণ্ঠন করা হয়েছে, ঐ সব গাছে যে সব প্রাণী বাস করত তারা আজ উৎখাত হয়েছে। যেখানে কলকারখানা গড়ে উঠেছে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবেই যেন ঐ অঞ্চল থেকে বৃক্ষরাজিকে চলে যেতে হয়েছে। মানুষের বসতি আরো ঘন হয়েছে, জল, বাতাস ও মাটির দূষণের মাত্রা বেড়েছে। খাপছাড়া ভাবে সেখানে যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণী আজও টিকে আছে তারা দূষণের প্রভাবে জর্জরিত, তাদের বংশধরদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। আমাদের দেশে অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় কলকারখানার পরিমাণ বেশী নয়, কিন্তু সেগুলি এত বিশৃঙ্খল ভাবে গড়ে উঠেছে এবং গড়ে ওঠবার সময় পরিবেশের কথা এত কম ভাবা হয়েছে, সেই সঙ্গে প্রচলিত আইন-কানুনগুলি এত শোচনীয় ভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে যে তার প্রভাবে শুধু মানুষ নয়, মানুষের সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে এবং এই ক্ষতির মাসুল শেষ পর্যন্ত মানুষকেই আজ গুণতে হচ্ছে।

কলকাতা ও হাওড়া শহরে মিলিত ভাবে প্রতিদিন 1305 টন দূষিত পদার্থ বাতাসে এসে মিশছে। এর মধ্যে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও কয়লার ঝুল, কালি ও ছাই-এর পরিমাণ শতকরা 44 ভাগ, অর্থাৎ 560 টন। কয়লার এই ঝুল-কালির মধ্যে এমন বহুরকম রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যা মানুষ ও জীবজন্তুর শরীরে মারাত্মক ক্যানসার রোগ সৃষ্টি করতে পারে। বাকী শতকরা 56 ভাগ (745 টন) বিভিন্নরকম দূষিত গ্যাস, যেমন কার্বন মনোঅক্সাইড আছে শতকরা 34 ভাগ (450 টন), অতি বিষাক্ত গ্যাস এটি, প্রাণীদের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয় এটি। সালফার ডাই-অক্সাইড শতকরা 9 ভাগ (123 টন), গাছপালার ক্লোরোফিল বা সবুজ অংশ বিনষ্ট করে এটি, গাছের পাতা সাদাটে হয়ে যায়, মাটি ও উদ্ভিদকোষে অম্লতা বৃদ্ধি করে, ফসল ও তরিতরকারীর ফলন কমিয়ে দেয়। হাইড্রোকারবন গ্যাস থাকে শতকরা 8 ভাগ (102 টন)। এটিও জীবজন্তুর ফুসফুসে ক্যানসার সহ নানারকম মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি করে থাকে। তাছাড়া নানারকম অক্সাইড অব্ নাইট্রোজেন আছে শতকরা 5 ভাগ (70 টন), অধিকমাত্রায় এটিও জীবজন্তুর শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

প্রতিদিনই এই ভয়াবহ পরিমাণ দূষিত পদার্থ কলকাতা ও হাওড়ার বাতাসে এসে মিশছে, তার মধ্যে কালকারখানাগুলি থেকে আসছে শতকরা 46 ভাগ (600 টন), মোটর গাড়ীর ধোঁয়া থেকে আসছে শতকরা 28 ভাগ (360 টন), তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে আসছে শতকরা 15 ভাগ (195 টন), গৃহস্থবাড়ীর উনানের ধোঁয়া থেকে আসছে শতকরা 11 ভাগ (150 টন)। এই তথ্যগুলি পাওয়া গেছে ন্যাশনাল এনভায়রনমেণ্টাল ইঞ্জিনিয়ারীং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এক সমীক্ষা থেকে। এই বিপুল পরিমাণ দূষিত পদার্থের প্রভাব উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর ওপরও বিস্তৃত হচ্ছে, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর ক্ষতি হওয়ায় তার প্রভাবও পরিবেশের ওপর পড়ছে। শুধু কলকাতা ও হাওড়া শহর নয়, দুর্গাপুর, বোকারো, ভিলাই, রাউরকেল্লা, আমেদাবাদ, কানপুর, গাজিয়াবাদ প্রভৃতি যে কোন শিল্পনগরীর সন্নিহিত অঞ্চলের জল, বাতাস ও মাটি এমনভাবে দূষিত হচ্ছে যে সেখানকার গাছপালা, ফলফুল, তরিতরকারী, পশুপক্ষী সকলেরই স্বাভাবিক বিস্তার লক্ষণীয় পরিমাণে কমে আসছে। দূষণের প্রভাবে দুর্বলতম জীবদের আগে ক্ষতি হয়। পরিবেশ থেকে তারা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়, বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকে দূষণ সহ্য করতে সক্ষম এমন সব প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীরা ; প্রজাতির বৈচিত্র্য তাতে বিনষ্ট হয়, যারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকে তাদেরও দূষণ সহ্য করবার ক্ষমতা অসীম নয়, তাদেরও বৃদ্ধি ও ফলনের ক্ষতি হয়। তবে বংশানুক্রমে ঐ জায়গায় পড়ে থাকার ফলে দূষণ সহ্য করবার ক্ষমতাও তাদের কিছুটা বাড়ে, পোকামাকড়দের ক্ষেত্রে এটা বেশ দেখা যায়।

এই পরিবেশ-দূষণের মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির অস্বাভাবিক হার ও তার অপ্রতিরোধ্য চাপের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ না করে উপায় নেই। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধেই আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে, জনসংখ্যার এই চাপ সরাসরি গিয়ে পড়ছে পরিবেশেরই ওপর। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি গোটা পরিবেশের চেহারা যেন দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, আগে যেখানে অন্ন, জল, বিশুদ্ধ বাতাস, পশুপক্ষীর কোন অভাব ছিল না, সেগুলি যেন ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে, তাদের চরিত্র যেন পাল্টে যাচ্ছে। মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি, জীবিকা, নিরাপত্তা, আরাম ও অবকাশের জন্য যেসব উদ্যোগ অতি

ব্যাপকভাবে নেওয়া হয়েছিল সেই শহর, কলকারখানা, যানবাহন, শিল্প ও কৃষিব্যবস্থা মানুষেরই সঙ্গে যেন বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেছে, বেঁচে থাকবার মূল সম্পদগুলি ধরেই টানাটানি সুরু করেছে। বাতাস ও জলে বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ছে, মাটি উর্বরা শক্তি হারাচ্ছে, উদ্ভিদ, পশুপাখি ও মানুষের দেহের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিষাক্ত পদার্থ জমা হচ্ছে, বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী চিরতরে লোপ পাচ্ছে। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা পরিবেশের স্থায়ী বিকৃতি ঘটছে, তার জীবপালন শক্তি ক্রমশঃ কমে আসছে।

এই সঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিসংখ্যানটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 1650 খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল 50 কোটি এবং তা দ্বিগুণে পরিণত হতে সময় নিয়েছিল ঠিক 200 বছর, 1850 খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 100 কোটিতে, বর্তমানে তা 400 কোটিতে পৌঁছুতে চলেছে। আগে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণে পরিণত হতে সময় লাগত 200 বছর, বর্তমানে তা লাগে মাত্র 35 বছর। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবদেশে সমান নয়, এল-স্যালভাডোরে প্রতি 19 বছর অন্তর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে, সুতরাং প্রতি 19 বছর অন্তরই তাদের খাদ্য উৎপাদন, গৃহনির্মাণ, জীবিকার সংস্থান ইত্যাদি দ্বিগুণ করতে হচ্ছে, পরিবেশের সম্পদগুলির বিনিময়েই এটা করতে হচ্ছে। ভারতে প্রতি 30 বছর অন্তর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে, প্রতি বছরই সমগ্র অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের যা জনসংখ্যা তা ভারতে যোগ হচ্ছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও রাশিয়ায় প্রতি 65 বছর অন্তর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে। ইংলণ্ডে প্রতি 140 বছর অন্তর এবং অষ্ট্রিয়ায় প্রতি 175 বছর অন্তর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব অন্যান্য অনেক দেশ থেকে স্বল্প হলেও তাদের মাথাপিছু ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ও চাহিদা উন্নয়নশীল দেশগুলির থেকে অনেক বেশী। পৃথিবীর শতকরা 90 ভাগ খনিজ সম্পদ উন্নত দেশগুলি ব্যবহার করে থাকে, সুতরাং শিল্পাঞ্চলের দূষণজনিত সমস্যা ঐসব দেশে খুবই তীব্র ও ব্যাপক। অন্যদিকে জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত ভারত সহ এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশগুলিতে বিপুল পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন, বস্ত্র উৎপাদন ও বাসস্থান নির্মাণের জন্য পরিবেশের ওপর যে ধরনের চাপ সৃষ্টি হয় এবং তার জন্য যে দূষণের সৃষ্টি হয় তার প্রভাব ও চরিত্র উন্নত দেশগুলির থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মানুষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ সারা পৃথিবী জুড়ে এত ব্যাপকভাবে এবং অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বাড়ছে না, কোটি কোটি বছর ধরে নানা বিস্ময়কর কৌশল অবলম্বন করে তারা নিজেদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। সংখ্যার নিয়ন্ত্রণ পৃথিবীতে টিকে থাকার বা "Strategy of Survival"-এর অন্যতম মূল নীতি। পৃথিবীতে মানুষ এসেছে প্রায় 20 লক্ষ বছর আগে, এই 20 লক্ষ বছরের শতকরা 99·97 ভাগ সময়ই অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষের সংখ্যা বিশেষ কিছুই বাড়েনি, এটা বাড়ছে মাত্র গত তিন-চারশ বছর হল, এবং এই বৃদ্ধির হার এতই অস্বাভাবিক যে আগামী পাঁচ হাজার বছর ধরে এই হারে বৃদ্ধি চলতে থাকলে জনসংখ্যার মোট ওজন পৃথিবীর ওজনের ($5{\cdot}97 \times 10^{24}$ কে. জি.) সঙ্গে সমান হয়ে যাবে, যেটা এই পৃথিবীতে মানিয়ে নেওয়া একান্তই অসম্ভব, অর্থাৎ বিগত পাঁচ হাজার বছর ধরে এই হারে মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকলে ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসত। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার যে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং এই পৃথিবীর পক্ষে একান্তই বেমানান সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমানে আমাদের জনসংখ্যার মোট ওজন পৃথিবীর স্থলচর অন্যান্য সকল প্রাণীর মোট ওজন থেকেও বেশী।

বিগত কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞানীরা গিনিপিগ, ইঁদুর, এক-বীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ এবং নানা জাতের শৈবাল নিয়ে এক বিশেষ ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন,—একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে ঐ সব প্রাণী অথবা উদ্ভিদদের অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় রাখা হয়েছে এবং অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বংশবৃদ্ধি করতে দেওয়া হয়েছে,—তার ফলে পরিবেশ কি ভাবে দূষিত হচ্ছে এবং ঐ দূষণের প্রভাবে ঐ সব জীবদের কি ক্ষতি হচ্ছে তা নির্ধারণ করা। প্রতিক্ষেত্রেই দেখা গেছে নানা ধরনের বিপর্যয়কর ও অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে। ইঁদুরদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হতে। অকারণে পরস্পরকে আক্রমণ, কামড়া-কামড়ি, দৈহিক ক্ষতিসাধন, মানসিক ভারসাম্য হ্রাস, জনন বিষয়ে অনাগ্রহ, স্ত্রী ইঁদুরদের অস্বাভাবিক গর্ভপাত (সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এটি একটি জন্মগত কৌশল যা ক্রোমোজোমের জিনেই হয়ত নিহিত আছে)। খাদ্য যথেষ্ট থাকলেও দৈহিক অপুষ্টি ও ওজন হ্রাস। বর্জ্য-পদার্থগুলি পরিবেশের মধ্যে জমতে থাকায় বহুরকম ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণ নানা রোগের প্রাদুর্ভাব, মৃত্যুহার হঠাৎ বেড়ে যাওয়া, ইত্যাদি। উদ্ভিদদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে মাটিতে যথেষ্ট সার ও জল থাকলেও বৃদ্ধি ও ফলন হ্রাস, আলোর অভাবে ক্লোরোফিলের পরিমাণ হ্রাস, ইত্যাদি। শৈবালদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে জলের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস, জৈব আবর্জনার পরিমাণ বৃদ্ধি, অম্লতা বৃদ্ধি এবং শেষ পর্যন্ত ঐ আবদ্ধ জলাশয়ে শৈবাল সমেত অন্যান্য জলচর প্রাণীদের মৃত্যুহার বৃদ্ধি, ইত্যাদি।

এখন আমাদের নিজস্ব পরিবেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জল ও স্থলে কিভাবে দূষিত পদার্থ জমছে এবং তার জন্য উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর কি ক্ষতি হচ্ছে এবং তার প্রভাবে পরিবেশের কি ক্ষতি হচ্ছে তার কয়েকটি নির্দিষ্ট উদাহরণ দিচ্ছিঃ কৃষি-প্রধান ভারতে খাদ্য উৎপাদন যথাসম্ভব বাড়াবার জন্য কৃষিক্ষেত্রে আজকাল উত্তরোত্তর বর্ধিত পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হচ্ছে, এই সারের সবটা গাছ একসঙ্গে নিতে পারে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শতকরা 25-30 ভাগের বেশী সার ফসলগুলি নিতে পারে না, বেশকিছু সার ধুয়ে নদী, পুকুর বা নালায় গিয়ে জমা হয়, সেখানে সবুজ শৈবালের অতিমাত্রায় বৃদ্ধি ঘটায় এই সারগুলি।

নদী, পুকুর ও সমুদ্রে প্রচুর শৈবাল বাস করে এরাই জলের মধ্যে অক্সিজেন উৎপাদনের প্রধান উৎস, সালোকসংশ্লেষের সাহায্যে এরা জলে অক্সিজেন যোগ করে যার ফলে অন্যান্য জলচর প্রাণীর খুবই সুবিধা হয়। জলে অক্সিজেন খুব কমই

দ্রবীভূত হয় (শতকরা 0·6 ভাগমাত্র), জল থেকে অক্সিজেন নিয়েই মাছেরা বেঁচে থাকে। অতিরিক্ত অক্সিজেন যা সবুজ শৈবালরা তৈরী করে তা বুদবুদের আকারে জল থেকে নিঃসৃত হয়ে বাতাসে মেশে। অনেক বিজ্ঞানীর হিসাবে পৃথিবীর শতকরা 70-80 ভাগ অক্সিজেন উৎপাদন সমুদ্রবাসী শৈবালরাই করে থাকে, কারণ ভূ-পৃষ্ঠের শতকরা 71 ভাগ জুড়েই সমুদ্র অবস্থিত। জলে সবুজ শৈবালের বংশবৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত বেশ ভাল, মাছেদের অক্সিজেন পেতে সুবিধা হয়, জলচর প্রাণীদের খাদ্য হিসাবেও শৈবাল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়ালে বিপর্যয় ঘটে। শৈবালরা দিন-রাত সব সময় যে অক্সিজেন যোগ করে তা নয়। রাতের অন্ধকারে সালোকসংশ্লেষ যখন বন্ধ থাকে তখন অক্সিজেন তৈরীও সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। কিন্তু এই সময় তারা শ্বাসকার্য চালিয়ে যায়, তার ফলে রাত্রিবেলায় প্রচুর অক্সিজেন টেনে নেয় জল থেকে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড যোগ করে জলে, তার ফলে জলের অম্লতা বাড়ে। সুতরাং কোন জলাশয়ে অত্যধিক পরিমাণে শৈবাল জন্মালে রাত্রিবেলায় ঐ জলে অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস পায়, অম্লতা বৃদ্ধি পায়, pH-এর পরিবর্তন ঘটে। মাছেদের রক্তের মধ্যেও দিন-রাত্রি ভেদে অক্সিজেনের মাত্রার এই পরিবর্তন দেখা যায়। যে সব জলচর প্রাণী এই ধরনের পরিবর্তন সহ্য করতে অভ্যস্ত নয় তারা ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। অবশ্য এম. পি. শেপার্ড (1955) পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন ট্রাউট মাছ ক্রমশঃ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে স্বল্প অক্সিজেনযুক্ত জলে। শৈবালদের বংশবৃদ্ধি যদি অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে তাহলে স্তূপের আকারে জলের তলায় শৈবালদের মৃত অংশ জমতে থাকে এবং ব্যাকটিরিয়াদের সাহায্যে তা পচতে থাকে। এই জীবাণুরা প্রচুর অক্সিজেন জল থেকে টেনে নেয়, তার ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ দ্রুত কমতে থাকে। ঐ জলের B. O. D বা বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমাণ্ড বাড়তে থাকে প্রচণ্ড ভাবে। জলের মধ্যে B. O. Dর পরিমাণ 4 পি. পি. এম-এর ওপর হলে সে জলকে পানের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। ড্রেনের ময়লা জলে যেখানে প্রচুর জৈব পদার্থ ও জীবাণু আছে তার B. O. D-র পরিমাণ 600 পি. পি. এম-এর ওপরে। সুতরাং জলাশয়ের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র থেকে ধুয়ে আসা সার বা অন্য কোন উৎস থেকে জৈব আবর্জনা জমতে থাকলে জীবাণুদের ক্রিয়া বর্ধিত হয়, তারা প্রচণ্ড হারে অক্সিজেন খরচা করতে থাকে, তখন ঐ জলে রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছেরা বাঁচতে পারে না, তারা হয় মরে যায়, না হয় অন্যত্র প্রস্থান করে। ঐ ধরনের স্বল্প অক্সিজেন যুক্ত ময়লা জলে বাস করতে অভ্যস্ত এমন অনেক মাছ (সিঙি, কৈ, মাগুর, ইত্যাদি) ও জলচর প্রাণী আছে তারা তখন ঐ পরিবেশে আধিপত্য স্থাপন করে। সিঙি, কৈ, মাগুর, ল্যাঠা প্রভৃতি মাছেদের দেহে অতিরিক্ত শ্বাস অঙ্গ থাকার ফলে বাতাস থেকেও তারা অক্সিজেন নিতে পারে, সুতরাং জলে অক্সিজেনের ঘাটতি হলেও তাদের কোন অসুবিধা হয় না।

শুধু শৈবালদের অতিবৃদ্ধি নয়, জলে যে কোনো পচনশীল জৈব পদার্থ ফেললেই জীবাণুদের ক্রিয়া বৃদ্ধির ফলে অক্সিজেনের খরচ বাড়তে পারে। অবিশ্বাস্য পরিমাণে জীবাণুরা জলের অক্সিজেন খরচ করে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ইরি হ্রদে নিয়মিত ভাবে ড্রেনের ময়লা এসে জমার ফলে প্রতিদিন 50,000 পাউণ্ড অক্সিজেন খরচ হয়ে থাকে। কাশ্মীরের ডালহ্রদের অবস্থা আরো ভয়াবহ। সেখানে শত শত হাউস-বোটের এবং শহরের অধিকাংশ ময়লা এসে জমা হচ্ছে। ডালহ্রদের তলায় শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের বাড় এমন বেড়েছে যে জলে সামান্য হাত ডোবালেই আজ তাদের ধরা যায়, ছোঁয়া যায়। ডালহ্রদের বেশ কিছু অংশে ভাসমান কাঠের গুঁড়ির ওপর কাঠ, শুকনো ঘাস ও মাটি বিছিয়ে সব্‌জি চাষ হচ্ছে,—বেগুন, টোমাটো, ভেণ্ডী, কপি, শালগম আরো কত কি! শিকারা ভ্রমণের সময় পর্যটকদের নিয়ে আসা হয় এই ফ্লোটিং গার্ডেনের মধ্যে, সবিস্তারে বলা হয় এর কথা। এই ভাসমান সবজি বাগানে রাসায়নিক ও জৈব সার ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, সেগুলিও এসে মেশে এই হ্রদের জলে, তার ফলে জলে শুধু অক্সিজেনের ঘাটতি নয় নানা বিষাক্ত পদার্থও এসে জমা হচ্ছে।

জল যদি এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে দূষিত ও ময়লা হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে অক্সিজেনের ঘাটতি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে তাহলে ঐ জলে শেষ পর্যন্ত শৈবালরা নিজেরাই টিকতে পারে না। তারা ধীরে ধীরে ঐ পরিবেশ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জলের দিকে চলে যায়, না হয় সবংশে ধ্বংস হয়। এইসব উদ্ভিদের মৃতদেহ ও অন্যান্য জৈব আবর্জনা যা জলে নিক্ষিপ্ত হয় তা হিউমাস বা পাঁকমাটির আকারে জলের তলায় জমতে থাকে, জলের গভীরতাও ক্রমশঃ কমতে থাকে। তখন ঐ অগভীর নোংরা জলে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত এমন নানা জাতের উদ্ভিদ ও প্রাণীরা এসে উপস্থিত হয়। হিঞে, কলমি, কেয়া, কচু, হোগলা, প্রভৃতি জলাভূমির উদ্ভিদের আধিপত্য সেখানে বিস্তৃত হয়। জলাভূমিতে থাকতে অভ্যস্ত এমন সব লম্বা-লম্বা পা-ওয়ালা পাখি,—যেমন কাদাখোঁচা, ডাহুক, বক, সারস সেই সঙ্গে সাপ, ব্যাঙ, গিরগিটি আর অজস্র পোকামাকড়ের আবির্ভাব ঘটে। ডালহ্রদে ইতিমধ্যেই ঐ সব জলাভূমির উদ্ভিদদের আধিপত্য সুরু হয়েছে, জলের গভীরতাও ধীরে ধীরে কমে আসছে। সমস্ত হ্রদটি ক্রমশঃ এক অগভীর ময়লাজলের আধারে পরিণত হতে চলেছে। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদতত্ত্ব-বিদদের ধারণা এই অবস্থা যদি চলতে দেওয়া হয় তাহলে সামনের 25 বছরের মধ্যেই ডালহ্রদের আর কোন চিহ্নই থাকবে না। এই জলাভূমির অস্তিত্বও একটি স্থায়ী ব্যাপার নয়। জলভূমি যখন হোগলা, কেয়া ও কচু বনে পূর্ণ হতে থাকে তখন প্রচুর জল ঐ সব উদ্ভিদ পাতার সাহায্যে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়, সেই সঙ্গে গাছের পাতালতা ঝরে হিউমাসে পরিণত হতে থাকে যা শেষ পর্যন্ত মাটিতে পরিণত হয়। জলাভূমির জল কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত শুকনো ডাঙ্গায় পরিণত হয়। ঐ শুকনো ডাঙ্গার ওপর কিন্তু জলাভূমির উদ্ভিদরা আর টিকতে পারে না, তাদের হটিয়ে বৃক্ষশ্রেণীর উদ্ভিদরা তখন ঐ জায়গায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। যখন কোন পুকুর বা জলাশয় মজে যায় তখন এটা আমরা স্বচক্ষে ঘটতে দেখেছি। এই মজে যাবার ব্যাপারটা স্বাভাবিক ভাবেও ঘটতে পারে,—যদি প্রাকৃতিক কোন কারণে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে খরা চলতে থাকে, জলের

স্বাভাবিক যোগান বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরাই এটা কৃত্রিমভাবে ঘটিয়ে থাকি,—জলকে দূষিত করে, জলের মধ্যে নিয়মিত ভাবে ময়লা ও আবর্জনা ফেলে, কাপড় কেচে, গরু-মহিষ স্নান করিয়ে, খেতের চোয়ানী যোগ করে এবং সেচের জন্য প্রচুর জল তুলে নিয়ে। ডালহ্রদ কাশ্মীরের প্রধান সম্পদ, পর্যটকের অমরাবতী, রাজ্যসরকারের তরলসোনা,—তারই যদি আজ এই হাল হয় তাহলে সারা ভারতে আমাদের যে অগণিত হ্রদ, নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণী আছে তার কি হাল হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

তাহলেও একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায়, তা'হল ডালহ্রদের অস্তিত্ব নূতন নয়, হাজার হাজার বছর তো বটেই, হয়ত লক্ষ লক্ষ বছর আগেও ডালহ্রদ ছিল, কাশ্মীর শহরও নূতন নয়, জাহাঙ্গীরের আমলেও এর যথেষ্ট নামডাক ছিল, সুতরাং এর ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদের হাজার বছর পিছিয়ে যেতে হবে, এই হাজার বছর ধরেই তো শহরের ময়লা ডালহ্রদে ফেলা হচ্ছে,—কিন্তু তখন তো কোন অসুবিধা হয়নি, বর্তমান শতাব্দীতেই তা হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র জনসংখ্যার অস্বাভাবিক চাপের ফলাফলের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। ডালহ্রদে যদি দু-চারখানা হাউস-বোট থাকে এবং অল্পস্বল্প শহরের ময়লা ফেলা হয় তাহলে ক্ষতির কোন কারণই নেই, বরং ঐ ময়লা মাছের খাদ্য ও শৈবালের নিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, কিন্তু শত শত হাউস-বোট থেকে হাজার হাজার পর্যটকের অতি বিপুল পরিমাণ বর্জ্যপদার্থ যদি প্রতিদিন ডালহ্রদে যোগ হতে থাকে তা'হলে হ্রদের নির্দিষ্ট বহনক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যাবেই, এবং সেটা হয়েছে বলেই এই বিপর্যয় ঘটেছে। বর্তমান শতাব্দীতেই ঘটেছে এবং সেটা বন্ধ হওয়া দূরের কথা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

আমাদের দেশের কৃষিক্ষেত্রগুলি থেকে শুধু সার পদার্থ নয় প্রচুর কীটনাশক পদার্থও জলের সঙ্গে ধুয়ে পুকুর, নদী, খাল, বিলে এসে পড়ছে। যে চাষী নাম সই করতে জানে না সেও যথেচ্ছ পরিমাণে এই সব কীটনাশক পদার্থ ব্যবহার করছে। এই কীটনাশক পদার্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করছে ক্লোরিনেটেড হাইড্রোজেন (ডিডিটি) ও বেন্‌জিন হেক্সাক্লোরাইড (গ্যামাক্সিন) গ্রুপের কীটঘ্ন ঔষধগুলি। এগুলি উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর শরীরে প্রবেশ করলে কখনও তা ভেঙ্গে যায় না, তা চর্বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে জমতে থাকে, সুতরাং খাদ্য-পিরামিডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির প্রাণীদের দেহেই এর পরিমাণ বেশী দেখা যায়। অন্যান্য সকল জাতীয় মানুষের মধ্যে ভারতীয়দের শরীরেই আজ ডিডিটির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী—প্রায় 26·0 পিপিএম (এক পিপিএম = দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ)।

ডিডিটির সম্পূর্ণ নাম ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরোইথেন। আজ থেকে একশো নয় বছর আগে 1874 খ্রীষ্টাব্দে জাইড্‌লার প্রথম ডিডিটির সংশ্লেষ ঘটান, কিন্তু তখন এর কীটনাশক ধর্মের কথা জানা ছিল না। 1939 সালে পি. মুলার প্রথম এর কীটনাশক ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, তখন থেকেই এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। 1948 সালে এজন্য মুলারকে নোবেল প্রাইজে ভূষিত করা হয়। কিন্তু 1950 দশকের মাঝামাঝিই পরিষ্কার বোঝা গেল ডিডিটি পরিবেশের মধ্যে স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি করছে, জলাশয়ে মাছেদের ঝাঁকে ঝাঁকে মৃত্যু ঘটছে, শিকারী পাখিদের বংশ লোপ পেতে চলেছে, অপকারী পোকা-মাকড়দের সঙ্গে উপকারী পোকা-মাকড়রাও মারা পড়ছে দলে দলে, যার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হতে বসেছে। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ উন্নত দেশে ডিডিটি জাতীয় কীটঘ্নগুলির ব্যবহার আজ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের উৎপাদন নয়, পুরোদমে এই জাতীয় কীটঘ্নগুলি তারা উৎপাদন করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে চালান দিয়ে চলেছে। আমাদের দেশে অতি ব্যাপক পরিমাণে বেন্‌জিন হেক্সাক্লোরাইড গ্রুপের কীটঘ্ন গ্যামাক্সিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা নিজেরাই এটা এখন উৎপন্ন করছি। 1952 সালে এর উৎপাদন প্রথম শুরু হয়, 1954 সালে এর মোট উৎপাদন ছিল 432 টন, 1982-83 তে তা বহুগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 62,000 টনে। ভারত আজ উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান কীটঘ্ন উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে। এই জাতীয় কীটঘ্নগুলি জীবজন্তুর কি ক্ষতি করে, এবং কি ভাবে করে?

ডিডিটি একটি নার্ভের বিষ, এটি পোকা-মাকড়ের নার্ভতন্ত্র আক্রমণ করে। ডিডিটি পাখির ডিমের ক্যালসিয়ামের পরিমাণ এত কমিয়ে দেয় যে ডিমের খোলাগুলি অতি পাতলা ও ভঙ্গুর হয়ে ওঠে, পাখিরা সেই ডিমে তা দেবার জন্য বসলেই তা' ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়, তার ফলে বহু জাতের শিকারী পাখি আজ ধ্বংসের কবলে পড়ছে। ডিডিটি পাখিদের কয়েকটি বিশেষ হরমোন নিঃসরণে অসুবিধা ঘটায়, তার ফলে পাখিদের বন্ধ্যাতা ঘটে। ডিডিটি ইঁদুরের লিভারে ক্যানসার রোগ সৃষ্টি করে এবং ইঁদুরের ক্রোমোজোমের জিনের পরিবর্তন ঘটায় যার ফলে বংশানুক্রমিক নানা বিকৃতির সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু এখানে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পৃথিবীতে এপর্যন্ত যত ডিডিটি তৈরী হয়েছে তার সিংহভাগই অ্যানোফিলিস্ ও কিউলেক্স নামক দুটি প্রজাতির মশার গায়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে, তার ফলে তাদের বাড় সাময়িকভাবে হ্রাস পেলেও তারা চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে যায় নি, বরং ডিডিটি সহ্য করতে পারে এমন মশার সৃষ্টি হয়েছে যারা প্রচলিত লঘুমাত্রার ডিডিটি সহ্য করে দিব্যি বেঁচে আছে। ল্যাবরেটারীতে এটা পরীক্ষা কারেও দেখান যায়। একটি আবদ্ধ পাত্রে 100টি মশার ওপর যদি প্রচলিত লঘুমাত্রার ডিডিটি প্রয়োগ করা হয় তাহলে 97-98টি মশা ঠিকই মারা যাবে, কিন্তু 2-3টি মশা বেঁচে থাকবে, তাদের জিনের মধ্যে ঐ মাত্রায় ডিডিটি সহ্য করবার ক্ষমতা আগেই ছিল। সুতরাং এই বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মশারা যখন যৌনজননের সাহায্যে নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করবে তখন তাদের বংশধররাও ঐ লঘুমাত্রার ডিডিটিতে আর ঘায়েল হবে না। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্র অনুসরণ করেই লঘুমাত্রার ডিডিটি সহ্য করবার ক্ষমতাসম্পন্ন মশকদলের সৃষ্টি হবে। সুতরাং, এই ধরনের স্থায়ী কীটনাশক পদার্থের সাহায্যে ভবিষ্যতে স্থায়ী ফললাভের সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত।

এছাড়া অর্গানো ফসফরাস্ (ফলিডল, থায়ামেট) ও কার্বামেট (সেভিন, বেগন) গ্রুপের কীটনাশক পদার্থগুলিও আমাদের দেশে প্রচুর ব্যবহার করা হয়। এগুলি শরীরের মধ্যে প্রবেশ

করলে ভেঙ্গে যায় এবং মলমূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, শরীরের মধ্যে স্থায়ীভাবে জমতে থাকে না। কিন্তু এগুলি অত্যন্ত বিষাক্ত, তাই যেটুকু সময় শরীরের মধ্যে থাকে তাতেই শরীরের গুরুতর ক্ষতি করে থাকে। সব্জী ও ফসলের ওপর যখন এগুলি ছড়ান হয় তখন স্বাভাবিকভাবে ভেঙ্গে যেতে 15-20 দিন সময় লাগে, এরপর এগুলি নিরাপদ হয়ে যায়। কিন্তু টোমাটো, লেটুস, মূলা, পান, বেগুন, শশা প্রভৃতি তরিতরকারী এই নিরাপদ সময় আসবার আগেই বাজারে নিয়ে আসা হয় এবং খাওয়া হয়। জলে ধোয়া ও রান্না করার ফলে কিছুটা বিষ বেরিয়ে যায় বা ভেঙ্গে গিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তবু সামান্য পরিমাণে শরীরের মধ্যে যাবার সম্ভাবনা থেকেই যায় এবং গেলে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তাছাড়া টোমাটো, লেটুস, শশা, পান যেখানে কাঁচাই খাওয়া হয় সেখানে এই ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশী। খেতের মধ্যে যখন এই পদার্থগুলি স্প্রে করা হয় তখন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, কাঠবিড়ালী এবং বিশেষ করে মৌমাছিদের প্রচণ্ড ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে। মৌমাছিদের ক্ষতি হলে বহু রকম ফসল ও ফলচাষের অনিবার্য ক্ষতি ঘটতে পারে, কারণ মৌ-মাছির সাহায্যেই তাদের পরাগ সংযোগ ঘটে থাকে ফুল থেকে ফলের সৃষ্টি হয়।

আজকাল পুকুরে ফলিডল মিশিয়ে মাছ ধরা ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। মাছগুলি বিষক্রিয়ায় যখন ভেসে ওঠে, প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলে তখন চারবার জাল টানলে যে কাজ পাওয়া যায় তা একবারেই হয়, সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হয়। এই ফলিডলযুক্ত মাছ সেই দিন অথবা তার পরদিনই খাওয়া হয়, সিদ্ধ করবার সময় কিছুটা ফলিডল ভেঙ্গে গেলেও তার ক্ষতির সম্ভাবনাটা থেকেই যায়।

কিন্তু এইসব কীটঘ্ন ছাড়া কীট দমনের উপায় কি? বিশেষজ্ঞগণ এজন্য রোগ-পোকার আক্রমণ সহ্য করতে পারে এমন নূতন জাতের শস্য সৃষ্টির পরামর্শ দিচ্ছেন, আগেকার পদ্ধতি চুন, তুঁতে ইত্যাদি ব্যবহারের কথা বলছেন এবং পোকার সাহায্যে পোকা মারবার কথা ভাবছেন। প্রত্যেক প্রাণীরই কিছু জাতশত্রু আছে, এই শত্রুদের কাজে লাগিয়ে আমাদের ফসলের শত্রুদের দমন করবার চেষ্টা করা হচ্ছে—যার নাম বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল। এ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের মধ্যে 223টির জাতশত্রুদের সন্ধানে পাওয়া গেছে। এই জাতশত্রুদের কাজে লাগিয়ে প্রায় শতকরা 55টি ক্ষেত্রেই বাঞ্ছিত ফললাভ ঘটেছে। তাছাড়া কোবাল্ট 60 থেকে উদ্ভূত গামারশ্মির সাহায্যে ও অন্যান্য উপায়ে পুরুষ পতঙ্গদের নির্বীজন (sterilization) করে ঝাঁকে ঝাঁকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে স্ত্রীপতঙ্গদের সঙ্গে যৌন মিলনের জন্য। বংশরক্ষায় অক্ষম এই পুরুষ পতঙ্গদের সঙ্গে মিলনের ফলে স্ত্রীপতঙ্গরা যে ডিম প্রসব করছে তা থেকে আর পতঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে না।

পৃথিবীতে প্রায় দশ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী আছে, তার মধ্যে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ প্রজাতির প্রাণীই হল এই পোকা মাকড়, এদের অধিকাংশই মানুষের কোন ক্ষতি করে না, বরং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা উপকার করে থাকে। এই পোকামাকড়রা জীব-পিরামিডে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। মৌল পদার্থের চক্রাকার আবর্তনে, উদ্ভিদের পরাগ-সংযোগ ও বীজের বিস্তারে এবং নিজেরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে জীব-পিরামিডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির বহু প্রজাতির পাখি, উভচর, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। পোকামাকড়রা অবলুপ্ত হলে পরিবেশের ভারসাম্যই অবলুপ্ত হবে, আমাদেরই টিকে থাকা শক্ত হবে। পোকামাকড়দের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা অবিশ্বাস্যরকম অধিক হলেও নানা বিস্ময়কর উপায়ে তারাও নিজেদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং পরিবেশের বহন ক্ষমতার ওপর কখনও তারা চ্যালেঞ্জ জানায় না, কোটি কোটি বছরের মধ্যে কখনও তা জানায় নি,—যদিও পৃথিবীর প্রতি চার রকম প্রাণীর মধ্যে তিনটিই ছিল এই পোকামাকড়।

পরিবেশের বহনক্ষমতার (carrying capacity) সঙ্গে জনসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। জনসংখ্যা যদি লাগামছাড়া উর্ধ্বগতিতে বাড়তে থাকে তার প্রত্যক্ষ সংঘাত পরিবেশকেই সহ্য করতে হয়, তার কোন বিকল্প নেই এবং নিশ্চিতভাবেই জনসংখ্যার মোট ভার, মোট চাহিদা পরিবেশের মোট বহন ক্ষমতা ও উৎপাদন ক্ষমতাকে একদিন ছাড়িয়ে যাবেই, এবং তখনই শুরু হবে নানারকম বিরূপ, বিশৃঙ্খল, অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার উদ্ভব। পরিবেশ দূষণ সৃষ্টির এটাই জন্মকথা। একটি সীমাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে অত্যধিক সংখ্যক ইঁদুর, গিনিপিগ ও উদ্ভিদ পালন বিষয়ক পরীক্ষার ফলাফলগুলি থেকে ঐ অবস্থা কতদূর শোচনীয় হতে পারে তার একটা আভাস আমরা পেয়েছি এর আগে। সুতরাং এর একমাত্র স্থায়ী প্রতিকার জনসংখ্যা হ্রাসের মধ্যেই নিহিত আছে; জোড়াতালি মার্কা অন্য কোন সমাধানের সাহায্যে এর স্থায়ী প্রতিকার খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হয়েছে—"আমাদের গ্রাম, জনপদ ও অরণ্যের মধ্য দিয়ে মাইলের পর মাইল পরিভ্রমণ করলেও, রিজার্ভ ফরেস্ট ছাড়া, বন্যজন্তু জানোয়ারের দেখা আজ বড় একটা পাওয়া যায় না,"—কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—ঐ জন্তু জানোয়ারগুলি তাহলে গেল কোথায়? তার সোজাসুজি উত্তর হল ঐ জন্তুগুলির মাংস আজ মানুষের দেহে প্রবেশ করেছে—হয় সরাসরি রান্নাঘর ও খাবার টেবিলের মাধ্যমে, না হয় মাটি ও উদ্ভিদের মাধ্যমে তাদের মৌল উপাদানগুলি মানুষের দেহেই আজ বিরাজ করছে। এম. বেটিস্ (1968)-এর হিসাব অনুসারে পৃথিবীতে যত জন্তু-জানোয়ার ও পোকা-মাকড় আছে তার মোট ওজন থেকেও মানুষের মোট সংখ্যার ওজন আজ বেশী। মানুষই আজ পরিবেশের সব চেয়ে বড় খাদক, সব চেয়ে বড় শোষক। তার মোট ভার, মোট চাহিদা পরিবেশের মোট বহনক্ষমতা ও উৎপাদন-ক্ষমতাকে আজ ছাড়িয়ে যাচ্ছে,—এটাই মানুষের আজ মূল সমস্যা, এ থেকেই অন্যান্য সমস্যা—যেমন ক্ষুধা, দারিদ্র্য, জীবিকা, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং এই ভার ও চাহিদার সঙ্গে বহনক্ষমতা ও উৎপাদন-ক্ষমতার যদি একটা সামঞ্জস্য আনতে না পারা যায় তাহলে অন্য কোন পথেই কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু এই পথে সাফল্য লাভ করতে হলে আমাদের দেশের প্রত্যেক মানুষের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন। আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

এখানেই পরিবেশ বিজ্ঞান এবং তার পরিবেশ তত্ত্বাবধান (Environmental Management) সংক্রান্ত শাখার মূল উপযোগিতা। পরিবেশ তত্ত্বাবধান (Environmental Management) বিষয়টি আমার মতে তিনটি প্রধান কার্যক্রমে বিভক্ত হওয়া উচিত। প্রথম কার্যক্রম হল পরিবেশ ভাবনায় দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে সামিল করা, আমাদের জনসংখ্যা কি ভাবে বাড়ছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য কিভাবে বিনষ্ট হচ্ছে জনসাধারণকে তা বুঝতে হবে। দেশের সাধারণ মানুষ যদি এ বিষয়ে সচেতন না হয় এবং সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে দেয় তাহলে ওপর থেকে কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে এই সচেতনতা আমাদের অর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয় কার্যক্রম হল আমাদের চোখের সামনে যে সমস্ত অসঙ্গতি ঘটছে, যার ফলে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা এবং কিভাবে তা প্রতিরোধ করা যায়, তার স্থায়ী সমাধান করা যায় তারজন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীদের যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনা করা।

তৃতীয় কার্যক্রম হল এই সমস্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং পরিবেশ সংরক্ষণের আইন-কানুনগুলি যাতে দ্রুত এবং সঠিকভাবে সকলক্ষেত্রে প্রযুজ্য হয় তারজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হতে হবে, উপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এটা তাদের করতে হবে। এই তিনটি কার্যক্রমের কোন একটির অভাব হলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সেই সঙ্গে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশের সান্নিধ্য লাভ করা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না।

পৃথিবীতে জীবন নূতন নয়। পৃথিবীর দু'শ কোটি বছরের জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, জীবন ঠিক দড়ির খেলার বাজীকরের মতই সৃষ্টির সূচনা থেকে চরম অবলুপ্তির হাত থেকে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে নিজেকে সাবধানে বাঁচিয়ে এগিয়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, যুগে যুগে, নব নব রূপে নিজেকে বিকশিত করে তুলেছে,—এই নৈপুণ্যের কোন তুলনা হয় না। এই নৈপুণ্যের প্রায় সবটুকুই অর্জিত হয়েছে প্রকৃতির নিয়মের রাজত্বের নির্দিষ্ট চারটি সূত্র অত্যন্ত কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের মাধ্যমে। পৃথিবীর সকল জীব সর্বযুগেই অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই সূত্রগুলি অনুসরণ করে এসেছে,—এইগুলি হল (1) সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, যা বিস্তৃতভাবে এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে, (2) জল ও মৌলিক পদার্থের চক্রাকারে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার, ডিডিটিজাতীয় পদার্থগুলি ব্যবহারের ফলে এই নীতি লঙ্ঘিত হচ্ছে। (3) উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুষম অনুপাত, (4) নূতন নূতন অঞ্চলে বসতি স্থাপন। অতীতে কোন যুগে, কোন একটি সূত্র পালনে যদি উদ্ভিদ ও ও প্রাণীরা ব্যর্থ হত, তাহলে পৃথিবীতে জীবনের চিহ্নমাত্র আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। পৃথিবীতে অনন্তকাল ধরে জীবনের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির এটিই মূল নক্সা বা ব্লু-প্রিন্ট। আমাদের পরিবেশ তত্ত্বাবধানের মূল নক্সাটি আঁকতে হবে এই চারটি সূত্র অনুসরণ করেই। মানুষের অধিকাংশ মূল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এই সূত্রগুলি ঠিকমত অনুসরণ না করার জন্যই। সুতরাং তার সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে এর মধ্যেই।

গ্রন্থপঞ্জি—

Bates, M. 1968. Man in Nature, Prentice Hall.

Shepard, M.P. 1955. Resistance and tolerance of young speckled trout (Salvelinus fontinalis) to oxygen lack ; with speeial reference to low oxygen acclimation. Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 12, 387-446.

পরিবেশ দূষণে রসায়নের ভূমিকা

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর বুকে জীবের, অর্থাৎ উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর, বেঁচে থাকার জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশের একান্ত প্রয়োজন। মানুষের সুস্থভাবে জীবনধারণের জন্য নির্মল বায়ু এবং পানীয় হিসাবে সুপেয় জলের প্রয়োজন। প্রাকৃতিক বায়ু ও জল কোনটিই রাসায়নিক বিচারে বিশুদ্ধ নয়। কারণ বাতাস কয়েকটি গ্যাসের মিশ্রণ এবং সুপেয় প্রাকৃতিক জলেও কয়েকটি গ্যাস ও কিছু খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাকে যার ফলে জলের স্বাদ হয় তৃপ্তিপ্রদ। সুতরাং সাধারণভাবে বিশুদ্ধ বায়ু এবং বিশুদ্ধ জল বলতে জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকারক নয় এমন প্রাকৃতিক বায়ু ও জল বোঝায়। তেমনি বিশুদ্ধ খাদ্য বলতে এমন খাদ্যবস্তু বোঝায় যাতে জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকারক কিছু নেই। খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্র কলুষিত হলে খাদ্যবস্তুর মাধ্যমে ঐ সব ক্ষতিকারক বস্তুর প্রভাব জীবদেহে লক্ষ্য করা যায়।

নানা কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ (জল, বায়ু, মাটি) দূষিত হতে পারে এবং এর ফলে জীবদেহের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই কারণে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান—অর্থাৎ কি কি কারণে পরিবেশ দূষিত হয় এবং কি ভাবে তা আয়ত্তাধীন রাখা সম্ভব—বিশেষ ভাবে প্রয়োজন মানুষের কল্যাণের জন্য।

পরিবেশ দূষণের একটি বিশেষ কারণ রসায়নজাত। জীবদেহের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নানা খনিজ রাসায়নিক পদার্থ যেমন সাধারণ লবণ ইত্যাদি, অধিক মাত্রায় ক্ষতিকারক। তা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের অধিকাংশ রাসায়নিক পদার্থই অহিতকর এবং এদের মধ্যে বেশ কয়েক প্রকার জীবদেহের পক্ষে তীব্রভাবে বিষাক্তকর। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় অথবা খাদ্য এবং পানীয়ের মাধ্যমে এগুলি জীবদেহে প্রবেশ করলে জীবদেহের বিশেষ ক্ষতি হয়।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জীবনধারণের জন্য নির্মল বায়ুর প্রয়োজন তা আগে বলা হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্মল বাতাসে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড যে যে পরিমাণে আছে কোন কারণে তার হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হলেও জীবনযাত্রার ভারসাম্য ব্যাহত হয়। বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের উপর প্রাকৃতিক আবহাওয়া বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ পরোক্ষভাবে জীবজগৎকে প্রভাবিত করে। অক্সিজেন গ্যাস সামান্য পরিমাণে জলে দ্রবীভূত হয় (0.009 g প্রতি লিটার জলে 25°C তাপমাত্রায়), কিন্তু এই দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কোনও কারণে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থা হতে অত্যন্ত কমে গেলে জলচর প্রাণীর জীবন সংকটাপন্ন হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার এ ধরনের যে কোনও পরিবর্তন যা উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সুস্থ জীবনধারণের পক্ষে ক্ষতিকারক তাকেই সাধারণভাবে পরিবেশ দূষণ বলা চলে।

কোনও বিষাক্ত পদার্থ জীবদেহে কি পরিমাণে প্রবেশ করলে জীবন নাশ ঘটায় তার দ্বারাই ঐ বিষাক্ত পদার্থের "প্রাণঘাতী মাত্রা" (Lethal dose, LD) নিরূপিত হয়। সাধারণতঃ এই মাত্রা জীবের দৈহিক ওজনের প্রতি কিলোগ্রামের অনুপাতে কত মিলিগ্রাম পরিমাণ তার দ্বারা প্রকাশ করা হয়; অর্থাৎ x mg পরিমাণ কোনও বিষাক্ত পদার্থ W kg পরিমাণ কোনও জীবদেহের পক্ষে প্রাণহানিকর হলে ঐ বিষাক্ত পদার্থের বেলায় $LD = \frac{x}{W}$। মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকারক কয়েকটি সাধারণ বিষাক্ত পদার্থের LD-এর মান এখানে উল্লেখযোগ্য :

সায়ানাইড (Cyanide, CN^-)—	1 mg
মর্‌ফিন (Morphine)—	1-50 mg
এস্‌পিরিন (Aspirin)—	50-500 mg
মিথাইল অ্যালকোহল (Methyl alcohol)—	0.5-5 g
ইথাইল অ্যালকোহল (Ethyl alcohol)—	5-15 g

অধিকসংখ্যক কোনও প্রাণীর দেহের উপর পরীক্ষা চালিয়ে শতকরা 50 ভাগ ক্ষেত্রে LD-এর যে মাত্রা পাওয়া যায় তাকে সাধারণতঃ LD_{50} (অর্থাৎ Lethal Dosage 50%) বলা হয়। নানা কারণে এই LD_{50} এর মান একই বিষাক্ত পদার্থের জন্যও ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ভিন্ন। কিন্তু সঙ্গতভাবেই বলা চলে যে নানা প্রকার প্রাণীদেহের পক্ষে যে সকল বিষাক্ত পদার্থের LD_{50} এর মান কম সেগুলি মানুষের দেহের পক্ষেও মারাত্মক ক্ষতিকারক।

বিষাক্ত পদার্থগুলি কি ভাবে কাজ করে তার ভিত্তিতে এগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে :

(1) ক্ষয়কারী (Corrossive) পদার্থ, যেমন, SO_2, Cl_2, NO_2, O_3, ইত্যাদি।

(2) জীবের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও নানা জৈবিক প্রক্রিয়া ব্যাহতকারী পদার্থ (Metabolic poisons), যেমন, CO, CN^-, As, Pb ও Hg এর বিভিন্ন যৌগ, DDT, ইত্যাদি।

(3) স্নায়ুর উপর প্রভাবকারী পদার্থ (Neurotoxic agents), যেমন, অ্যাট্রোপিন (Atropine), নিকোটিন (Nicotine), ক্যাফেইন (Caffeine), স্ট্রীকৃনিন (Strychnine), বিভিন্ন প্রকারের "নার্ভ গ্যাস" (Nerve gases) যা যুদ্ধে ব্যবহারের নতুন মারণাস্ত্র এবং যার ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে পারমাণবিক বোমার চাইতে কিছুমাত্র কম নয়।

(4) জিনের (Gene) উপর প্রভাবশালী পদার্থ, যার কুফল বংশপরম্পরায় লক্ষ্য করা যায় (Mutagenic substances), যেমন, থ্যালিডোমাইড (Phthalidomide) যা স্নায়ুর উত্তেজনা উপশমকারী এবং ঘুমের ঔষধে এক সময় বহু ব্যবহৃত হয়েছিল পশ্চিম দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং এর ফলে বহু বিকলাংগ শিশুর জন্ম হয়েছিল ঐসব দেশে। অজৈব পদার্থের মধ্যে নাইট্রাইট (NO_2^-) লবণ এরকম আরেকটি রাসায়নিক যা জীবকোষের DNA-এর উপর বিক্রিয়া করে তাতে এমন পরিবর্তন ঘটায় যার কুফল বংশ পরম্পরায় প্রজন্মের উপর লক্ষ্য করা যায়।

(5) ক্যান্সার বা কর্কটরোগ সৃষ্টিকারী পদার্থ (Carcenogenic substances), যেমন, কয়েক প্রকারে বহুমণ্ডলাকৃতি হাইড্রোকার্বন (Polycyclic hydrocarbons) যেগুলি হাইড্রোজেন ও কার্বনের সংযুক্তির ফলে উৎপন্ন যৌগ, কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত কয়েক প্রকারের রঞ্জক পদার্থ (Dyes) যা একসময় খাদ্যদ্রব্যকে রঞ্জিত করার জন্য বহু ব্যবহৃত হয়েছে এবং আমাদের দেশে এখনও হয়ে থাকে, স্যাকারিন (Saccharine) যা চিনির পরিবর্তে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের খাদ্যে ব্যবহৃত হয়, ইত্যাদি।

বিষক্রিয়া আবার দু' প্রকারের। কয়েক প্রকার বিষের ক্রিয়া তাৎক্ষণিক এবং মাত্রাধিক্যে এদের প্রভাবে জীবনাবসান ঘটে (Acute poisoning)। আবার কোনও ক্ষেত্রে পরিমিত মাত্রায় কোনও কোনও বিষাক্ত পদার্থের ক্রিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী, জীবদেহে যা পুরাতন ব্যাধির আকার ধারণ করে (Chronic poisoning)।

বেশ কয়েক প্রকার রাসায়নিক পদার্থই ক্ষয়কারী বিষাক্ত পদার্থ। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফস্‌জিন (Phosgene) নামের বিষাক্ত গ্যাস যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছিল এবং যার রাসায়নিক সংজ্ঞা কার্বনিল ক্লোরাইড (Carbonyl chloride, $COCl_2$), ক্লোরিন (Chlorine, Cl_2), ওজোন (Ozone, O_3), নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (Nitrogen dioxide, NO_2), সালফার ডাই-অক্সাইড (Sulphur dioxide, SO_2), ইত্যাদি গ্যাস। কার্বন মনক্সাইড (Carbon monoxide, CO) এর সাথে ক্লোরিন যুক্ত করে ফস্‌জিন গ্যাস তৈরী করা হয়ঃ

$$CO + Cl_2 = COCl_2$$

প্রশ্বাসের সাথে $COCl_2$ ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করলে সেখানে জলের সাথে বিক্রিয়া ঘটে এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়ঃ

$$COCl_2 + H_2O = 2HCl + CO_2$$

উৎপন্ন এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের প্রভাবে ফুস্‌ফুস বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে শ্বাসকার্য বিশেষ ব্যাহত হয় এবং প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। বাতাসের সংস্পর্শে সূর্যালোকের প্রভাবে ক্লোরোফর্ম (Chloroform, $CHCl_3$) হতেও এই $COCl_2$ উৎপন্ন হয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্লোরোফর্ম ব্যবহৃত হয় রোগীকে অজ্ঞান করার জন্য। এই ক্লোরোফর্ম যাতে $COCl_2$ হ'তে মুক্ত থাকে তা একান্ত প্রয়োজন এবং এ কারণে ক্লোরোফর্ম (যা সাধারণ তাপমাত্রায় একটি তরল পদার্থ) বাদামী রং-এর বায়ুশূন্য কাঁচের পাত্রে এবং সূর্যালোক পড়ে না এমন স্থানে রাখা বাঞ্ছনীয়।

Cl_2, NO_2, O_3 ইত্যাদি গ্যাস সাধারণ ভাবেই এদের জারণ (Oxidising) ক্ষমতার জন্য এবং SO_2 তার বিজারণ (Reducing) ক্ষমতার জন্য বিশেষ ক্ষতিকারক। জীবকোষ, যা দিয়ে জীবদেহ গঠিত এবং বিভিন্ন উৎসেচক বা এন্‌জাইম (Enzymes) যার সাহায্যে জীবদেহের আবশ্যকীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয়, এ সব জারণ ও বিজারণকারী পদার্থের দ্বারা বিনষ্ট হয়।

জীবের জৈবিক প্রক্রিয়া ব্যাহতকারী বিষাক্ত পদার্থ (যা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষয়কারী নয়) তার পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কার্বন-মনোক্সাইড (Carbon monoxide, CO), সায়ানাইড্ (Cyanide, CN^-), বেশ কয়েকটি মৌল যেমন, আর্সেনিক (Arsenic, As), সীসা (Lead, Pb), পারদ (Mercury, Hg), তামা (Copper, Cu), ইত্যাদি ও তাদের নানা যৌগিক পদার্থ।

1895 খৃঃ ইংলণ্ডের এক জীববিজ্ঞানী হল্‌ডেন (J. Haldane) প্রথম লক্ষ্য করেন যে CO-এর প্রভাবে জীবকোষে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয়। এর বহু পরে বৈজ্ঞানিকেরা এর কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হন। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হ'য়েছে যে অক্সিজেনের মত CO রক্তের লোহিত কণিকার (Haemoglobin), সংক্ষেপে Hb, এর সাথে যুক্ত হ'য়ে ঐ হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা নষ্ট করে। প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় ফুস্‌ফুসে যে বাতাস প্রবেশ করে তার অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয় এবং উৎপন্ন ঐ $Hb{\cdot}O_2$ জীবকোষে O_2 সরবরাহ করেঃ

$$Hb{\cdot}O_2 = Hb + O_2$$

কিন্তু CO-এর প্রভাবে যে $Hb{\cdot}CO$ উৎপন্ন হয় তা $Hb{\cdot}O_2$ হ'তে প্রায় 400 গুণ দৃঢ় সংবদ্ধ (Stable)। অধিকন্তু $Hb{\cdot}CO$ এর প্রভাবে উৎপন্ন $Hb{\cdot}O_2$ হতেও জীবকোষে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয়। সুতরাং CO যে কেবলমাত্র কিছু পরিমাণ Hb-কে O_2 বহনে অক্ষম করে তোলে তাই নয়, বাকি অনেক পরিমাণ Hb-এর O_2 পরিবাহিতায় ও ব্যাঘাত ঘটায়। $Hb{\cdot}CO$ এবং $Hb{\cdot}O_2$ এর উৎপত্তি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া (Reversible reaction)ঃ

$$Hb + O_2 \rightleftharpoons Hb{\cdot}O_2$$

$$Hb + CO \rightleftharpoons Hb{\cdot}CO$$

সুতরাং বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণের আধিক্য হেতু $Hb{\cdot}O_2$ হ'তে $Hb{\cdot}CO$ অধিক দৃঢ় সংবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও $Hb{\cdot}CO$ হ'তে O_2-এর প্রভাবে CO বিমুক্ত হতে পারেঃ

$$Hb{\cdot}CO + O_2 \rightleftharpoons Hb{\cdot}O_2 + CO$$

0·1% পরিমাণ CO আছে এমন বাতাসে O_2 অণুগুলির সংখ্যা CO অণুর প্রায় 200 গুণ। তা সত্ত্বেও 0·1% মাত্রায় CO আছে এমন বাতাসে 4 ঘণ্টা শ্বাসকার্য চলতে থাকলে একজন সুস্থ সবল পূর্ণাবয়ব মানবদেহের প্রায় 60% হিমোগ্লোবিন (Hb) Hb CO তে পরিণত হয়। বাতাসে CO-এর পরিমাণ 1% হ'লে এই Hb·CO এর পরিমাণ হয় মোট Hb-র প্রায় 90%। অত্যন্ত অল্প পরিমাণ CO আছে এমন দূষিত বাতাসে কিছু সময় অবস্থানের ফলে যে অসুস্থতা প্রকাশ প্রায় তা বেশ কিছুক্ষণ বিশুদ্ধ বায়ু (অথবা প্রয়োজন বোধে অক্সিজেন) সেবনে দূর হয় উপরোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সুতরাং সামান্য পরিমাণ CO দেহে প্রবেশ করলে তার প্রভাব চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু 0·1% CO আছে এমন বাতাসে কয়েক ঘণ্টা শ্বাসকার্য চালালে যে পরিমাণ Hb বিনষ্ট হয় তার ফলে জীবনাবসান ঘটা বিচিত্র নয় প্রয়োজনীয় পরিমাণ O_2 সরবরাহের অভাবে। শিশু এবং রক্তস্বল্পতা রোগে ভুগছেন এমন পূর্ণবয়স্ক মানুষের পক্ষে CO বিশেষভাবে মারাত্মক।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর কোষগুলি সহজেই অক্সিজেনের অভাবে বিনষ্ট হয়। সুতরাং CO-এর বিষক্রিয়ায় মৃত্যু না ঘটলেও মস্তিষ্কের ও স্নায়বিক বিকার জনিত জরায় কবলিত হওয়া অসম্ভব নয়।

খনিজ তৈল এবং ঐ তৈল সম্ভূত নানা দাহ্য বস্তু, কয়লা ইত্যাদি দহনের ফলে মোটর গাড়ী, বাস, ট্রাক ইত্যাদি যানবাহন ও বিভিন্ন শিল্প এবং কলকারখানা হ'তে যে ধূম নির্গত হয় তাতে প্রচুর পরিমাণে CO থাকে দাহ্য বস্তুর সম্পূর্ণ দহনের অভাবে। হিসাবমত প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলে এই ভাবে প্রায় 2×10^8 টন পরিমাণ CO বিমুক্ত হয়। প্রাকৃতিক নানা জারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই CO প্রায় সবটাই CO_2-তে পরিণত হয়, যার ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে CO-এর পরিমাণ অপরিবর্তিতই থেকে যায় এবং তা এতই নগণ্য (এক কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র, অর্থাৎ 0·1 ppm) যে তা হ'তে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। ধূমপানকালে ফুসফুসে যথেষ্ট পরিমাণে CO প্রবেশ করে এবং অত্যধিক ধূমপান করেন এমন ব্যক্তির শরীরের রক্তের 5—15% হিমোগ্লোবিন (Hb) Hb·CO রূপে থাকতে পারে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে CO-এর পরিমাণ এক কোটি ভাগের একভাগ মাত্র আগেই বলা হয়েছে কিন্তু বড় বড় শহরে যেখানে প্রচুর যানবাহন চলাচল করে সেখানকার বাতাসে এর পরিমাণ 300 গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। সেকারণে আমেরিকার অনেক বড় বড় শহরে রাস্তার ধারে অক্সিজেনপূর্ণ আধার রাখার ব্যবস্থা আছে। যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য যে পুলিশ বাহিনী সে সব জায়গায় কাজ করেন তাঁরা প্রতি ঘণ্টা বা ঐ রকম সময় অন্তর কিছুক্ষণ বিশুদ্ধ অক্সিজেন সেবন করে বিষক্রিয়া প্রশমিত করেন। বাতাসে CO-এর পরিমাণ এককোটি ভাগের একশ ভাগ পর্য্যন্ত হলেও মোটামুটি সহনীয়। এরকম বাতাসে আট ঘণ্টামত কাজ করলে শারীরিক ক্ষতি বিশেষ হয় না বললেই চলে। কিন্তু বাতাসে CO-এর পরিমাণ এককোটি ভাগের তিনশ ভাগ হ'লে এবং ঐ বাতাসে চার ঘণ্টার মত শ্বাসকার্য চালালেএকজন সুস্থ মানুষের শরীরের প্রায় 35% হিমোগ্লোবিন Hb·CO-তে পরিণত হয় এবং এমন অবস্থায় মানুষ মূর্চ্ছা যায়। শরীরের মোট হিমোগ্লোবিনের মোট 60% Hb·CO হ'লে মৃত্যু ঘটে। এককোটি ভাগের 7500 ভাগ CO এমন বাতাসে চার ঘণ্টা শ্বাসকার্য চালালে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

কার্বন মনোক্সাইডের পরেই উল্লেখ্য যে বিষাক্ত বায়ুদূষক গ্যাস তা হ'লো NO, NO_2, ইত্যাদি। উচ্চ তাপ সৃষ্টি হয় এমন যে কোনও দহন প্রক্রিয়া বাতাসের সাহায্যে ঘটালে ঐ উচ্চ তাপে বাতাসের N_2 ও O_2 এর মধ্যে রাসায়নিক সংযুক্তির ফলে কিছু পরিমান NO উৎপন্ন হয় :

$$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$$

কম তাপমাত্রায় ঐ বর্ণবিহীন NO বাতাসের O_2 এর সাথে যুক্ত হ'য়ে বাদামী রং-এর ঝাঁঝালো NO_2 গ্যাস উৎপন্ন করে :

$$2NO + O_2 = 2NO_2$$

বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের ফলেও N_2 ও O_2 যুক্ত হ'য়েও NO উৎপন্ন করে, এবং এই কারণে মোটর গাড়ী, বাস, ট্রাক, ইত্যাদি হ'তে নির্গত গ্যাসেও যথেষ্ট পরিমাণে NO_2 থাকে। বজ্র-বিদ্যুতের প্রভাবেও বাতাসে যথেষ্ট পরিমাণ NO_2 উৎপন্ন হয়। এরূপ নানা কারণে সারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতি বছর যে পরিমাণ NO_2 বিমুক্ত হয় তার পরিমাণ প্রায় 5 কোটি টন (5×10^7 tons)। বাতাসের এই NO_2 বৃষ্টির সাথে জলে দ্রবীভূত অবস্থায় ভূপৃষ্ঠের মাটিতে নেমে আসে এবং অবশেষে নাইট্রেট লবণে পরিণত হয় :

$$4NO_2 + 2H_2O + O_2 = 4HNO_3$$

$$4HNO_3 + 2CaO = 2Ca(NO_3)_2 + 2H_2O$$

অত্যন্ত উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধ ছাড়াও NO_2 গ্যাস শ্বাসনালী, ফুস্‌ফুস ইত্যাদির পেশীসমূহের প্রভূত ক্ষতি করে এবং মাত্রাধিক্যে এর প্রভাবে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। তাছাড়া এই NO_2-এর প্রভাবে যে ধোঁয়াশা (Smog) সৃষ্টি হয় আমেরিকার লস্ এঞ্জেলিস্ (Los Angeles) শহরে তা বিশেষভাবে দেখা যায় বছরের অধিকাংশ সময়ে। এর উল্লেখ পরে করা হ'বে।

আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত দেশে মোটরগাড়ী ও ঐ ধরণের যানবাহন হ'তে যে ধোঁয়া নির্গত হয় তাতে CO, NO, NO_2, অদগ্ধ হাইড্রোকার্বন জাতীয় যৌগ ইত্যাদি বায়ুদূষকের পরিমাণ যাতে অত্যন্ত কম থাকে তার জন্য নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হ'য়েছে এবং তার ফলে বায়ু দূষণের পরিমাণ অনেক আয়ত্তাধীন করা সম্ভব। BaO, Cu_2O এবং Cr_2O_3 এর সংমিশ্রণে প্রস্তুত একটি অণুঘটকের (Catalyst) সাহায্যে প্রায় 90% পরিমাণ ঐসব বায়ুদূষকগুলিকে নষ্ট করা সম্ভব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে :

$$2NO + 2Cu_2O = N_2 + 4CuO$$

$$CO + 2CuO = CO_2 + Cu_2O$$

$$4CxHy + (4x + y)O_2 = 4xCO_2 + 2yH_2O$$

সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) আর একটি উল্লেখযোগ্য বায়ুদূষক যা উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর পক্ষেই যে বিশেষ ক্ষতিকারক তা নয় ; প্রাচীন নানা ঐতিহাসিক কীর্তিস্তম্ভও এই অম্লধর্মী গ্যাসের প্রভাবে নষ্ট হয়। 1911 খৃষ্টাব্দে লণ্ডন (London) শহর যে প্রাণঘাতী ধোঁয়াশার কবলিত হয় তাও ঐ SO_2 হ'তে সৃষ্ট। কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জাতীয় খনিজ জ্বালানীতে সাধারণতঃ

অল্পবিস্তর পরিমাণে গন্ধক যুক্ত অথবা মুক্ত অবস্থায় থাকে। এদের দহনের সময় ঐ গন্ধক হ'তে SO_2 উৎপন্ন হয় ঃ

$$S + O_2 = SO_2$$

এ ছাড়া গন্ধকযুক্ত বিভিন্ন ধাতব খনিজ পদার্থ হ'তে ধাতু নিষ্কাষণ করার সময়ও প্রচুর SO_2 উৎপন্ন হয়, যেমন ঃ

$$Cu_2S + 2O_2 = 2CuO + SO_2$$
$$2PbS + 3O_2 = 2PbO + 2SO_2$$

পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানী তৈল শোধনাগারের চুল্লী হ'তে নির্গত গ্যাসেও যথেষ্ট পরিমাণে SO_2 থাকে এবং এই কারণে মথুরা শহরের উপকণ্ঠে যে খনিজ তৈল শোধনাগার সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হ'য়েছে তার ফলে নিকটবর্তী আগ্রা শহরের তাজমহল স্মৃতি সৌধটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'বে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করেন। কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখানো হ'য়েছে যে বর্তমান কলিকাতা শহরের বায়ু বিশেষভাবে দূষিত SO_2, NO_2, CO, অদগ্ধ হাইড্রোকার্বন, ইত্যাদি গ্যাস এবং সূক্ষ্ম অঙ্গার ও অন্যান্য কঠিন বস্তু কণিকার জন্য, এবং এই শহরের বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ স্বাভাবিক নির্মল বাতাস হ'তে প্রায় 3% মত কম। এর প্রধান কারণ শহর ও উপকণ্ঠের নানা শিল্পকারখানা ও শহরের প্রায় অব্যবহার্য্য ইঞ্জিনযুক্ত যানবাহন হ'তে নির্গত ধোঁয়া। আজকাল অনেক বড় বড় শিল্প ও কলকারখানায় বর্তমানে নির্গত ধোঁয়া হ'তে SO_2 শোষণ করে নিয়ে পরে ঐ ধোঁয়া বাতাসে ছাড়ার ব্যবস্থা চালু আছে। এতে কেবল যে পরিবেশ দূষণ কমে তাই নয়, মূল্যবান গন্ধকের অপচয়ও বন্ধ হয়। তা সত্ত্বেও প্রতি বছর সারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রায় আট কোটি (8×10^7) টন পরিমাণ SO_2 ছাড়া হয় যার প্রায় সবটাই নানা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে মাটিতে সালফেট লবণে রূপান্তরিত হ'য়ে জমা হয়। এই SO_2 হ'তে জীবদেহের ক্ষতির একটি প্রধান কারণ হ'লো এই যে এর প্রভাবে জীবকোষের নিউক্লিক অ্যাসিড (Neucleic acids) ইউরাসিল্‌-এ (Uracil)-এ রূপান্তরিত হ'য়ে বিনষ্ট হ'য়।

1911 খৃষ্টাব্দে লণ্ডন শহর যে প্রাণঘাতী ধোঁয়াশার কবলিত হ'য়েছিল তাও বাতাসে প্রচুর SO_2-এর জন্য। এই ধোঁয়াশায় ঐ বছর লণ্ডন শহরে 1150 জন লোকের মৃত্যু হ'য়। দু'টি ভিন্ন ধরনের ধোঁয়াশার কথা আমরা জানি। একটির কারণ SO_2 এবং অন্যটির কারণ NO_2। কয়লা ও খনিজ তৈল জাতীয় জ্বালানীর দহনের সময় SO_2 এবং সূক্ষ্ম অদগ্ধ কার্বন কণিকার সৃষ্টি হয়। ঐ SO_2 কিছু পরিমাণে সূর্যালোকের প্রভাবে বাতাসের জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে বাতাসে সূক্ষ্ম তরল সালফিউরিক অম্ল (H_2SO_4) কণিকা উৎপন্ন করে। বাতাসের ধূলিকণার সাথে H_2SO_4-এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা মিশে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। SO_2 এবং H_2SO_4 দুইই মানুষের শ্বাসনালীর পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর এবং এদের প্রভাবেই লণ্ডন শহরের ধোঁয়াশায় বহু লোকের প্রাণনাশ হয়। এককোটি ভাগ বাতাসে মাত্র কয়েকভাগ SO_2 ক্ষতিকারক এবং ঐ পরিমাণ 50 ভাগ হ'লে তা মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে।

আমেরিকার লস্‌ এঞ্জেলেস শহরের (Los Angeles) যে ধোঁয়াশা বিখ্যাত (বা কুখ্যাত) তার কারণ NO, NO_2, HNO_3 কণিকা, O_3, নানা প্রকার পেরোক্সো (Peroxo) যৌগ, নানা ধরনের হাইড্রোকার্বন (Hydrocarbon), ইত্যাদি। কিন্তু এতে SO_2 থাকেনা বললেই চলে।

ওজোন (Ozone), O_3, অপর একটি বায়ুদূষক। খনিজ তৈলজাত জ্বালানী ব্যবহার হয় এমন সব যানবাহনের ইঞ্জিন হ'তে নির্গত গ্যাসের উপর সূর্যালোকের প্রভাবে O_3 উৎপন্ন হয় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ঃ

$$NO + \tfrac{1}{2}O_2 = NO_2$$
$$NO_2 = NO + O$$
(সূর্যালোকের প্রভাবে)
$$O_2 + O + A = O_3 + A$$

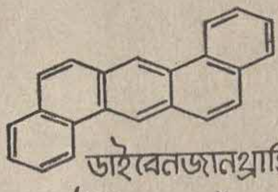
O_2-এর সাথে O যুক্ত হ'য়ে O_3 উৎপন্ন করলে যে প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন হয় তা সরিয়ে না ফেললে O_3 পুনরায় ভেঙ্গে গিয়ে O_2 উৎপন্ন করে ঃ

$$2O_3 = 3O_2$$

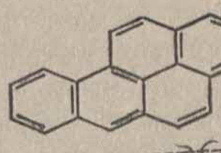
ঐ নির্গত শক্তিকে সরিয়ে ফেলতে অন্য কোনও বস্তু কণিকার প্রয়োজন এবং উপরের সমীকরণে ঐ কণিকাকে A দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশুদ্ধ বাতাসে O_2-এর পরিমাণ 20% কিন্তু মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিশুদ্ধ O_2 সেবনে কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু এক কোটি ভাগ বাতাসে O_3-এর পরিমাণ 3 হতে 10 ভাগ (যা সহজেই হ'তে পারে উপরের বর্ণিত পদ্ধতিতে) হ'লে এবং সেই বাতাসে শ্বাসকার্য চালালে 15 মিনিট হ'তে 2 ঘণ্টার মধ্যে প্রাণীবিশেষের প্রভূত ক্ষতি হয়। এর ফলে শ্বাসনালীর কষ্ট, অবসন্ন ভাব, গায়ের উত্তাপ হ্রাস ও রাতকানা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভূ-পৃষ্ঠের সমুদ্রতলের নিকটবর্তী অঞ্চলের বিশুদ্ধ বাতাসে O_3-এর পরিমাণ 0.02% মত। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে (ভূ-পৃষ্ঠ হ'তে 10-12 কিলোমিটার উচ্চতায়) O_3-এর মাত্রা অনেক বেশী। সেখানে সূর্যালোকের অতি বেগুনী (Ultra-violet) রশ্মির প্রভাবে O_2 হ'তে O_3-এর উৎপত্তি হয় এবং ঐ অঞ্চলে O_3-এর পরিমাণ বাতাসের এক-কোটি ভাগের একশ ভাগ মত। এর একটি পরম উপকারিতা এই যে এভাবে জীবদেহের পক্ষে হানিকর সূর্যালোকের অতি-বেগুনী রশ্মির অনেকটাই শোষিত হ'য়ে যায়।

কাঠ, কয়লা, খনিজ তৈলজাত নানা জ্বালানী তৈল (পেট্রল, ডিসেল, কেরোসিন, ইত্যাদি) প্রভৃতির অসম্পূর্ণ দহনের ফলে নানাপ্রকার হাইড্রোকার্বন জাতীয় যৌগ (যা অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের সংযুক্তির ফলে উৎপন্ন) এবং হাইড্রোজেন উপজাত অন্যান্য কয়েক প্রকারের যৌগ বাতাসে এসে মেশে। কলকারখানা হ'তে নির্গত ধোঁয়া এবং পেট্রল, ডিজেল প্রভৃতি ব্যবহার হয় এমন সব যন্ত্রযান হ'তে নির্গত ধোঁয়া এবং খনিজ তৈল শোধনাগারের নির্গত ধোঁয়াতে এসব জাতীয় পদার্থ থাকে এবং এদের দ্বারাও বায়ু দূষিত হয়। কয়েক ধরনের বহু-মণ্ডলাকৃতির হাইড্রোকার্বন (Polycyclic hydrocarbons) বিশেষভাবে ক্ষতিকারক, কারণ এদের প্রভাবে ক্যানসার রোগ সৃষ্টি হয়। এমন কয়েকটি বিশেষ পরিচিত যৌগের উদাহরণ ১নং চিত্রে দেখানো হ'ল। এসব কারণে গ্রামাঞ্চলের মুক্ত বাতাস অপেক্ষা বড় শহরের

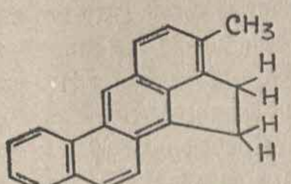
বাতাস অনেক বেশী হানিকর। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বড় বড় শহরের অধিবাসীদের মধ্যে ফুস্‌ফুসের ক্যান্‌সার রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। এর কারণ ঐ সব অঞ্চলের বাতাসে বেন্‌জপাইরিন জাতীয় ক্যানসার উৎপাদনের উত্তেজক পদার্থের আধিক্য



ডাইবেনজানথ্রাসিন
(Dibenzanthracene)



বেন্‌জপাইরিন
(Benzpyrin)



মিথাইল কোলানথ্রিন
(Methyl Cholanthrene)

১২ চিত্র

(গড়পরতা প্রায় 7 মাইক্রোগ্রাম ($7\mu g$) প্রতি 1000 বর্গমিটার বাতাসে; কোথাও কোথাও এর পরিমাণ $60\mu g$ পর্যন্ত দেখা গেছে; ($\mu g = 10^{-6} g$)। 1958 খৃঃ ইংলণ্ডে প্রায় 25 লক্ষ টন কয়লা পোড়ান হয় এবং এর ফলে যে ধোঁয়া উৎপন্ন হয় তাতে মোট 750 টন বেন্‌জপাইরিন ছিল বলে একটি সমীক্ষায় বলা হ'য়েছে।

বায়ু দূষণ প্রসঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড, CO_2, এর উল্লেখও বিশেষ বাঞ্ছনীয়। সাধারণ বাতাসে CO_2 এর পরিমাণ 0·03% মত এবং এই CO_2 উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন। এই CO_2 এবং জল (H_2O) হ'তে উদ্ভিদ্ তার দেহের সবুজ কণিকা ও সূর্যালোকের সাহায্যে সালোক সংশ্লেষণ (Photo-synthesis) পদ্ধতিতে শর্করা জাতীয় (Carbohydrates) খাদ্য প্রস্তুত করে O_2 বিমুক্ত করে। প্রাণী ঐ O_2 আহরণ করে শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে এবং পরিবর্তে CO_2 বাতাসে ছেড়ে দেয়। কিন্তু বেশ কয়েক দশকের পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে যে বাতাসে CO_2 এর মাত্রা ক্রমে অল্প অল্প বেড়েই চলেছে। এই বৃদ্ধি উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়; বরঞ্চ নানাস্থানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে লেটুস্, টমাটো, ইত্যাদি গাছ 8-20% CO_2 আছে এমন বাতাতে বাড়তে দিলে তাদের ফলন খুব ভাল হয়। এই অবস্থায় গাছের বৃদ্ধি 115% বাড়ে, টমাটোর আকার বৃহৎ হয় এবং তাতে ভাইটামিন-সি (Vitamin-C) এবং শর্করার পরিমাণও বেশী হয়। তাছাড়া এমন আবহাওয়ায় গাছের ছত্রাক্, জীবাণু এবং কীট-পতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা খুব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তার অপকারিতাও অনেক। প্রথমতঃ এর ফলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে। সূর্যালোকের তাপরশ্মি ভূপৃষ্ঠ হ'তে প্রতিফলিত হয় এবং ঐ তাপশক্তি CO_2 শুষে নেয়। সাধারণভাবে বাতাসে যে সামান্য পরিমাণ CO_2 আছে তার প্রভাবে ঐ প্রতিফলিত তাপের খুব কম ভাগই বায়ুমণ্ডলে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু CO_2 এর পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পেলে ঐ প্রতিফলিত তাপের অনেকটাই শোষিত হ'য়ে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা খুব বাড়িয়ে তুলবে। একটি হিসাবে বলা হ'য়েছে যে 1950 খৃষ্টাব্দে বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ CO_2 ছিল তার তুলনায় 2020 খৃষ্টাব্দে CO_2-এর পরিমাণ 180% বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা গড়পড়তা 9°C বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের বরফের স্তরের অনেকটা গলে জল হ'য়ে সমুদ্র জলের উচ্চতা প্রায় 4 ফুট বাড়িয়ে তুলবে এবং এর ফলে সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি প্লাবিত হ'বার খুব সম্ভাবনা। তা ছাড়া বরফ গলে যাওয়ার ফলে মেরু প্রদেশের উপর চাপ অনেক হ্রাস পাবে এবং অন্যত্র তা বৃদ্ধি পাবে যার ফলে সাংঘাতিক ভূকম্পন, আগ্নেয়গিরি হ'তে অগ্ন্যুৎপাত, ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে পৃথিবীর বুকে বড় রকমের ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটাও অসম্ভব নয়। শিল্প উন্নয়নের সাথে সাথে খনিজ জ্বালানীর ব্যবহারও বেড়ে যাওয়ার ফলে এবং বন কেটে বসতি স্থাপনের ফলে বায়ুমণ্ডলের CO_2-এর মাত্রা ক্রমশঃ অল্প অল্প বৃদ্ধি পাচ্ছে। খনিজ জ্বালানীর বিকল্প হিসাবে পারমাণবিক শক্তি ও জল হ'তে কোনও সহজ পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে জ্বালানী হিসাবে তার ব্যবহার এবং বন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এই সম্ভাব্য বিপদ হ'তে পৃথিবীর জীব জগৎকে বাঁচাতে পারে।

সীসা (Lead, Pb) ধাতু জীবদেহের পক্ষে বিশেষক্ষতিকারক। মোটর গাড়ীতে যে পেট্রোল (খনিজ তৈলজাত জ্বালানী) ব্যবহার করা হয় তাতে সামান্য পরিমাণে টেট্রাইথাইল-লেড (Tetraethyl-lead), $Pb(C_2H_5)_4$, এই নামের একটি যৌগ থাকে। ইঞ্জিনে পেট্রোলের দহন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য এই $Pb(C_2H_5)_4$ 'অ্যান্টিনক্' (Anti-knock) হিসাবে ব্যবহার হয়। ইঞ্জিনে পেট্রোল দহনের সময় $Pb(C_2H_5)_4$ হ'তে ঐ সীসার কয়েকটি যৌগ উৎপন্ন হয়ে ইঞ্জিন হ'তে নির্গত গ্যাসের সাথে বেড়িয়ে আসে। এভাবে সারা পৃথিবীর পরিবেশে বছরে প্রায় 2 লক্ষ (2×10^5) টন পরিমাণ সীসা এসে মেশে। এক কিউবিক মিটার ($1 m^3$) পরিমাণ বাতাসে সীসার পরিমাণ $2{\cdot}5\mu g$ ($2{\cdot}5 \times 10^{-6} g$); এই পরিমাণ $10\mu g$ মাত্রার বেশী হ'লে তা বিশেষ হানিকর। কিন্তু বড় বড় শহরে, যেখানে দিনের বেলায় প্রচুর মটর গাড়ী চলে, সেখানে বাতাসে সীসার পরিমাণ ঐ মাত্রার অনেকগুণ পর্যন্ত হ'তে পারে। আমেরিকার লস্ এঞ্জেলেস্ (Los Angeles) শহরের পথে দিনের বেলায় গাড়ীর আধিক্যে ঐ শহরের বাতাসে সীসার পরিমাণ $54\mu g/m^3$ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এই সীসা বাতাস হ'তে ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগে চলে আসে এবং পরে স্থলভাগ হ'তে খাদ্যশস্য, শাকসব্জি ও পানীয়ের মাধ্যমে জীবদেহে প্রবেশ করে। নানা খাদ্যদ্রব্যে সীসার

পরিমাণ 100-300μg/kg। একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রতিদিন তার খাদ্য ও পানীয় হ'তে এবং শ্বাসকার্যের সময় বাতাস হ'তে যে পরিমাণ সীসা গ্রহণ করে তা 1·7 mg মত। কিন্তু মূত্রগ্রন্থী ও বৃহদ্ অন্ত্রের মাধ্যমে একটি মানুষের দেহ হ'তে 2 mg পরিমাণ সীসা স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিদিন নিষ্কাশিত হওয়া সম্ভব। এই কারণে সাধারণ অবস্থায় সীসা হ'তে মানবদেহে বিষক্রিয়া হয়না। কিন্তু কোনও প্রকারে দেহে 2mg এর বেশী সীসা প্রবেশ করলে সেই বেশী পরিমাণ সীসা দেহের পেশীর কোষে ও অস্থির মজ্জায় জমা হ'য়ে বিষক্রিয়া ঘটায় এবং এর ফলে মস্তিষ্কের বিকৃতি, স্নায়বিক বিকার, ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। সীসার সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে প্রোটিন ও এন্‌জাইম (Enzyme, উৎসেচক) বিনষ্ট হয় এবং এন্‌জাইম্‌-গুলি তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। প্রোটিন ও এনজাইমের —SH গ্রুপের মাধ্যমে এই বিক্রিয়া ঘটে তা জমাট বেঁধে যায় (Denaturation)ঃ

$$2-\overset{|}{C}H-SH+Pb^{2+}=(-\overset{|}{C}H-S)_2Pb+2H^+$$

সীসার প্রভাবে জীবকোষের DNA এবং RNA-ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জীবকোষের অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটায়।

সীসার এই বিষক্রিয়ার দরুণ সীসার কোনও যৌগের পরিবর্তে পেট্রোলে অন্য কোনও ধাতব যৌগ ব্যবহার করে একই ফললাভ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে নানা গবেষণা হ'য়েছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে সুফলও পাওয়া গেছে, যেমন লোহের একটি যৌগ ফেরোসিন (Ferrocene), $Fe(C_5H_5)_2$, এবং ম্যাঙ্গানিজের একটি যৌগ, $(C_5H_4 \cdot CH_3)Mn(CO)_3$। ম্যাঙ্গানিজের এই যৌগটি $Pb(C_2H_5)_4$ অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী বলে দাবী করা হয়।

যদিও লোহ (Fe), তাম্র (Cu), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), দস্তা (Zn), ম্যাঙ্গানিজ (Mn), মলিবডেনাম (Mo), ইত্যাদি ধাতব পদার্থ নির্দিষ্ট মাত্রায় জীবদেহের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এদের ক্ষেত্রেও অধিকমাত্রায় বিষক্রিয়া দেখা যায়। মাত্রাধিক যে পরিমাণে খাদ্যে থাকলে এগুলি ক্ষতিকারক তার কয়েকটির মান হ'ল এরূপ ঃ

Mn > 1000 ppm, Cu > 100 ppm,
Mo ~ 20 ppm (1 ppm = 1 in 10^6 parts,
অর্থাৎ 10 লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র)।

পূর্বে বর্ণিত সীসার (Pb) মত ক্যাডমিয়াম (Cd), পারদ (Hg), সেলেনিয়াম (Se), আরসেনিক (As), ইত্যাদিও বিশেষভাবে ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত এবং এদের ক্ষেত্রেও বিষক্রিয়ার কারণ সীসার মতই।

পারদের একটি ধর্ম এই যে এর দ্বারা দূষিত জল হ'তে ঐ পারদ সহজেই মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হ'য়ে সেখানে থেকে যায়। সাধারণতঃ সামুদ্রিক মাছের শরীরে পারদের মাত্রা 0·02—0·2 ppm; কিন্তু যেখানে সমুদ্রগর্ভে কলকারখানা হ'তে পারদের দ্বারা দূষিত জল নিয়মিত এসে মিশছে, সেখানে ঐ পারদের মাত্রা মাছের শরীরে অত্যন্ত বেশী হয় ($\geqslant$ 1 ppm)। এ ধরনের মাছ নিয়মিত খেলে পারদের প্রকট বিষক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়। জাপানের কুখ্যাত মিনামাটা রোগের কারণ এই পারদ দূষিত সামুদ্রিক মাছ।

বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্প ও কলকারখানায় ব্যবহৃত জল যা নদী-নালা, হ্রদ অথবা সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হয় তাতে অন্যান্য যেসব রাসায়নিক বিষাক্ত পদার্থ থাকে তার মধ্যে প্রধান হ'লো সায়ানাইড (CN^-), ক্রোমেট (CrO_4^{2-}), নাইট্রেট্ (NO_3^-), নাইট্রাইট্ (NO_2^-), ফ্লুরাইড্ (F^-), ফস্‌ফেট (PO_4^{3-}), ইত্যাদি লবণ। চাষের জন্য জমিতে যে সব রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় তা হ'তেও নাইট্রেট্, ফস্‌ফেট, ইত্যাদি জলে ধুয়ে নদী, নালা, খাল, বিল, হ্রদ, সমুদ্র, ইত্যাদি জলাশয়ে চলে আসে। নাইট্রোজেন যুক্ত অধিকাংশ জৈব এবং অজৈব যৌগ হ'তেও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে এক ধরনের ব্যাক্‌টেরিয়ার সাহায্যে নাইট্রাইট্ এবং নাইট্রেট উৎপন্ন হয়। কাপড়-চোপড়, বাসন, ইত্যাদি পরিষ্কার করার জন্য যে সব কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত নানা রাসায়নিক যৌগের সংমিশ্রণ পরিষ্কারক (Detergent) হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাতেও প্রচুর ফস্‌ফরাস ঘটিত যৌগ থাকে যা জলের সঙ্গে মিশে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে সরলতর ফস্‌ফেট লবণে রূপান্তরিত হয়। এভাবে প্রতি বছর প্রায় 25×10^7kg ফস্‌ফেট জলে এসে মিশছে। পানীয় জলে 1·7 ppm মাত্রা পর্যন্ত ফ্লুরাইড লবণ দন্তক্ষয় রোধ করার জন্য উপকারী, কিন্তু অধিক মাত্রায় এটি ক্ষতিকারক। পানীয় জলে নাইট্রেট্ ও নাইট্রাইট বিশেষ হানিকর, বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে। নাইট্রাইটের প্রভাবে রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তাতে তার অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা নষ্ট হ'য়ে যায় এবং সায়ানোসিস্ (শরীর নীল হয়ে যাওয়া) রোগে মানুষ মারা যায়।

নদী, নালা, খাল, বিল, পুষ্করিণি ও হ্রদের জলে নাইট্রোজেন ঘটিত এই দুটি লবণ ও ফস্‌ফেট বেশী মাত্রায় থাকলে সে জলে সহজেই কচুরীপানা, শ্যাওলা ও এক প্রকার জলজ গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় এবং এর ফলে জলের উপরে একটি আস্তরণ সৃষ্টি হওয়ায় জলে বাতাসের অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়া বিঘ্নিত হয় যার ফলে জলের দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গিয়ে মাছ ইত্যাদি জলচর প্রাণীর জীবন ধারণ বিপন্ন হয়। জলজ উদ্ভিদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে ক্রমে নদী, হ্রদ, ইত্যাদি মজে বুজে কালক্রমে স্থলভাগে পরিণত হয় (Eutrophication)।

ক্রোমেট (CrO_4^{2-}) এর বিষক্রিয়া দু-কারণে ঃ প্রথমতঃ এর অত্যধিক জারণ ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়তঃ বিজারিত হয়ে CrO_4^{2-} হ'তে যে Cr^{3+} উৎপন্ন হয় তাও বিষাক্ত, যদিও অতি স্বল্প মাত্রায় ক্রোমিয়াম মানবদেহের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক (70 kg ওজনের একটি পূর্ণাবয়ব মানব দেহে মাত্র কয়েক mg পরিমাণ)।

সায়ানাইড (CN^-) এর বিষক্রিয়া ঘটে এই কারণে যে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ (Cytochrome oxidase) নামে একটি উৎসেচকে যে লোহ আছে তা সায়ানাইডের সাথে যুক্ত হ'য়ে ঐ উৎসেচকের কার্য্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এই উৎসেচকটির একটি

প্রধান কাজ হ'লো জীবদেহে প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেওয়ার জন্য যে জারণ প্রক্রিয়া আবশ্যক সেই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করা, যথা ঃ

$$MbH_2 + \tfrac{1}{2}O_2 \xrightarrow{\text{Cytochrome oxidase}} Mb + H_2O + \text{energy}$$

এই জারণ প্রক্রিয়া আসলে এই প্রকার ঃ

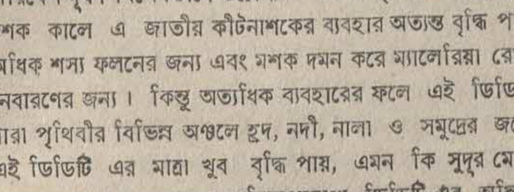
$$2Fe^{2+} \longrightarrow 2Fe^{3+} + 2e$$
$$MbH_2 + 2Fe^{3+} \longrightarrow Mb + 2H^+ + 2Fe^{2+}$$
$$\tfrac{1}{2}O_2 + 2e \longrightarrow O^{2-}$$
$$2H^+ + O^{2-} \longrightarrow H_2O$$

সায়ানাইডের প্রভাবে ঐ উৎসেচক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কারণ উৎসেচকটির Fe^{2+} CN^- এর সাথে যুক্ত হয়ে ইলেকট্রন ছাড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ঃ

$$\text{Cytochrome oxidase (Fe)} + CN^- \longrightarrow \text{Cytochrome oxidase (Fe)}\ldots CN^-$$

তা ছাড়া CN^- হিমোগ্লোবিনের Fe^{2+} এর সাথেও যুক্ত হ'তে পারে এবং তার ফলে O_2 ধরবার ক্ষমতা হিমোগ্লোবিন হারিয়ে ফেলে।

ডিডিটি (DDT) জাতীয় কীটনাশক পদার্থের দ্বারা পরিবেশ দূষণ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 1940 খৃষ্টাব্দে হ'তে এক দশক কালে এ জাতীয় কীটনাশকের ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় অধিক শস্য ফলনের জন্য এবং মশক দমন করে ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণের জন্য। কিন্তু অত্যধিক ব্যবহারের ফলে এই ডিডিটি দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে হ্রদ, নদী, নালা ও সমুদ্রের জলে এই ডিডিটি এর মাত্রা খুব বৃদ্ধি পায়, এমন কি সুদূর মেরু-প্রদেশে জমা থাকা বরফেও পরিমাপযোগ্য ডিডিটি-এর অস্তিত্ব দেখা গেছে। এই সব জলে যে সব মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণী জন্মায় তাদের শরীরের চর্বিতে এই ডিডিটি জমতে থাকে কারণ ডিডিটি সহজ উপায়ে দেহাভ্যন্তরেও জৈবিক ক্রিয়ায় বিশ্লিষ্ট হয়ে নষ্ট হয় না। ঐ সব জলচর প্রাণী খাদ্য হিসাবে যে সব জীবজন্তু বা মানুষ গ্রহণ করে সে সব প্রাণীর দেহে ক্রমে ডিডিটি-এর মাত্রা খুব বেশী হয়ে নানা রকম বিষক্রিয়া ঘটায়। এই ডিডিটি-এর প্রকোপে অনেক অঞ্চলের ঈগল জাতীয় শিকারী পাখীদের দেহের ক্যালসিয়াম রেচন প্রক্রিয়া সমধিক ব্যাহত হওয়ায় ঐ পাখীদের ডিমের খোলায় ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অত্যন্ত কমে যাওয়ায় তা খুব পাতলা ও ভঙ্গুর হ'য়ে পড়ে। এই ভাবে ঐ সব পাখীদের বংশবৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ায় ঐ সব অঞ্চলে



DDT Parathion

তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে উন্নত দেশগুলিতে ডিডিটি, ডাই-অ্যালড্রিন, হেপ্‌টাক্লোর জাতীয় কীটনাশকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তার পরিবর্তে প্যারা-থিয়ন জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার হ'চ্ছে যা অপেক্ষাকৃত সহজেই বিশ্লিষ্ট হয়ে বিষক্রিয়াবিহীন দ্রব্যে পরিণত হয়।

শহরের পয়ঃপ্রণালীর ময়লা জল নদী, নালা, হ্রদ কিংবা সমুদ্রে পড়ে ঐ সব প্রাকৃতিক জলের উৎসগুলিকে কলুষিত করে। এই ময়লা জলে দ্রবীভূত অথবা ভাসমান অবস্থায় নানা প্রকার জৈব এবং অজৈব জলদূষক পদার্থ এবং রোগজীবাণু থাকে। অজৈব দূষকগুলি প্রধানতঃ ক্লোরাইড (Cl^-), নাইট্রেট (NO_3^-) ফসফেট (PO_4^{3-}) প্রভৃতি লবণ; জৈব দূষকগুলি প্রধানতঃ জীবদেহ নিঃসৃত। পয়ঃপ্রণালীর এই দূষিত জল প্রাকৃতিক অগাধ জলাধারে পড়ে লঘু হয়ে পড়ে এবং এই অব্যবস্থায় সাধারণতঃ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ব্যাক্‌টেরিয়ার মাধ্যমে অধিকাংশ জৈব দূষকগুলি জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত হ'য়ে প্রাণীদেহের পক্ষে অনিষ্টকারী নয় এমন সব সরল ধরনের পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়, কিন্তু এই প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরে হ'লে কোনও ক্ষতি হয় না কারণ বাতাস হ'তে অক্সিজেন জলে ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হ'য়ে জলের দ্রবীভূত অক্সিজেনের সাম্য-মান বজায় থাকে এবং জলচর প্রাণীরও তাই কোনও ক্ষতি হয় না; কিন্তু দূষণের পরিমাণ অত্যধিক হ'লে এই ভারসাম্য বজায় থাকে না এবং জলে অক্সিজেনের অভাব হেতু মাছ ইত্যাদি জলচর প্রাণী ঐ জলে বেঁচে থাকতে পারে না। এর ফলে ঐ সব অঞ্চলে মাছের অভাবজনিত নানা সংকট উপস্থিত হয়। জলে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে সেই জলে অক্সিজেন অনির্ভর ব্যাক্‌টেরিয়ার দল ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং এরাই নানা জৈবদূষক নষ্ট করে সরলতর যে সব পদার্থ উৎপন্ন করে তাদের মধ্যে আছে নানা বায়বীয়পদার্থ যেমন CH_4, NH_3, PH_3, H_2S, ইত্যাদি। এই PH_3 ও H_2S অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং NH_3 অত্যন্ত ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত। এদের উৎপত্তির ফলে গুরুতর পরিবেশ দূষণ ঘটে। নানা প্রকার রাসায়নিক ও ভৌতিক পদ্ধতিতে পয়ঃপ্রণালীর জল পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ করে এর দ্বারা প্রাকৃতিক জলের উৎসগুলির দূষণ রোধ করা সম্ভব এবং এ ধরনের নানা পদ্ধতি উন্নত দেশগুলিতে ব্যবহার করা হয়। কলকারখানার নিঃসৃত জলের দূষিত পদার্থগুলিকেও নানা পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় করা হয় এ সব দেশে।

জল দূষণের আর একটি কারণ হল তাপজনিত দূষণ। বহু শিল্প-কারখানায় শীতলীকরণের জন্য জল ব্যবহৃত হয়। বড় বড় কলকারখানা হ'তে বিপুল পরিমাণে অত্যধিক উষ্ণ জল নদী ও হ্রদে এসে পড়লে সেই প্রাকৃতিক জলের উষ্ণতা খুব বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কোথাও কোথাও নদীর জল থেকে উষ্ণ বাষ্প উঠছে এমনও দেখা গেছে। জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন এর ফলে অত্যন্ত ব্যাহত হয়—প্রত্যক্ষভাবে তাপজনিত ও পরোক্ষভাবে অধিক তাপমাত্রায় জলে অক্সিজেনের দ্রাব্যতা এবং ফলতঃ তার পরিমাণ কমে যাওয়ার দরুণ।

সমুদ্রের জল সব চাইতে দূষিত; নদীর জল তার উৎস হ'তে সমুদ্র পর্যন্ত চলার পথে যত কিছু নোংরা এবং দূষিত পদার্থ কুড়িয়ে নিয়ে চলে তা সব এসে সমুদ্রে জমা হয়। সমুদ্রজলে

দ্রবীভূত লবণ এবং ঐ জাতীয় পদার্থের মোট পরিমাণ প্রায় 3·5%। এই লবণাক্ত জল যে কোনও ব্যবহারের পক্ষে অনুপযোগী। এই জল হ'তে কিন্তু সুপেয় পানীয় জল তৈরীর নানা পদ্ধতি জানা আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যেখানে প্রচুর সূর্যালোক বছরের প্রায় সব সময় পাওয়া যায়, সেখানে সৌর তাপের সাহায্যে পাতন পদ্ধতিতে সমুদ্রজল হ'তে সুপেয় জল তৈরী করা খুব সহজসাধ্য।

পারমানবিক চুল্লীর সাহায্যে যে সব জায়গায় শক্তি উৎপাদন করা হয় সে সব চুল্লী হ'তে যে সব অব্যবহার্য্য দ্রব্য সমুদ্র গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয় তাতে বিভিন্ন রকমের তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে এবং এগুলিও বিশেষভাবে সমুদ্রের জল দূষণে সাহায্য করে, কারণ সব রকমের তেজস্ক্রিয় পদার্থই জীবকোষের পক্ষে বিশেষ হানিকর। সেই কারণে পারমাণবিক পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণের চিত্রটি উপরে তুলে ধরা হ'য়েছে। এই দূষণের যথাযথ মোকাবিলা করার জন্য যে সব নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় সে সম্বন্ধেও আমরা আজ অবহিত আছি কিন্তু স্থানাভাবে তার বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রেই নানা রাসায়নিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এগুলি সম্ভব হ'য়েছে। পরিবেশ দূষণ এবং সেই দূষণ নিরোধের ক্ষেত্রে রসায়নের ভূমিকা নিঃসন্দেহে মুখ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ।

অম্ল-বৃষ্টি !

এ্যাসিড-রেন (acid rain) বা অম্ল-বৃষ্টির কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। কলকারখানার চিমনীর ধুঁয়ো, পাকশালের ধুঁয়ো, বেগবান যানের কালো ধুঁয়ো জাত পদার্থ সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইডস্ বাতাসে ভাসতে ভাসতে কখনো মেঘ বা বৃষ্টির জলকণায় বাহিত হয়ে জমা হয় মাটিতে, গাছপালায়, নদী-সমুদ্রের জলে, বড় বড় অট্টালিকা, গম্বুজ, মন্দির, মসজিদে ও শহীদ মিনারে।' বায়ুমণ্ডলে অথবা ভূপৃষ্ঠে এই সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইডস জলকণার সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে তৈরী করে এ্যাসিড় বা অম্ল। যখনই তুষারপাত, কুয়াসা বা বৃষ্টির জলকণায় এই অম্ল মাটিতে নেমে আসে তখন আমরা তাকে অম্ল-বৃষ্টি বলি। অম্ল-বৃষ্টি আজ পৃথিবীর সব দেশেই এক বড় সমস্যা। বিশেষ করে কানাডা, আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান দেশগুলোতে, উত্তর আমেরিকায় অম্ল-বৃষ্টির মাত্রা লক্ষ্য করা গেছে 4-4.6। অম্ল-বৃষ্টিতে ক্ষতি হচ্ছে লেকের জল, পুকুরের জল, নদীর জল, গাছপালা, চাষের জমি, মাঠের ফসল, সুইডেনের প্রায় 20,000 লেক, আমেরিকা, কানাডার হাজার হাজার লেক নষ্ট হতে বসেছে অম্ল-বৃষ্টিতে। শুধু তাই নয়, জলজ-প্রাণী, সবুজ এ্যালগি, স্যাওলা, নষ্ট হচ্ছে। মাছের ডিম ফুটছে না, যদিও বা ফুটছে, প্রজন্ম বিগলাঙ্গ হচ্ছে। মাছ বাড়ছে না, গভীর অরণ্যানী ধ্বংস হচ্ছে, গাছপালা শুকিয়ে যাচ্ছে; চাষের জমি অনুর্বর হচ্ছে, আমাদের শ্বাস-নালীরও প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে, এনফাইসিমা ও ব্রংকাইটিস নিত্যসাথী হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভারতে অম্ল-বৃষ্টি এখনো পর্যন্ত খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে নি। ভাবা এ্যাটোমিক রিসার্চ সেণ্টারের তত্ত্বাবধানে অম্ল-বৃষ্টি নিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সমীক্ষা চালান হয়, ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলো চিহ্নিত হয়েছে দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর, নাগপুর, ট্রম্বে ও বোম্বের চেম্বারলীন। আগ্রার কাছাকাছি মথুরা তেল শোধনাগার থেকে সৃষ্ট অম্ল-ধোঁয়ায় তাজমহলের স্থানে স্থানে গর্ত হয়েছে। এখন যে সমস্ত নতুন নতুন সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যাণ্ট বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, তা থেকে আগামী দিনে যে প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা প্রয়োজন। পাওয়ার প্ল্যাণ্ট জাত সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইডস [যেগুলো অম্ল-বৃষ্টির তৈরীতে সাহায্য করে] বন্ধ করতে হলে লাইম ফিলটার লাগানো একান্তই প্রয়োজন। এছাড়া কল-কারখানাগুলোতে যেখানে কয়লা পোড়ানোর প্রয়োজন সেখানে কয়লার সঙ্গে চুন মিশিয়ে পোড়ালে সালফার ডাই-অক্সাইড তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

ডাঃ প্রদীপ কুমার দাস।

[*Source* : Science-Service, August 1-15, 1983 Vol, 2, No. 15]

পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

মনীশ প্রধান

আজকাল 'পরিবেশ' কথাটি পথে-ঘাটে, স্কুল-কলেজে নানা জায়গায় শোনা যায়। পাড়ায় পাড়ায় ছোট-বড় ক্লাবের সভ্যরাও পরিবেশ সম্বন্ধে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। সরকারও এখন পরিবেশের গুরুত্ব বুঝেছেন। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের নতুন মন্ত্রিসভায় পরিবেশ সম্পর্কে এক দপ্তর সৃষ্টি হয়েছে। সেই দপ্তর পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একজন প্রবীণ মন্ত্রীমহোদয়কে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, যে পরিবেশ সম্পর্কে সরকার-জনসাধারণ উভয়েই সজাগ হয়ে উঠেছেন।

পরিবেশ বলতে আমরা কি বুঝি? শহর বা গ্রাম যেখানে আমরা বাস করি, সেখানের জল-বাতাস, বাসগৃহ, পথ-প্রান্তর, ছোট বড় নানা ধরনের গাছপালা ইত্যাদির সমষ্টি নিয়েই আমাদের 'পরিবেশ'।

এই 'পরিবেশ' আজ নানাভাবে দূষিত হয়ে উঠছে। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। একটু খতিয়ে দেখা যাক।

কল-কারখানার চিমনী থেকে নির্গত ধোঁয়া পরিবেশ দূষণের একমাত্র কারণ নয়। কল-কারখানার ধোঁয়া ছাড়া পরিবেশ দূষণ নানা কারণে, নানা ভাবে হতে পারে। আর তার জন্য সবাই দায়ী।

আজকাল জন-বিস্ফোরণের প্রভাবে এমন ঘরে আমরা বাস করতে বাধ্য হচ্ছি—যে ঘরে দিনের কোন সময় আলো দেখা দেয় না, বাতাস আসে না। জন্তু-জানোয়ার সেই ঘরে থাকতে পারে না, কিন্তু জায়গার অভাবে আমাদের থাকতে হচ্ছে।

আবার ঘরের ভিতরে আলোর অভাবে দেওয়াল, মেঝে স্যাঁৎসেঁতে; কোথাও হয়ত ছত্রাক জমে আছে। ঘরের আসবাব, বই-খাতার উপরে হয়ত ধুলো জমে আছে। নিয়মিত পরিষ্কার না করা হলে নিশ্চয়ই ধুলো জমবে! দমকা বাতাস বা পাখার হাওয়ায় সেই ধুলো উড়ে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

ঘর ছেড়ে বাইরে ফুটপাথের দিকে তাকালে দেখা যাবে চট, ত্রিপল বা প্লাসটিকের ছাউনি দিয়ে শ'য়ে, শ'য়ে মানুষ সেখানে আস্তানা করেছে। তাদের মাথার ওপর খোলা আকাশ; তবে বৃষ্টি পড়লে কোনরকমে আচ্ছাদনের নীচে আশ্রয় নেয় তারা। সভ্যতার আদিযুগে মানুষ পাহাড়ে প্রান্তরে এইভাবে বাসা বেঁধে বাস করত। এদের জীবনধারণের উপায় বিচিত্র। কেউ ঠেলা বা রিক্‌সা চালায়, আবার অনেকে আবর্জনার ভিতর থেকে ফেলে দেওয়া কাগজ, ধাতুর টুকরো, প্লাস্টিকের টুকরো সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে সংসার চালায়। অন্যেরা হয়ত রাস্তায় ফেলে দেওয়া ছাই থেকে কয়লার টুকরো সংগ্রহ করে বিক্রয় করে। এরা ফুটপাথের বাসিন্দা। রাস্তাতেই এরা স্নান করে, রান্না করে, খায় এবং মল-মূত্র ত্যাগ করে। অতএব এদের দৌলতে আশেপাশের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এখানেই এদের সন্তান জন্মায়, এখানেই এদের মরতে দেখা যায়। কি ভয়াবহ অবস্থা!

আবর্জনা: শহর অঞ্চলের যেখানে উচ্চ আয়ের লোকেরা বাস করেন, সেই এলাকার পথ মোটামুটি পরিচ্ছন্ন দেখা যায়। যেখানে জনবসতি বেশী, যেখানে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর লোক বাস করে সেই এলাকায় পথে আবর্জনার স্তূপ দিনের পর দিন পড়ে থাকতে দেখা যায়। সেই আবর্জনা থেকে ধূলো উড়ে আশপাশের বাড়ীতে, খাবারের দোকানের তৈরী করা খাবারে মিশে যায়। তা ছাড়া এই আবর্জনায় মাছি ও অন্যান্য পোকা-মাকড় এবং সেই মাছি ও পোকা-মাকড় আমাদের খাবারে রোগ ছড়ায়। দেশের ছোট-বড় সব শহরেই একই অবস্থা। আবর্জনা পরিষ্কার করা সমস্যার সমাধান কিছুটা সম্ভব হতে পারে যদি জনসাধারণ, পৌর ও সরকারী কর্মী এবং সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়। এ ছাড়া রাস্তায় যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ, থুথু ফেলা প্রভৃতি অভ্যাস ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। গ্রাম অঞ্চলে মাঠে মলত্যাগ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এর ফলে কত লোক রোগাক্রান্ত হচ্ছে তা কেউ ভেবে দেখেন না। এই প্রসঙ্গে সারা দেশের বাজারের আশেপাশের পরিবেশ যে কি ভীষণ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

শিল্পবিস্তার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রভৃতির জন্য যেভাবে পরিবেশ দূষিত হয়, তা অতি ব্যাপক এবং ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোকের বাছবিচার করে না। এর ফলে সমস্ত দেশের পরিবেশ দূষিত হতে পারে। দেশে জল-বাতাস দূষিত হচ্ছে নানা কারণে, নানা ভাবে। অপরদিকে নির্বিচারে অরণ্যানী ধ্বংস দেশের আবহাওয়ায় পরিবর্তন হচ্ছে, দেশের ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটছে।

বাতাস: পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বাতাস অপরিহার্য। প্রাণীর জীবন অক্সিজেন ছাড়া অসম্ভব। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ 24 ঘণ্টায় কমবেশী 35000 বার শ্বাস নেয়, তাতে প্রায় 16 কে.জি ওজন বাতাস মানুষের

ফুসফুসে যায়। বাতাস কিভাবে দূষিত হয়? আমাদের চারপাশে বাতাস প্রতি নিয়ত দূষিত হচ্ছে এবং তা নানা ভাবে। তবে কলকারখানার ধোঁয়া তার অন্যতম প্রধান কারণ। অনগ্রসর দেশে কলকারখানার সংখ্যা থাকে কম। দেশের অগ্রগতির জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে দেশের সমৃদ্ধি আসে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে অভিশাপের মত আসে বাতাস দূষণ। পৃথিবীর সব উন্নতিশীল দেশে আজ এই সমস্যা প্রকট। আজ বিশ্বের যেসব দেশ উন্নত, সেখানেও শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক অবস্থায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

ইউরোপের উন্নত দেশসমূহ বাতাস দূষণের প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করে নানাভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে। কোন কোন দেশ সেখানের জনবহুল এলাকায় নতুন কারখানা তৈরী নিষিদ্ধ করেছে। কোথাও বা বসতি এলাকা থেকে কারখানা শহরের বাইরে সরিয়ে দিয়েছে। কোন কোন শহরে কারখানার ধোঁয়া বেরোবার চিমনির উচ্চতা বাড়িয়ে, ধোঁয়া বাতাসের উচ্চস্তর স্তরে নিয়ে গিয়েছে, যাতে সেই ধোঁয়া নীচে নেমে এসে মানুষের ক্ষতি না করতে পারে।

মোটকথা, উন্নত দেশসমূহ সুপরিকল্পিতভাবে তাদের দেশের পরিবেশের স্বাস্থ্যরক্ষায় সচেতন। এ ছাড়াও তারা শহরের বসতি এলাকায়, কারখানার কাছে পরিকল্পনা মত গাছ লাগিয়ে পরিবেশ দূষণ রোধ করতে পেরেছে।

কলকারখানাতে জ্বালানী হিসাবে প্রধানতঃ কয়লা ব্যবহার হয়। কয়লার ধোঁয়াতে কার্বন ডাই-অকসাইড, কার্বন মনোকসাইড, সালফার ডাই-অকসাইড ও 'টার' জাতীয় বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এই ধোঁয়া বেশী পরিমাণে ও বহুদিন ধরে মানুষের শ্বাসনলীতে প্রবেশ করলে ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি প্রভৃতি রোগ হতে পারে। শীতকালে যখন এই ধোঁয়া বেশী উপরে উঠতে পারে না তখন হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটিস রোগীদের শ্বাসরোগ জটিলতর হয়। ইংল্যাণ্ডে 1952 খ্রীঃ গুরুতর কুয়াশা হয়েছিল এবং ঐ সময়ে বিভিন্নরকম শ্বাসরোগ জটিলতার জন্য 4000 লোকের মৃত্যু হয়েছিল। অপরদিকে 1948 থেকে 1959 খ্রীঃ শ্বাসরোগে এই এলাকায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল 7000। যখন এগারো বছরে 7000 লোক মারা গিয়েছিল, তখন 1952 খ্রীঃ এমনকি ঘটেছিল যার জন্য এক বছরে 4000 লোক মারা যায়? ঐ বছরে কুয়াশা খুব বেশী হয়েছিল।[1]

কিন্তু 1962-তে খুব কুয়াশা হয়েছিল প্রায় 1952-র মত এবং সালফার ডাই-অকসাইড এর পরিমাণ প্রায় সমান ছিল; কিন্তু মৃত্যুহার 1962-তে ছিল অনেক কম। কেন? এই দু'বছরের মধ্যে 1952 খ্রীঃ ধোঁয়ার পরিমাণ ছিল খুব বেশী।[2] সম্ভবতঃ সালফার ডাই-অকসাইড ও সালফিউরিক এসিড ধোঁয়ার সঙ্গে লেগে থাকার জন্য বিষক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।[3] আমাদের দেশে শহরাঞ্চলে রান্নার কাজে প্রধানতঃ কয়লা ব্যবহার হয়। সুতরাং খাদ্য প্রস্তুতের প্রয়োজনে প্রতিদিন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

রেলওয়েতে আজকাল বিদ্যুৎ বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। দূরপাল্লার ট্রেনগুলি চলে ডিজেল-এ, আর স্থানীয়গুলি বিদ্যুৎ-এ। কিন্তু কয়লার ইঞ্জিন এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশ কিছুটা দূষিত হয়।

পেট্রল ও ডিজেল চালিত যান-বাহন চলার সময়ে যে ধোঁয়া বার হয়, তার ফলে বাতাসে কিছুটা কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড বৃদ্ধি পায় এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়।

আজকাল লোডশেডিং-এর জন্য কেরোসিন ও পেট্রল চালিত জেনারেটার অফিস, ব্যাঙ্ক, বড় দোকান, হাসপাতাল, ল্যাবরেটারী, কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার হচ্ছে। এই জেনারেটারের গ্যাস বার করার নল (Exhaust pipe) থাকে মাটির খুব কাছে এবং এই গ্যাসের বেশ কিছু অংশ আমাদের শ্বাসপথে ঢুকছে। মনে হতে পারে,—এতে আর কতটুকু ক্ষতি হবে? কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই ঠিকই, তবে যেকোন বন্ধ জায়গায় জেনারেটার চলার ঘণ্টাখানেক পরে গেলেই গন্ধ থেকেই গ্যাসের অস্তিত্ব বুঝতে পারা যাবে। এই গ্যাস শ্বাসপথে যাদের হাঁপানি বা ব্রঙ্কাইটিস রোগ আছে তাদের রোগের জটিলতা বৃদ্ধি করবে। যাদের শ্বাসরোগ নেই বহুদিন এই গ্যাস শ্বাসযন্ত্রে গিয়ে রোগ সৃষ্টি করবে।

আমাদের দেশের বেশীর ভাগ শিল্প কয়েকটি বড় শহরে কেন্দ্রীভূত। এইসব শিল্পনগরীর বাতাস বিশ্লেষণ করে নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। National Environment Engineering Research Institute (NEERI) বোম্বাই-এর চেম্বুর ও ট্রম্বে এলাকায় বাতাস পরীক্ষা করে জানিয়েছে যে সেখানে সালফার ডাই-অকসাইড এর পরিমাণ অন্যান্য স্থানের চেয়ে 3 থেকে 6 গুণ বেশী। আমাদের দেশে কলিকাতার বাতাসে কার্বন ডাই-অকসাইড এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। যখন পেট্রল ও ডিজেল চালিত যানবাহন বেশী চলে তখন কার্বন ডাই-অকসাইড এর পরিমাণ প্রতি 1000,000 কিউবিক মিলিমিটারে 36 শতাংশ বৃদ্ধি পায়।[4]

হিসাব কষে দেখা গেছে 1860 থেকে 1969-এর মধ্যে বাতাসে কার্বন ডাই-অকসাইড এর পরিমাণ 14 ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাতাসে কার্বন ডাই-অকসাইডের পরিমাণ যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় তবে ইনফ্রারেড রশ্মি বেশীমাত্রায় শোষিত হয় এবং পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতার জন্য মেরু অঞ্চলে বরফ গলে সমুদ্রে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে মানুষের জীবন ও বাসস্থান বিপন্ন হবে।

জল: বাতাসের মত জলও আমাদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এই জল কি শহরে, কি গ্রামে নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। তার কিছুটা আমাদের ইচ্ছাকৃত, অবহেলার জন্য; কিছুটা অজ্ঞতার জন্য।

আমাদের জলের প্রয়োজন কেবলমাত্র পানীয় হিসাবে নয়; জলের প্রয়োজন কৃষিজমিতে সেচের জন্য, মাছের জন্য, গৃহপালিত ও বন্য পশুদের জন্য। দেশের অরণ্যসম্পদ রক্ষার জন্য বৃষ্টি ও নদীর জলের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সেই অতিপ্রয়োজনীয় জল নানাভাবে দূষিত হচ্ছে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশে আনছে বিপর্যয়।

কোন পুকুর বা লেকের ধারে গেলেই চোখে পড়বে লোকে স্নান করছে, বাসন মাজছে, ময়লা কাপড়-বিছানা কাচছে। সেই কাপড়-বিছানা হয়ত কোন সংক্রামক রোগীর। যারা

করে তারা জেনে, অথবা না জেনে অজ্ঞতার জন্য অন্যায় করতে পারে। সরকার, পৌরসভা ও এলাকার জনসাধারণকে সমবেত ভাবে এই অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে হবে।

শহর সন্নিহিত যে কোন নদীর জলে যতরকম আবর্জনা থাকতে পারে, তা ভেসে চলেছে। তার উপরে আছে—কারখানার উৎপন্ন আবর্জনা মিশ্রিত জল। এই জল নদীর জলকে বিষাক্ত করে। এইজল পানের অযোগ্য তো বটেই, এমনকি মাছও এই বিষাক্ত জল এড়িয়ে চলে। কাগজের কারখানা ও রাসায়নিক কারখানার আবর্জনা সবচেয়ে বিপদজনক।

এ ছাড়া আছে শহরের পয়ঃনালীর আবর্জনা। বহু শহর আছে যেখানে পৌর প্রতিষ্ঠানের পয়ঃনালীর জল বিশোধনের কোন ব্যবস্থা নেই এবং সেইজল শহরের পাশে নদী বা খালের জলে পয়ঃনালীর দূষিত ফেলা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেইজল বড় নদী, এমনকি সাগরের তীরভূমিকে দূষিত করছে।

জল দূষিত হওয়ার জন্য নানারকম আন্ত্রিক রোগ, জনডিস রোগ হতে পারে। রাসায়নিক বিষ ও আবর্জনা মিশ্রিত জল সেচের কাজে ব্যবহার করলে ফসলের ক্ষতি হয়।

শহর অঞ্চলের বাইরে নদীর জলে গবাদি পশুর মৃতদেহ, এমনকি মানুষের মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। এ ছাড়া আছে গ্রামের আবর্জনা ও মানুষের অজ্ঞতাপ্রসূত জল দূষণ। এইভাবে প্রতিনিয়ত নদীর জল দূষিত হচ্ছে।

দুর্গাপুর ও আসানসোলের সংলগ্ন দামোদর নদের জল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ঐ অঞ্চলের কলকারখানা থেকে দিনে প্রায় 160,000 কিউবিক লিটার জলবাহিত আবর্জনা নদীতে ফেলা হয়।

বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে একই সমস্যা। কিন্তু সেদেশে পয়ঃনালীর জল ও কারখানার জল ও আবর্জনা বিশোধন করে ফেলা হয়।

বনভূমি ঃ গাছের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন। সভ্যতার আগেই মানুষ গাছের তলায় বা পাহাড়ের গুহায় তাদের আশ্রয়স্থল করেছিল। তারপরে শহর সৃষ্টির প্রয়োজনে, বাড়ী তৈরী বা আসবাবের জন্য মানুষ গাছ কেটে কাঠ সংগ্রহ করত। পরে শহর বিস্তার ও মানুষের প্রয়োজনে বনভূমি ধ্বংস হতে থাকে।

কিন্তু শহরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে, বাতাসে কার্বন ডাই-অকসাইডের পরিমাণ কমাতে গাছ রক্ষা করা প্রয়োজন। ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন শহরের অংশ বিশেষ বনাঞ্চলের জন্য সংরক্ষিত। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সব শহরে শতকরা 30 থেকে 40 ভাগ অঞ্চলে বন সৃষ্টি করে রাখা আছে। শহরের মানুষের স্বার্থেই তারা এই ব্যবস্থা নিয়েছে।

তবে আমাদের দেশের চিত্র এর বিপরীত। একে তো আমাদের দেশের কয়েকটি শহরে জনসংখ্যার চাপ বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী, তার উপরে শহরের এলাকা বিস্তারের প্রয়োজনে চলছে নির্বিচারে গাছ কাটা। এর ফলে শহরের সবুজত্ব কমে যাচ্ছে। মানুষের প্রয়োজনে গাছ কাটতে হয়, কিন্তু একটি গাছ কেটে, কাছে আর একটি গাছের চারা লাগান হলে পরিবেশের সমতা কিছুটা রক্ষা পেত। কিন্তু এই নিয়ম কখনও মানা হয় না।

অপরদিকে আশার কথা হল,—ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যেখানে আবহাওয়া ছিল শুকনো, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল খুবই কম, সেখানে পরিকল্পিত ভাবে গাছ পুঁতে এবং তাকে রক্ষা করে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি করার ফলে আবহাওয়ার ধারা পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

ইদানীং আমাদের রাজ্যে কিছু গাছের চারা লাগান হয়েছে। এখন প্রয়োজন যত্ন করে সেগুলিকে বড় করা। বহুদিন প্রচারের ফলে শহরের কিছু লোক গাছের প্রয়োজন বুঝতে পেরেছে। এইভাবে শহর এলাকায় ও দেশের অন্য অংশে বনাঞ্চল সৃষ্টি করলে পরিবেশ কিছুটা পরিচ্ছন্ন হবে।

পশ্চিমবাংলার বনসম্পদ আজ ক্ষয়িষ্ণু। দুঃখের বিষয়, কিছু দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে গাছ চুরি করছে। যেখানে চুরি সম্ভব হয় না, সেখানে গাছের ছাল তুলে গাছটিকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। অনেক সময় গাছের ডাল কেটে গাছটিকে ধ্বংস করা হয়। কখনও হয়ত গাছের গোড়ায় আগুন জেলে বা এসিড ঢেলে গাছটিকে মেরে ফেলা হয়। গাছ মরে যাওয়ার পরে কাঠ নিয়ে যেতে আর কোন বাধা থাকে না।

এইভাবে বনাঞ্চল ধ্বংস করার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। বৃষ্টির পরিমাণ দারুণ হ্রাস পেয়েছে, দেশে খরা দেখা দিয়েছে। এর ফলে শস্যের ফলন কমে গেছে। এইরূপ পরিবেশ বদলের প্রভাবে দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে।

এসব ছাড়া পাহাড়, নদী বা জলাশয়ের ধারে বিনা বিচারে গাছ কাটলে ভূমিক্ষয় বাড়বে। গাছের শিকড় মাটি আটকে রাখে। গাছ নষ্ট হলে উঁচু জমি থেকে বৃষ্টির জল নীচের দিকে আসার সময় মাটিতে ধ্বস নামে। অনেক সময় এর ফলে বাড়ীঘর ধ্বংস হয় ও জীবন হানি ঘটে।

শব্দ ঃ আজকাল কলকারখানার আওয়াজ, যানবাহনের হর্ন, বিমানের শব্দ পরিবেশের নিস্তব্ধতা নষ্ট করছে। তার ফলে মানুষের প্রয়োজনীয় বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটছে। জাপানের টোকিয়ো বিমান বন্দরের কাছে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় তাঁরা প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তখন বিমান কর্তৃপক্ষ রাত এগারো'টার পরে বন্দরে বিমান ওঠানামা বন্ধ করেন। এই সমস্যা শুধু টোকিও-র নয়, পৃথিবীর সব বড় শহরে শব্দ দূষণ এক গুরুতর সমস্যা।

বিমানের আওয়াজ ছাড়া ট্রেন, মোটরগাড়ী কলকারখানার আওয়াজ এত বেড়ে গিয়েছে যে বহু মানুষ নিম্নগ্রামের কথা ভালভাবে শুনতে পায় না, জোরে কথা বলতে হয়। এটা এক ধরনের বধিরতার প্রাথমিক অবস্থা। এই শতাব্দীর শেষে এই অবস্থা আরও ভয়াবহ হবার আশঙ্কা।

আগে হাসপাতালের সামনের রাস্তায় 'নিস্তব্ধ এলাকা' ঘোষিত ছিল। এখন এ নিয়ম কেউ মানে না।

আমাদের দেশে ছোট বড় সব শহরে আজকাল গাড়ীর হর্নের আওয়াজ, চিৎকার চেঁচামেচি এত বেশী হয়ে উঠেছে যার ফলে মানুষের মেজাজ খিটখিটে হচ্ছে, ধৈর্য ও সহনশীলতা কমে অল্পেই মানুষ রেগে উঠছে। মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়ছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় পরিবেশ সংরক্ষণে এখনই যদি সর্বতোভাবে যত্নবান প্রচেষ্টা না নেওয়া হয় তা হলে মনুষ্য সমাজ শারীরিক-মানসিক ও সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

গ্রন্থসূচী

1. Martin, A.E. Monthly Bull. Minish. Hth. Lab. Serv. 20, 42, 1961.
2. Reid, D.D. Proc. Roy. Soc. Med. 57, 965, 1964.
3. Stuart-Harris, C.H. Soct. Med. Jn. 10, 93, 1965.
4. অধিকারী, ডঃ সীমানন্দ ও সিংহ,, ডঃ অরূপকুমার, জীবন-বিজ্ঞান, প্রথম খণ্ড, সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী—কলিকাতা-9—391.

গৃহস্বামীরা একটু ভাবুন!

অফিস থেকে ফিরেছেন গৃহস্বামী। ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন, মুখ-চোখ-হাত-পা ধুয়ে বসেছেন মৌজ করে। জলখাবারটা খেয়ে শেষ করেছেন, হাতে নিলেন চায়ের কাপ। আর এক হাতে সিগারেট, মাঝে মাঝে চিন্তায় ডুব দিচ্ছেন। সিগারেটটা পুড়েই যাচ্ছে। বাপীর পাশে বসে একমনে ছবি আঁকছে টুকু সোনা, প্রতিদিনকার একই ছবি। কিছুদিন পরে টুকু সোনার শুরু হল হাঁচি, কাশি, বাপীর ধারণা ঠাণ্ডা লেগেছে, ওষুধ খাচ্ছে টুকু সোনা, সেরে যাচ্ছে আবার হচ্ছে, থেকে থেকে শ্বাস টান। বড় ডাক্তার দেখাচ্ছেন, রক্ত পরীক্ষা হচ্ছে, বুকের ছবি হয়েছে। টান ক্রমশ বেড়েই চলেছে, ডাক্তার রায় দিলেন ব্রংকিয়াল এ্যাজমা, বাপী আকাশ থেকে পড়লেন, শুনেছেন বংশগত রোগ। অথচ তাঁর বংশে কারো নেই। বুঝলেন না টুকু সোনার হাঁপানির জন্য তিনিই দায়ী। সিগারেট খেয়ে নিজের যত না ক্ষতি করেছেন, টুকুর ক্ষতি করেছেন অনেক বেশি। এইভাবে বাসে-ট্রামে, অফিসে-কাছারিতে, খেলার মাঠে, সিনেমা হলে রেস্টুরেণ্টে ধূমপায়ীরা নিজেদের যেমন ক্ষতি করেছেন, ক্ষতি করছেন অন্যদেরও। একবার ছোট্ট করে চোখ বুলিয়ে নিন পরিসংখ্যায়নের দিকে। আমেরিকা ন্যাশানাল সারভে সংস্থা ধূমপেয়ী গৃহস্বামীরা ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীদের কতটা ক্ষতি করছেন এই নিয়ে এক সমীক্ষা চালান। দেখা যায় যাঁরা বেশিমাত্রায় করে ধূমপান করেন, তাঁদের দু-বছরের নীচের ছেলে-মেয়েরা বেশি করে সর্দি-কাশি, হাঁপানিতে ভোগে। এছাড়া তাঁদের স্ত্রীরাও ধূমপান না করেও স্বামীর জন্যে আক্রান্ত হচ্ছেন হাঁপানি, ক্রনিক ব্রংকাইটিস ও ফুসফুস ক্যান্সারে। তাই গৃহস্বামীরা একটু ভাবুন। ধূমপান করবেন কি না?

প্রদীপ কুমার দাস।

[*Source*: Science]

পারদ দূষণ

মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

ভারতে পারদের বিশেষ কোন উৎস না থাকলেও ভারতীয় ট্র্যাডিশনে পারদ সুপরিচিত। বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় ওষুধ মকরধ্বজ (বা রসসিন্দুর বা স্বর্ণসিন্দুর) মূলতঃ বিশেষ অবস্থার এক পারদযৌগ (মারকিউরিক সালফাইড)। গন্ধক ও পারদের ওই যৌগই বহু সময় সিঁদুর হিসাবে ব্যবহৃত হত। ভারতীয় রসায়নের "রসঃ" পারদ অর্থেই ব্যবহৃত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে পারদ থেকে অমরত্ব লাভের ঔষধ ("অমৃত") তৈরীর প্রচেষ্টায় ভারতীয় কিমিয়াবিদরা (alchemists) রসায়নের অনেক আবিষ্কার করেছেন। পারদ থেকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে সোনা তৈরীর চেষ্টাই ছিল ইউরোপীয় কিমিয়াবিদদের প্রধান সাধনা। প্রাচীন ভারতে পারদ আসতো গন্ধার (আফগানিস্তান) দেশের উত্তর-পূর্বদিকের চীনদেশ থেকে। যে পারদের ভিতর মধ্য ও প্রাচীন যুগের ভারতীয় রসায়নবিদরা (যথা, চরক সুশ্রুত, নাগার্জুন) জীবনকে আরো সজীব ও দীর্ঘায়ু করার সম্ভাবনা আশা করতেন, আজকের ভারতে রসায়নবিদরা সেই একই পারদের ভিতর জীবনের ক্ষয়, এমনকি বিলুপ্তির সম্ভাবনাও দেখছেন। পারদ ও পারদজাত পদার্থসমূহ আজ অমৃতের বদলে গরল হয়েই প্রতিভাত হচ্ছে এবং আধুনিক বিজ্ঞান এই বিষ থেকে মানুষকে বাঁচার পথের সন্ধান দিচ্ছে। ভারতীয় পরিবেশে পারদজাত বিষ নিঃশব্দে আজ এতটা সম্প্রসারিত হয়েছে যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) থেকে ভারত সরকার পর্যন্ত অনেকেই সবিশেষ উদ্বিগ্ন, যদিও জনসাধারণ—এমনকি শিক্ষিত ভারতীয়দের অনেকেই—নিরুদ্বিগ্ন, সম্ভবতঃ বাস্তব অবস্থা না জানায়। কিন্তু চোখ বন্ধ করে থাকলেও প্রলয় বন্ধ থাকে না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে প্রাচীন রোমের কথা। সীসা আর একটি বিষাক্ত ভারী ধাতু (পারদের তুলনায় যদিও কম)। সীসার বিষগুণ প্রাচীন গ্রীকরা জানতো, কিন্তু পরবর্তী রোমানরা জানতো না। রোমানরা তাদের অনেক বাসন, পানপাত্রাদি সীসা দিয়ে বানিয়ে ব্যবহার করতো। স্বাভাবিকভাবেই সীসার বিষ রোমানদের—বিশেষ করে অভিজাত রোমানদের শরীরে প্রবেশ করতো। কিছু কিছু ঐতিহাসিকের ধারণা সীসার বিষক্রিয়ায় রোমানদের বিচারবুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়াই রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। এই কথায় সত্যের কিছুটাও যদি থাকে, তবে সম্প্রতিকালের দ্রুত বর্ধমান আরো ভয়ঙ্কর পারদবিষ যা মানুষসহ প্রায় সকল জীবদেহে ক্রমসঞ্চিত হয়, তা স্বাভাবিক ভাবেই আরো উদ্বেগের কারণ হতে বাধ্য। পারদঘটিত সুর্মা ব্যবহারই মিশরদেশের ব্যাপক নারী অন্ধত্বের একটি কারণ।

প্রাচীন মিশরেই পারদের প্রথম ব্যবহার দেখা যায় (1600 খৃষ্টপূর্বাব্দ)। ভারতে চরক (খৃষ্টীয় ১ম শতক) সুশ্রুতর (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতক ?) থেকেই আয়ুর্বেদে পারদ ও অন্যান্য অজৈব পদার্থের ব্যবহারের আধিক্য দেখা যায়। ধরাপৃষ্ঠে পারদের প্রাচুর্য (abundance) বেশ কম, $(2\text{-}7)\times 10^{-6}$%। প্রাচুর্য অনুসারে পারদের স্থান 62 নম্বরে। কিন্তু বিশেষ কতকগুলি ভূ-রাসায়নিক কারণে পারদের কিছু ঘনীভূত অবস্থান, পারদ সমৃদ্ধ আকরিক (প্রধানতঃ হিঙ্গুলী বা সিনাবার, HgS) পাওয়া যায়। স্পেনের পারদখনি রোমান আমল থেকেই পৃথিবী বিখ্যাত। পেরুদেশীয় রূপানিষ্কাশনের প্রয়োজন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পারদের উৎস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বাড়তে থাকে। বর্তমানে স্পেন, ইটালী, যুগোশ্লাভিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, রাশিয়া, মেক্সিকো, কানাডায় বেশী পারদ উৎপন্ন হয়। ভারতের পারদের প্রয়োজন সবটাই প্রায় আমদানী থেকে মেটাতে হয়। একমাত্র তরল এবং পরিবেশের সাধারণ অবস্থায় প্রায় নিষ্ক্রিয় চকচকে রূপালী ধাতু পারদ (পারমাণবিক সংখ্যা 80, ভর 200·6, আপেক্ষিক গুরুত্ব 13·6) নানা "গুণে" সমৃদ্ধ হওয়ায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে ও শিল্পে ব্যবহৃত হয়। থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, "মারকারি ভেপার ল্যাম্প" থেকে ক্লোরিন ও কস্টিক সোডা উৎপাদন, ধাতু নিষ্কাশন, আয়না তৈরী প্রভৃতি নানা কাজে পারদ গুরুত্বপূর্ণ। কতকগুলো ঔষধ (যেমন, মারকিউরোক্রোম) ও বহু আপদনাশক (pesticides) পারদঘটিত। কাগজ তৈরীর সময় ছত্রাকনাশ করার জন্য পারদযৌগ ব্যবহার করা হয়। শস্যবীজকে ছত্রাক ও বীজাণু থেকে "রক্ষা" করার জন্য পারদের কিছু জৈব যৌগ ব্যবহার করা হয়। পারদের জৈব যৌগগুলি মারাত্মক বিষ। কয়েক বছর আগে (1972) মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানী করা জাহাজ বোঝাই পারদযৌগ (মিথাইল মারকারি) দ্বারা "সুরক্ষিত" গম (বীজের জন্য "রক্ষিত" এবং সম্ভবতঃ ভুলক্রমে রপ্তানীকৃত) সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সরবরাহিত হয়ে গিয়েছিলো। সেই গম থেকে আটা করে রুটি খাওয়ায় কয়েকদিনের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ (সরকারি হিসেবে অবশ্য 450 জন) মারা গিয়েছিলো, আরো অনেক লোক কমবেশী সাময়িক ও স্থায়ীভাবে অসুস্থ বা পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলো।

এমন ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানে, গুয়াতেমালায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউমেক্সিকোতে একটি পরিবার বাজার থেকে কমদামী এমন গম তাদের পালিত শূকরকে খাইয়েছিলো যাতে পারদ ঘটিত পেস্টিসাইড ছিল। ঐ শূকরকে কেটে মাংস রান্না করে খাওয়ায় বাড়ীশুদ্ধ সবাই গুরুতর অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলো। ভারতে এমনধারা ঘটনা যে ঘটেনি, ঘটবে না, তা বলা যায় না। পারদযৌগ দিয়ে "সুরক্ষিত" করা বীজ মাঠে ছড়ালে পাখীরা কিছু খায়ই এবং তার কিছুক্ষণ পরেই তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পশ্চিমবাংলায় (এবং ভারতের অন্যত্রও) পাখীরা আজ বিলুপ্তির পথে। পাখীদের অসুস্থতা, যন্ত্রণাকাতর অবস্থা ও মৃত্যু ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে সুইডিশ সরকার 1966 সালে পারদঘটিত পেস্টিসাইড ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেন। পরবৎসরই পাখীদের ডিমে পারদের পরিমাণ দুই-তৃতীয়াংশ কমে যায়। মার্কিন সরকারের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা 1976 সালে অনুরূপ ব্যবস্থা নেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে প্রচুর পরিমাণে পারদঘটিত নানা পদার্থ (যথা: 2, 4-D বা 2, 4-Dichloro phenoxy acetic acid, 2, 4, 5-T বা 2, 4, 5-Tichloro phenoxy acetic acid) পত্রনাশক (defoliant) হিসাবে আকাশ থেকে "স্প্রে" করে ছড়ায় (1969 সাল থেকে)। ফলে সেখানকার জল মাটি ও জীবমণ্ডল দীর্ঘস্থায়ীভাবে বিষাক্ত হয়ে গেছে, আর জন্ম নিয়েছে অনেক বিকলাঙ্গ শিশু।

মানবদেহে সাধারণ পারদের প্রতিক্রিয়া :

পারদের স্ফুটনাঙ্ক 356·9°C সাধারণ অবস্থায় এর বাষ্প চাপও অপেক্ষাকৃত বেশী। পারদ নানা অবস্থায়—বিশেষ করে বাষ্পাবস্থায়—সহজেই শ্বাসপ্রশ্বাস ও খাদ্যবস্তু মারফৎ শরীরে ঢুকে ফুসফুস অন্ত্র ইত্যাদির ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহের সাথে মিশে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। সংস্পর্শে চামড়ার মধ্য দিয়েও পারদ শরীরে ঢোকে। পারদ বাষ্প, ছড়ানো পারদ (spilled mercury) বিশেষ বিপজ্জনক। দ্রাব্য পারদযৌগ বিশেষ ক্ষতিকর। অজৈব থেকে আবার জৈবপারদ অধিক ক্ষতিকর। অজৈব পারদ সামান্যতেই (0·5 গ্রাম) মারাত্মক হতে পারে।

জৈব পারদ (যথা: ফিনাইল মারকিউরিক এ্যাসিটেট, মিথাইল-মারকারি) আরো অনেক কমেই মারাত্মক। মারাত্মক (acute) বিষক্রিয়ায় দ্রবণীয় পারদলবণ চামড়া, বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক পরদা-গুলিকে ক্ষয় (corrode) করে। শরীরে বেশী পারদ গেলে গা গুলোয়; বমি, পেট ব্যথা হয়; প্রস্রাব ও পায়খানার সাথে রক্ত পড়ে, যকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও দিন দশেকের মধ্যেই মৃত্যু হয়। কম বিষক্রিয়ায় (chronic) মুখ ও মাড়ি ফুলে যায়, দাঁত আলগা হয়ে যায়। মুখ থেকে অধিক লালা নিঃসরণ হয়, প্রস্রাবের গোলমাল ও ঘুমের ব্যাঘাত হয়; স্মৃতিশক্তি কমে যায়, পেশী কাঁপে, চলনে অসুবিধে হয় (jerky gait), খিটখিটে মেজাজ, বিষণ্ণতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয় এবং শরীরের প্রত্যন্ত দেশের মাংসপেশীর অনৈচ্ছিক আক্ষেপন দেখা দেয়। পারদের কিছু জৈব যৌগ (যথা: phenyl and alkyl mercurials) চামড়া পুড়িয়ে দেয়। পোড়ার অনুভূতি ও কষ্ট দেহের পারদযৌগ শোষার (absorption) অনেক পরে আসে; আগে থেকে তাই কিছু করা যায় না। কিছু কিছু পারদযৌগের (বিশেষতঃ CH_3HgCl, $(CH_3)_2Hg$) মস্তিষ্ক বা "ব্রেনের" প্রতি বিশেষ আসক্তি আছে। পারদের নানা জৈবযৌগ ব্রেনে জমা হয়ে মানুষ পাখী ও অন্যান্য পশুদের কমবেশী অসুস্থ করে, বেশী হলে মৃত্যু অনিবার্য করে তোলে। আলোচনায় পরে আবার ফিরে আসব। এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে শরীরে পারদবিষ ঢুকলে তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। পারদবিষের প্রতিষেধক হিসাবে BAL (British Anti Lewsite) বা dimercaprol (2, 3-dimercapto-1-propanol) এবং Ca_2 EDTA ব্যবহার করা যেতে পারে। এরা পারদকে দ্রাব্য অপেক্ষাকৃত নির্দোষ এমন রাসায়নিকে (metal chelates) পরিণত করে যার ফলে রোগী উপকৃত হয়। এখানে উল্লেখ্য শরীরে ঢোকা পারদকে দেহ প্রস্রাব, পায়খানা, ঘাম, থুতু, চুল প্রভৃতির মাধ্যমে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করলেও কিছু পারদ স্থায়ীভাবে লিভার, কিডনি, স্প্লীন, হাড়, মস্তিষ্কে জমা হয়। পারদকে সর্বত্রই ক্রমসঞ্চয়ী (cumulative) বিষ বলা হয়েছে।

মানব পরিবেশে পারদের উৎস

উৎস	পারদের পরিমাণ (টনে) উৎপাদন	পরিবেশে বিমুক্তির পরিমাণ
আকরিক থেকে পারদ উৎপাদনের মোট পরিমাণ, সারা পৃথিবী (1900-70)	361,000	120,000
আকরিক থেকে মোট উৎপন্ন পারদ, সারা পৃথিবী (1970)	10,000	3,300
ফসিল ফুয়েল থেকে বিমুক্ত পারদের মোট পরিমাণ সারা পৃথবী (1900-70)	—	150,000
ফসিল ফুয়েল থেকে বিমুক্ত পারদের মোট পরিমাণ, সারা পৃথিবী (1970)		4,800
মনুষ্যকৃত পারদ বিমুক্তির মোট পরিমাণ (1900-70)		270,000
ভূত্বকের ক্ষয়ীভবনে পৃথিবীর মোট বার্ষিক বিমুক্তি		800
ভূত্বকের ক্ষয়ীভবনে পৃথিবীর মোট বিমুক্তি (1900-70)		5,700

পরিবেশে পারদ ঃ

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্ষয়জনিত কারণে ভূত্বক থেকে প্রতি বছর প্রায় 800 টন পারদ বিমুক্ত (release) হয়ে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে মানুষ প্রতি বছর প্রায় দশহাজার টন পারদ উৎপন্ন করছে, যার মধ্যে প্রায় হাজার তিনেক টন বর্জ্য পদার্থ হিসাবে পরিবেশে ছড়াচ্ছে। মনুষ্যকৃত (anthropogenic) পারদদূষণের (প্রকৃতপক্ষে যেকোন দূষণের) গুরুত্ব ও প্রকৃতি বুঝতে গেলে মনে রাখা দরকার যে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দূষক (!) যে পরিমাণে যে অবস্থায় পরিবেশে আছে বা থাকে, তাদের সাথে মানুষসহ সবধরনের জীবন লক্ষ লক্ষ বছরের সহাবস্থানে একরকম সাম্য বা সমঝোতার এসে গেছে, যাতে তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও আয়ু নির্ধারিত হয়ে গেছে। আজ হঠাৎ যদি কোন বস্তু (এখানে যেমন পারদ) মনুষ্য"সৃষ্ট" হয়ে অজায়গায় অস্বাভাবিক পরিমাণে বেড়ে যায়, তবে তার মারাত্মক বিরূপ নানান প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। আধুনিক প্রযুক্তির একটি বড় দোষ হল এই যে প্রকৃতি ও জীবজগতের উপর কি প্রভাব তারা ফেলছে সে বিষয়ে তার চূড়ান্ত উদাসীনতা ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি নির্ভর তেপায়াটুলের মত আধুনিক প্রযুক্তির তৃতীয় পা বায়োলজি অনুপস্থিত।

মানব পরিবেশে পারদ কোথা থেকে কতটা ছড়ায় তা উপরের হিসাব থেকে কিছু আন্দাজ করা যাবে। লক্ষণীয় মনুষ্যকৃত (দহন ও শিল্পকর্মোদ্ভূত) পারদদূষণ প্রাকৃতিক পারদ দূষণের চেয়ে অনেক অনেক বেশী। জৈব পদার্থে পারদের ঘনত্ব অজৈব পদার্থের চেয়ে অনেক বেশী। আমেরিকায় কয়লার 3 ppm (ppm মানে দশলাখে এক ভাগ) পারদ আছে। খনিজ তৈল ও কয়লা পোড়ানোতে সবচেয়ে বেশী পারদ পরিবেশে ছড়ায় এবং বৃষ্টি ও নদীবাহিত হয়ে তার অনেকটাই সমুদ্রে জমে। এতে ভয়ের কারণ যতটা না আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী আছে শিল্পোদ্ভূত পারদ দূষণে। নিম্নলিখিত শিল্পগুলি থেকে পারদবাষ্প বা নানারকম পারদযৌগ পরিবেশে সঞ্চারিত হয় এবং খাদ্য, জল ও বায়ুবাহিত হয়ে উদ্ভিদ ও জীবদেহে প্রবেশ করে, মাটিতে জলে আশ্রয় নেয়।

- খনিজ দ্রব্য উত্তোলন ও নিষ্কাশন শিল্প।
- ধাতু নিষ্কাশন ও ইলেকট্রোপ্লেটিং।
- নানান রাসায়নিক শিল্প।
- কাগজ শিল্প।
- চামড়া ট্যানিং শিল্প।
- ঔষধ শিল্প।
- টেক্সটাইল বা বস্ত্র শিল্প।
- রাসায়নিক সার শিল্প।
- ক্লোর এ্যালকালি শিল্প।

ভারতে দহন ও শিল্পকর্ম পশ্চিম ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকার মত খুব বেশী না হয়ে উঠলেও নিয়ন্ত্রণের অভাব, পুরাতন খারাপ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি অবহেলায় ভারতের কোন কোন অঞ্চলে পারদ বিষের পরিমাণ বেশ বেড়ে গেছে। যেখানে সারাবিশ্বে একবছরে শিল্পাদি থেকে হাজার তিনেক টন পারদ পরিবেশে বিমুক্ত হয়, সেখানে এক ভারতেই বছরে প্রায় দু'শো টন পারদ কয়েকটি বিশেষ পরিবেশে বিমুক্ত হচ্ছে, যার মধ্যে দামোদর, গঙ্গা ও সাগর মোহানা উল্লেখযোগ্য। ভারতে আমদানীকৃত পারদের (বার্ষিক 250-270 টন) প্রায় 75% লবণকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে কস্টিক সোডা ও ক্লোরিন তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এইসব ক্লোর-এ্যালকালি শিল্পে ব্যবহৃত পারদ বর্জ্য পদার্থ হিসাবে ড্রেন্ নালা দিয়ে নদীতে পড়ে। নদীর তলায় সেগুলো জমতে থাকে এবং কিছুটা হয়তো নানাভাবে সাগর মোহানায় চলে যায়। পশ্চিমবঙ্গে 1980 সালে 18,160 টন (1979-তে 13,500 টন) কস্টিক সোডা উৎপন্ন হয়েছে। পরিবেশে পারদ দূষণের উৎস নিম্নলিখিত কোম্পানীগুলি যেখানে দৈনিক গড়ে 25-30 টন কস্টিক উৎপাদন হয়।

Alkali & Chemical Corporation of India Ltd.	Rishra
Durgapur Chemicals Ltd.	Durgapur
Hindustan Heavy Chemicals	Khardaha

রিসড়ায় উৎপাদন সম্প্রতি বন্ধ, কিন্তু দুর্গাপুর ও খড়দহের কারখানা দামোদর ও গঙ্গাকে দূষিয়ে চলেছেই। জলের তলায় জমা পারদ কি করতে পারে সে জ্ঞান খুব পুরাতন নয়। যে ঘটনাপ্রবাহ, যে সব ট্রাজেডীর মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান হল, পরিবেশ বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হল, তা জানবার জন্যে আমাদের যেতে হবে জাপানে, আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে।

রহস্যময় মিনামাটা রোগ ঃ

জাপানের কিউসু দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে মিনামাটা উপসাগরের কাছে ছোট্ট সহর মিনামাটা। মৎসজীবী ও মৎসভোজী অধ্যুষিত অঞ্চল। একদিন সেখানকার কিছু বেড়ালের ব্যবহার অস্বাভাবিক হয়ে উঠলো। চলতে গিয়ে নিজের পায়েই হোঁচট খেয়ে পড়ে, যেন মাতাল হয়ে গেছে। অনেক বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগলো, মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরোতে থাকলো। কেউ কেউ অবিরাম কেঁদে চলল। একবার আছাড় খেয়ে পড়ে, উঠে আবার দৌড়য়। দৌড়ে, পাহাড় থেকে লাফিয়ে সাগরে ডুবে অনেকে আত্মহত্যা করল। কিছু কিছু পাখী আর্তনাদ করতে করতে আকাশে চক্কর খেতে খেতে জলে, মাটিতে পড়ে মরলো। এই নাচের রোগ ক্রমে মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়লো। আশ্চর্য অভূতপূর্ব এই মরণ নাচন দেখে লোকে ভীত বিস্মিত হয়ে উঠলো। চিকিৎসাকেরাও এই উদ্ভট রোগের কারণ ও প্রতিকার কিছুই বুঝতে না পেরে অসহায়ের মত লোকের যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু দেখতে বাধ্য হলেন। একই উপসর্গ নিয়ে প্রতিদিন নতুন নতুন রোগী দেখা দিতে লাগলো। অল্পদিনের মধ্যেই অনেকের মৃত্যু হল। তাতেই ব্যাপারটা শেষ হল না। অজস্র লোকের নানা কষ্ট ও রোগের উদ্ভট সব উপসর্গ দেখা দিতে থাকলো বছরের পর বছর। অনেকে সহজে ক্লান্ত ও খিটখিটে হয়ে পড়তে থাকলো; কারো কারো অস্বাভাবিক মাথা ব্যথা দেখা

দিলো। অনেকের হাতে পায়ের সাড় চলে গেল, কারো চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে গেল। কারো খাবার গিলতে হল অসুবিধে, কারো হাতে পায়ের সুসংহত নাড়াচাড়ার ক্ষমতা চলে গেল। এই অজানা অভূতপূর্ব উপসর্গ সম্বলিত রোগ অচিরেই "মিনামাটা রোগ" নামে পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে গেল। বছর দশেকের মধ্যে (1963 সালে) বোঝা গেল পারদ দ্বারা বিষায়িত মাছ খাওয়াই এ রোগের কারণ। অঞ্চলের মৎসভোজী পাখী, বেড়াল, মানুষ যারাই পারদদূষিত উপসাগরের মাছ খেয়েছে তারাই মিনামাটা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। মাছে 27 থেকে 102 ppm (শুকনো ওজনের ভিত্তিতে) পারদ থাকায় মাছগুলি জীবের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিলো। 1960 সালের মধ্যে মিনামাটা রোগে অন্ততঃপক্ষে 43 জন মারা গেল, জন্মগত দৈহিক ত্রুটি ও বিকলাঙ্গ নিয়ে অসংখ্য শিশু জন্মাল। জাপানের ডাক্তারদের হিসাব অনুযায়ী 1975 সালের মধ্যে অন্ততঃ দশ হাজার লোক এই রোগের কবলে পড়েছে, যার মধ্যে 703 জন স্থায়ী ও গুরুতর ভাবে পঙ্গু হয়ে গেছে এবং 100 জনের মৃত্যু ঘটে গেছে। সম্প্রতি জাপানের নিগাটা ও আরিয়াকে আবার মিনামাটা রোগ দেখা দিয়েছিল, যদিও মিনামাটায় এই রোগের বিস্তার আটকানো গেছিল। চিসো কেমিকেল কোম্পানীর প্লাস্টিকের কারখানায় ব্যবহৃত পারদঘটিত অনুঘটক বর্জ্য পদার্থ হিসাবে মিনামাটা নদী ও ইয়াৎসুসিরো উপসাগরে ফেলা হত। প্রতি বছর কিছু কিছু CH_3HgCl জলে জমে জমে মাছগুলিকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। মিনামাটা ট্রাজেডীর পর চিসো কোম্পানী বর্জ্য পদার্থে পারদ নির্গমন বন্ধ করে।

মিনামাট রোগের উৎস সন্ধানে আরো যা জানা গেল তাতে বিজ্ঞানীরা স্তম্ভিত, ভীত হয়ে পড়লেন। প্রকৃতির জটীল রহস্যের বেশীটাই আজো বিজ্ঞানেরও যে অজানা তা আবার বোঝা গেল। মানুষ তার অফুরন্ত চাহিদা ও ভোগ চরিতার্থ করতে গিয়ে যেভাবে পরিবেশ দূষণ করে চলেছে, তাতে প্রকৃতি কবে কোনদিক দিয়ে তার প্রতিশোধ নেবে, তা কিন্তু মানুষের অজানা। 1965 থেকে 1970 সালের মধ্যে সুইডিশ ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে জলতলে অবায়ুজীবী (anaerobic) কিছু বীজাণু (Methanobacterium amelanskis) পারদকে (যেকোন অবস্থার পারদকে) জারণ (oxidation) ও "মিথাইলেশন" করতে পারে যার ফলে জলে অদ্রাব্য কিন্তু চর্বি বা তৈলাক্ত পদার্থে সহজদ্রাব্য (fat soluble) CH_3-Hg-CH_3, CH_3-Hg-Cl উৎপন্ন হয়। জলে অম্লাধিক্য থাকলে একইভাবে উৎপন্ন CH_3-Hg-OH (জলে দ্রাব্য) CH_3-Hg^+ এ পরিণত হয়। জীবদেহে এ সবের প্রবেশ্যতা খুব বেশী। এইসব পারদযৌগ সাধারণ পারদ থেকে অনেকগুণ বেশী বিষাক্ত। এরা সহজেই জলের উদ্ভিদ ও জীবকণায় সঞ্চিত হয়ে সেখান থেকে ছোট মাছ, পোকামাকড়, জলজ উদ্ভিদের মাধ্যমে খাদ্যশৃংখলে উঠে আরো বড় মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণীর দেহে বিবর্ধিত (amplified) হয়ে প্রবেশ করে। সেগুলো খেয়ে পাখী, বেড়াল, মানুষরা মিনামাটা রোগে আক্রান্ত হয়। (খনিজ তেল ও অন্যান্য জীবদেহে পারদের পারমাণ কেন বেশী তা বোধহয় এখন স্পষ্টতর হচ্ছে। অশোধিত কিছু খনিজ তৈলে 20 ppm, "টারের" কোন অংশে 500 ppm পর্য্যন্ত পারদ পাওয়া গেছে)।

মাছে 5-7 ppm পারদ বিপদজ্জনক। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে এক কেজি মিথাইল মারকারি (প্রায় এক কেজি পারদ) মোটামুটি এককেজি ওজনের একলাখ মাছকে বিপজ্জনক ভাবে বিষাক্ত করতে পারে। তাহলে ভারতীয় পরিবেশে (ফসিল ফুয়েল দহন উদ্ভূত পারদ বাদে) প্রতি বছর যে শ' দুয়েক টন (দুলাখ কেজি) পারদ ছাড়া হচ্ছে তার ধ্বংস ক্ষমতা সহজেই অনুমান করা যায়। দামোদরের জলে (দুর্গাপুরে) পারদের পরিমাণ ইতিমধ্যেই বিপদসীমা অতিক্রম করে গেছে।

পারদযৌগ শরীরে ঢুকে প্রোটোপ্লাজমকে নষ্ট করে, শারীরিক কাজকর্মে অত্যাবশ্যক এন্‌জাইমগুলিকে আক্রমণ ক'রে। প্রোটিনের N – H গ্রুপের সঙ্গে পারদ জোরালো বন্ধনে যুক্ত হয়ে তাকে বিনষ্ট করে। যে সমস্ত প্রোটিনে, এনজাইমে S – H গ্রুপ থাকে (যেমন যেখানে cysteine আছে) পারদ সহজে তার সাথে শক্ত রাসায়নিক বন্ধন তৈরী করে তার কার্যক্ষমতা স্পষ্ট করে দেয়ঃ

$$CH_3\text{-Hg-Cl} + \text{enzyme-SH} \rightleftharpoons CH_3\text{-Hg-S-enzyme} + HCl$$

শরীরে যেকোন দূষিত বা বিষাক্ত পদার্থ ঢুকলে সব সময়ই যে মস্তিষ্ক (ব্রেন) বা গর্ভস্থ শিশু আক্রান্ত (যার ফলে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়) হবেই এমন কথা নাই। কিন্তু পারদ বিষের এই ভয়ঙ্কর ক্ষমতা আছে। মানবদেহে অজৈব পারদের অর্ধ জীবনকাল সাধারণতঃ 5 দিন, সেখানে মিথাইল মারকারির 72 দিন। মিথাইল মারকারির দ্রাব্যতা চর্বিজাতীয় পদার্থে বেশী হওয়ায় তা মানবদেহের চর্বিজাতীয় কলাগুলিতে (fatty tissues) বেশী সঞ্চিত হয়, বিশেষ করে চর্বিসমৃদ্ধ স্নায়ুতন্ত্রীগুলিতে। মিথাইল মারকারির "জলাতঙ্ক" (hydrophobicity) এমনই উপযুক্ত (optimum) যে রক্তবাহিত হয়ে যখন সে ব্রেনে যায় তখন ঝিল্লী (membrane) ভেদ করে সহজেই সে মস্তিষ্কের কলা আক্রমণ করে সেখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে, ক্রমসঞ্চিত হয়ে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুকে দেহে মনে পীড়িত করে তোলে। অনুরূপভাবে যে গর্ভস্থ ফুলের (placenta) মাধ্যমে অজাত শিশুর পুষ্টি যায়, তা দিয়েই মিথাইল মারকারি গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্ককে আক্রমণ করে ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়।

লুঈ ক্যারোলের "এ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের "ম্যাড হ্যাটারের" কিছু বাস্তব ভিত্তি থাকা স্বাভাবিক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের টুপি নির্মাতারা "ফেল্‌ট হ্যাট" বানাতে মারকিউরিক অক্সাইড (HgO) ব্যবহার করত, যা কারিগরদের চামড়া ভেদ করে রক্তস্রোতে প্রবেশ করতো এবং অবশেষে আক্রান্ত ব্যক্তি "ম্যাড হ্যাটার" হয়ে যেত। সেটা আজ বন্ধ হলেও মিনামাটা, নিগাটা, আরিয়াকে শতশত পশুপাখী ও মানুষের উন্মাদ মরণ নাচন আটকানো যায়নি। ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায়, এখুনি উপযুক্ত ব্যবস্থাদি না নিলে অর্ধেক কলকাতা একদিন মরণ নাচনে নেচে উঠবে। বাঙ্গালীরাই প্রধানতঃ মৎসভোজী হলেও শাকাহারীরাও একেবারে বাদ

যাবেন মনে হয় না। কারণ গরুর দুধ ও অন্যান্য খাদ্য মারফৎও শরীরে নানা অবস্থায় পারদ ঢোকে। পারদের সর্বোচ্চ "নিরাপদ মাত্রা" 0·01 (বাষ্প) বলা হলেও, প্রকৃতপক্ষে পারদের কোন নিম্নতম নিরাপদ মাত্রা নেই। যেটুকু শরীরে ঢুকে আটকে যাবে, তাই ক্ষতি করবে, শরীরে ক্রমসঞ্চিত হয়ে স্বাস্থ্য ও আয়ুহানি করবেই। বর্তমানে একজন মার্কিন নাগরিকের দেহে প্রায় 13 মিলিগ্রাম পারদ জমা হয়েছে। 70 কেজি ওজনের কোন ব্যক্তির দেহে দৈনিক যদি 0·3 মিলিগ্রাম পারদ ঢোকে তবে অচিরেই তার দেহে পারদবিষের লক্ষণ ফুটে উঠবে।

নিবারণ ও প্রতিকার ঃ

পারদবিষে আক্রান্ত হলে যেহেতু প্রতিকারের উপায় প্রায় নাইই, তাই নিবারণই সর্বোত্তম পন্থা—prevention is better than cure কথাটি এখানে অনেক বেশী সত্য। পারদবিষের চিকিৎসায় BAL ও Ca_2EDTA প্রয়োগ যে কিছু উপকার করতে পারে তা আগেই বলেছি।

পারদবাহী শিল্প আবর্জনা যাতে জলে না যায় তার ব্যবস্থা এক্ষুণি করা দরকার, বিশেষ করে রিসড়া, খড়দহ ও দুর্গাপুরের ক্লোর-এ্যালকালি শিল্পের। ক্লোর-এ্যালকালি শিল্পের পারদকে বহির্পরিবেশে যেতে না দিয়ে বর্জ্য পদার্থ থেকে পারদ উদ্ধার করে নিয়ে পুনঃব্যবহার আর্থনীতিক দিক দিয়ে যেমনি লাভজনক, মানব পরিবেশের স্বাস্থ্যের পক্ষেও তেমনি হিতকর। "মারকারি ক্যাথোড" ব্যবহার করে কস্টিক সোডা তৈরীর প্রযুক্তির বদলে "ডায়াফ্রাম সেল" ব্যবহার করে কস্টিক উৎপাদন করা যায়। তাতে পারদদূষণ এড়ানো যায়। টিটাগড় কাগজকলে নিজস্ব প্রয়োজনে দৈনিক গড়ে প্রায় দশ টন কস্টিক ডায়াফ্রাম সেল ব্যবহার করেই করা হয়। পারদ বিপদের নতুন উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত হয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র 1969-72 সালের মধ্যে পরিবেশে 85% পারদ বিযুক্তি কমিয়েছেন। পরিবেশে এখন থেকে পারদ ছাড়া বন্ধ করলেও বিগত বছরগুলিতে ইতিমধ্যেই যা ছাড়া হয়েছে তা জলতলে এক এক ঘুমন্ত বিভীষিকা হয়ে থাকবে আগামী দশকের পর দশক। জলের তলায় জমা পারদের উপর কয়েক সেন্টিমিটার পুরু "ফ্লোরস্পার" (CaF_2) এর একটি আস্তরণ ফেলে তাকে অবায়ুজীবী বীজাণুর আক্রমণ থেকে আটকানোর প্রস্তাবও কেউ কেউ করেছেন। সবচেয়ে প্রয়োজন শিল্পকারখানাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা, প্রচলিত প্রযুক্তির পুনর্মূল্যায়ন করা এবং পরিবেশের সমগ্র লেক, নদী উপকূলকে পরিষ্কার ও দূষণমুক্ত রাখা। আর নিয়মিত মাছে পারদ মাপা। জল যদি দূষণমুক্ত থাকে, অবায়ুজীবী বীজাণুরা যদি তাদের পুষ্টির জন্য নাইট্রেট ফসফেট না পায় তবে পারদের "ডানা গজিয়ে" মিথাইল মারকারি হওয়ার সম্ভাবনা কমবে। পারদদূষণ বিপদের একটি প্রমাণিত উৎস (proven hazard)। বাঁচবার জন্য আশু চাই গভীরতর চিন্তা, অনুসন্ধান ও কাজকর্ম। নাহলে কলকাতায় একদিন প্রলয় নাচন লাগবে।

জেরক্স কর্মীরা সাবধান!

আজকাল বই-এর কপি, চিঠির কপি, জার্নালের কপি খুব সহজেই নকল করা যাচ্ছে, জেরক্স মেসিনের দৌলতে। কাজটা তাড়াতাড়ি হলে কি হবে, কর্মীদের নিস্তার নেই। তাঁদেরও ক্যান্সারের আশংকা বাড়ছে। টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল শাখার গবেষকরা ক্যান্সার তৈরী করার মধ্যমণিকে খুঁজে পেয়েছেন। মধ্যমণিটি এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। নাম নাইট্রোপাইরিন। জেরক্স মেসিন নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের প্রায়ই নাইট্রোপাইরিনের সংস্পর্শে আসতে হয়। গবেষকরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন নাইট্রোপাইরিণ ব্যাকটেরিয়া কোষের জেনেটিক মিউটেশন ঘটাতে সক্ষম। তাই তাঁরা নাইট্রোপাইরিন নিয়ে আরও বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রদীপ কুমার দাস।

[*Source* : Current Contents, Life Seience, Vol. 23, No. 25, 1980]

কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার ও পরিবেশ দূষণ

সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়

সভ্যতা বিকাশের সাথে বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে মানুষ হস্তক্ষেপ করেছে প্রকৃতির উপর। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শিল্পের প্রসার যখন আরম্ভ হোলো, তখন মানুষ কৃষির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হ'য়ে শিল্পাঞ্চল সৃষ্টি করলো। প্রকৃতির উপর নির্মমভাবে হাত দেওয়া হোলো—কিন্তু কি প্রতিক্রিয়া পরিবেশের উপর হ'তে পারে সে বিষয়ে কোনও নজর দেওয়া হোলো না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে, পৃথিবীব্যাপী দ্রুত শিল্পায়ন শুরু হোলো, যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে, বর্তমানে পরিবেশ সঙ্কটের উদ্ভব হয়েছে।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে শিল্পের অগ্রগতি ও জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও সেই . অনুপাতে বসবাসের সুযোগের অভাবই পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ। এছাড়াও অন্য অনেক বিষয়ের কথা এই প্রসঙ্গে ভাববার আছে। বর্তমানে কীটনাশক ঔষধের ব্যাপক ব্যবহার ও জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব সম্বন্ধে অনেকে ওয়াকিবহাল। পরিবেশ দূষণেও কীটনাশক ঔষধের ভূমিকা আছে এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। বর্তমানে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার কৃষিতে এবং বাড়ীতে ব্যাপকভাবে চলছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কীটনাশক ঔষধের দরুন কি ধরনের ও পরিমাণ দূষণ বা ক্ষতি হ'তে পারে তার সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু এবিষয়ে সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। পরীক্ষাগারে সীমিত তথ্যের উপর নির্ভর করে ব্যবহার করার পর দেখা যায় প্রাকৃতিক পরিবেশে এইসব রাসায়নিক পদার্থের গুণাগুণের পরিবর্তন ঘটে। 1940 সালে ডিডিটি এবং তার কিছু পরেই বি. এইচ. সি আবিষ্কার ও তাদের ব্যাপক ব্যবহার সুরু হয়। বর্তমানে ব্যবহারের তালিকায় দুই শতাধিক কীটনাশক ঔষধের নাম পাওয়া যায়।

বহু ধরনের কীটনাশক ঔষধের রাসায়নিক বা ভেষজ, মাছ এবং অন্য জলজ প্রাণীর উপর বিষক্রিয়া সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। যদি হঠাৎ পুকুরে, নদী বা নালায় ঔষধ পড়ে যায় কিংবা কোন কারণে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তা'হলে মাছ এবং অন্য জলজ প্রাণীর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকবেই। কীটনাশক ঔষধের ব্যবহারে বিশেষ নিয়মাবলী আছে, যথা ঔষধ ব্যবহারের পর ঔষধ ব্যবহারকারীর জামাকাপড় পরিষ্কার করা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়া, যন্ত্রপাতি ধোয়া, পরিত্যক্ত ঔষধের কৌটার সদ্গতি করা প্রভৃতি সম্বন্ধে। বিশেষ করে সাবধান করা আছে যে ধোয়ার পর জল যেন বাইরের পুকুরে বা নালায় না প্রবেশ করে, সেজন্য আলাদা বন্দোবস্ত রাখতে হবে। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে সেই ব্যবস্থা বা নির্দেশাবলী কি মানা সম্ভব বা কার্যকরী হতে পারে? কৃষক ঔষধ প্রয়োগের পর অঙ্গধাবন এবং জামাকাপড় কাচা পুকুর, নালা বা নদীতেই করবে। নলকূপ বা অন্যকূপের জল ব্যবহার করলেও সেই জল নির্গমের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় ডোবা বা নালাতেই পড়বে। সুতরাং জল দূষিত হওয়া স্বাভাবিক।

এছাড়া মাঠে বা বাগানে গাছের উপর প্রয়োগ করার পর বৃষ্টি হ'লে বৃষ্টির জল গড়িয়ে এসে পুকুর, নদী, নালা প্রভৃতিতে পড়বে। হাওয়াতে ভাসমান ঔষধ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়, কিংবা বৃষ্টি বা শিশিরপাতের দরুন বিভিন্ন জলাশয়ের মধ্যে আসতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যদি পাউডার বা ডাস্ট হিসাবে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তাহ'লে শতকরা কুড়ি থেকে পঁচিশ ভাগ গাছের উপর পড়ে, বাকী অংশ মাটিতে কিংবা হাওয়ায় মিশে যায়। যদি তরল আকারে স্প্রে করা হয় তাহ'লে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হাওয়ায় বা মাটিতে পড়বে, বাকী পঞ্চাশ ভাগ গাছের উপর পড়বে।

কীটনাশক ঔষধ কত অল্প পরিমাণে মাছের পক্ষে ক্ষতিকারক, তা নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাবে। LC 50 (Lethal Concentration 50—অর্থাৎ যে পরিমাণে থাকলে শতকরা 50 ভাগ প্রাণী বিনাশ পাবে) ppb (অর্থাৎ প্রতি বিলিয়নে কি পরিমাণ থাকবে)

ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকারবন

আলড্রিন (Aldrin)—	3
ডাইঅলড্রিন (Dialdrin)—	3
এনড্রিন (Endrin)—	0·5
ডিডিটি—	5
এনডোসালফান (Endosulphan)—	1·2
হেপ্টাক্লোর (Heptachlor)—	9
টক্সাফিন (Toxaphene)—	4
মিথক্সিক্লোর (Methoxychlor)—	7
বি. এইচ. সি (লিন্ডেন—Lindane)—	18

অরগানো ফসফরাস (Organophosphorus)

ক্লোরোপাইরিফস্ (Chloropyriphos)—20
মেভিনফস (Mevinphos)— 17
প্যারাথায়ন (Parathion)— 47
ম্যালাথায়ন (Malathion)— 100
ডাইয়াজিনন (Diazinon)— 54

ভেষজ

পাইরেথ্রিন (Pyrethrin)—56
রোটেনন (Rotenone)—32

মোটামুটি তিন ধরনের রাসায়নিক কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার বর্তমানে হয়—(ক) অরগানোক্লোরিন, (খ) অরগানোফসফরাস (গ) কারবামেট। অরগানো ফসফরাস ও কারবামেট জাতীয় রাসায়নিক ঔষধের অল্পদিনের মধ্যে কার্যকারিতা নষ্ট হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে যাওয়ার পর কোনও বিষক্রিয়া থাকে না। কিন্তু অরগানো ক্লোরিন কীটনাশক ঔষধ সহজে বিনষ্ট হয় না এবং বহুদিন কার্যকরী থাকে। তাছাড়া জীবজন্তুর শরীরে প্রবেশ করলে খাদ্য, বাতাস বা জলের মাধ্যমে, শরীর থেকে বাহির হয় না, উপরন্তু শরীরের মধ্যে জমতে থাকে এবং একটা পরিমাণ বা সীমা অতিক্রম করলে শরীরের ক্ষতি করে। যে মাত্রায় ব্যবহার করা হয়, তাতে ঔষধ প্রয়োগের সময় বা অব্যবহিত পরে বিষক্রিয়া না দেখা দিলেও, বহুদিন ধরে ব্যবহার করার ফলে শরীরে এই ধরনের ঔষধ জমতে পারে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান লেকে ট্রাউট মাছের উপর সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে মাছের শরীরের মধ্যে ডিডিটি বা ডাইঅলড্রিন সহজে বহুগুণ জমতে পারে। জলে 0·000006 পি.পি.এম ডিডিটি এবং 0·000002 পি.পি.এম ডাইঅলড্রিন ছিল, কিন্তু মাছের শরীরে ডিডিটির পরিমাণ 18·8 পি.পি.এম এবং 0·26 পরিমাণ ডাইঅলড্রিন ছিল, অর্থাৎ ডিডিটি জমেছে শরীরে $3·3 \times 10^6$ গুণ এবং ডাইঅলড্রিন $1·3 \times 10^5$ গুণ।

কীটনাশক ঔষধের দরুন জল দূষিত হ'তে থাকলে ভবিষ্যতে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা গবেষণা করে দেখেছেন ডঃ হার্লবার্ট (Hurlbert, S.H. Residue Reviews 57, 82, 1975) ক্যালিফোর্ণিয়ার 'টুলে' হ্রদে (Tule Lake) জাতীয় বন্যপ্রাণী আশ্রয়ে (National wildlife refuge) পাঁক, জল ও মাছের মধ্যে অরগানোক্লোরিন অধিক পরিমাণ থাকার ফলে মাছ ভক্ষণ করে যে সব পাখী বেঁচে থাকে, তাদের সংখ্যা কমতে থাকে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদের সংখ্যা কমতে থাকে, অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সংখ্যা কমে এবং পোকার (worms) উপদ্রব বাড়ে, বিভিন্ন ধরনের মাছের বৈচিত্র্য কমতে থাকে, কচ্ছপ বিনষ্ট হয়, সাপ ও উভচর প্রাণীর সংখ্যা খুব কমে যায়, হ্রদ ক্রমশঃ সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা পড়ে। টুলে হ্রদে ইকোসিস্টেমে (ecosystem) অরগানোক্লোরিনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতিকালে কলিকাতার বেলেঘাটায় সুভাষ সরোবরে মাছের মড়কের কারণের মধ্যে অরগানো-ক্লোরিনের বিশেষ ভূমিকা আছে। পরিবেশ দূষণের সুদূর-প্রসারী কুফল হয়তো অন্যত্রও দেখা গিয়েছে, কিন্তু এই ধরনের গবেষণা সময়সাপেক্ষ এবং জটিল, সেজন্য সঠিক তথ্য নির্ণয় করা ও সিদ্ধান্তে আসা শ্রম ও ব্যয়সাধ্য, কিন্তু প্রয়োজন আছে।

ডি.ডি.টি বা অন্য ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকারবন বা অরগানো ক্লোরিনের ব্যবহার করা হয় সেইজাতীয় পোকার দমনে, যার মাধ্যমে মানুষ ও পশুর রোগ ছড়ায় যথা ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, পীতজ্বর (yellow fever), নিদ্রালু অসুস্থতা (sleeping sickness) ইত্যাদি। এইসব রোগ দরিদ্র ও উন্নতিকামী উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে ব্যাপক দেখা যায় এবং ক্ষতির কারণ হয়। অরগানোক্লোরিন জাতীয় কীটনাশকের কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী এবং মূল্য অন্য ঔষধের তুলনায় অনেক কম, সেজন্য এদের ব্যবহার খুবই বেশী। অনেক দেশে এইজাতীয় ঔষধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এই ধরনের নিষেধের প্রস্তাব সমর্থন করেন না, কেননা দরিদ্র দেশের পক্ষে জনস্বাস্থ্যের জন্যে ব্যয়বহুল বিকল্প ঔষধ ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। ডঃ মেলানবি (Dr. Mellanby in Pesticides and Human Welfare Chapter 18, D.L. Gunn and J.G.R. Stevens (editors). Oxford University Press) মন্তব্য করেছেন যে উন্নতিকামী দেশে ডিডিটির ব্যবহার নিষেধ করার ফলে অসংখ্য লোক ম্যালেরিয়া রোগে মারা পড়ে, সেক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের জন্য কিছু ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি সহ্য করতে হ'বে।

ক্ষতির গুণগত ও সংখ্যাগত পরিমাণের তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা কঠিন। এই বিষয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞান খুবই সীমিত। কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করার দরুন পরিবেশ দূষণ ও জীবজন্তুর উপর তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সমীক্ষা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে 20 বৎসর ধরে প্রবীণ গবেষক দ্বারা করা হয়েছে। টেট্‌সি পোকার দমনের জন্য (যার মাধ্যমে নিদ্রালু অসুস্থতা—sleeping sick-ness—ছড়ায়) এন্‌ডোসালফান ও ডাইঅলড্রিন স্প্রে করা হয়। ঔষধ প্রয়োগের পর জীবজন্তুর মৃত্যু সম্বন্ধে তথ্য নেওয়া হয়েছে, যদিও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়নি। সংক্ষেপে পরিবেশন করা হোলো সেই তথ্য ঃ—

ঔষধ	প্রয়োগ	দেশ	জন্তুর উপর প্রতিক্রিয়া
ডাইঅলড্রিন	মাটি থেকে ও উপর হইতে (এরোপ্লেন মাধ্যমে)	জাম্বিয়া	স্তন্যপায়ী জন্তুর মৃত্যু (বেবুন ও হায়েনা সহ)
		বোৎসানা, কেনিয়া নাইজেরিয়া	পাখী, সরীসৃপ, উভচর, মাছ প্রভৃতির মৃত্যু
এণ্ডোসালফান	উপর হইতে এরোপ্লেন সাহায্যে	নাইজেরিয়া নাইজার আপারভোল্টা	স্তন্যপায়ী, পাখী, সরীসৃপ, মাছ, জলজ ও ভূমিজ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মৃত্যু
পাইরেথ্রিন (অভেষজ, রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত)	এরোপ্লেন সাহায্যে উপর হইতে	আইভরি কোস্ট	জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও ভূমিজ কীটপতঙ্গের মৃত্যু

কীটনাশক ঔষধের প্রয়োগে পরিবেশ দূষণের ফলে মৌমাছির ক্ষতি হ'তে পারে। ম্যালাথায়ন জন্তু বা মানুষের উপর বিষক্রিয়া অতি সামান্য, কিন্তু মৌমাছির পক্ষে মারাত্মক। বি. এইচ. সি. প্যারাথয়ন, ডাইঅলড্রিন, কার্বারিল (যথা সেভিন), অ্যালড্রিন, ডাইজিনন, ডাইক্লোরোভস (Dichlorovos যথা নুভান) ফসফামিডন (যথা ডিমেক্রন), প্রভৃতি মৌমাছির শরীরে খুব সামান্য পরিমাণে বিষক্রিয়া শুরু করে (0·001 – 1·99 মিউগ্রাম একগ্রামের একমিলিয়ন অংশ প্রতি মৌমাছি) ও মৃত্যু ঘটায়। যাঁরা মৌমাছি পালন করেন তাঁরা কীটনাশক ঔষধের কুফল মৌমাছির উপর হ'তে পারে পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে, সেবিষয়ে অনেকেই অবহিত নহেন।

বর্তমানে বিতর্ক শুরু হয়েছে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া বনাম খাদ্য উৎপাদন প্রসঙ্গে। বর্তমানে কৃষির নিবিড়তা বৃদ্ধির ফলে রোগ ও পোকার আক্রমণ বেড়েছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনাই বেশী। রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে হ'লে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার অপরিহার্য। যদি দমন করা না যায় তাহলে 2000 খ্রীষ্টাব্দে খাদ্য উৎপাদন ভীষণভাবে কমে যাবে রোগ ও পোকার আক্রমণে। খাদ্যাভাব ও অপুষ্টি বিরাট আকারে দেখা দেবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাবার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমাণে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন হ'বে। এক্ষেত্রে কীটনাশক ঔষধের অধিকতর ব্যবহার ও তার দরুণ পরিবেশ দূষণের সমস্যা কিভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে? প্রথমতঃ ঔষধের ব্যবহার সীমিত করতে হ'বে, সুসংহত শস্যরক্ষার মাধ্যমে। এর জন্য প্রয়োজন ফলিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ, সেজন্য প্রযুক্তিবিদ্ নিয়োগ অধিকতর সংখ্যায় করতে হ'বে। দ্বিতীয়তঃ এমন রাসায়নিক ঔষধ নির্বাচন করতে হ'বে যাদের পরিবেশের উপর প্রভাব কম ও স্বল্পাদিন স্থায়ী। বর্তমানে বহু কীটনাশক ঔষধ পাওয়া যায় এবং সঠিক নির্বাচন করা দুরূহ নহে। অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য হ'লেও সামগ্রিক স্বার্থে তার ব্যবহার গ্রহণীয় করার প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ প্রয়োগবিধি সুষ্ঠু ও নিয়মমাফিক হওয়া দরকার, যার ফলে পরিবেশ দূষণের সম্ভাব্যতা ও সুযোগ অনেক কম হ'বে।

বায়ু দূষণ নির্ণায়ক যন্ত্র!

যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গ্যাস-বোমা ফাটালে সৈন্যরা আগে থেকে বুঝতে পারবে সেই গ্যাস থেকে বিষাক্ত পদার্থ ক্ষতি করবে কি না? সৈন্যদের দেহে বিষাক্ত গ্যাস-নির্ণায়ক যন্ত্র বসিয়ে দিলেই জানা যাবে। যন্ত্রটির নাম নার্ভ এজেন্ট ইমমোবিলাইজড এনজাইম এলাম ডিটেকটর, তৈরী করেছেন গ্রেট বৃটেনের মিনিস্ট্রী অফ ডিফেন্স। যন্ত্রটির ওজন সাড়ে বারো কেজি, আজকাল বায়ু দূষণকারী বিভিন্ন দূষিত গ্যাস ধরা সম্ভব হচ্ছে ঐ ধরনের যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে। দূষিত জায়গার সংস্পর্শে এলেই যন্ত্র স্বয়ংক্রিয় সংকেতের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারে বাতাসে দূষিত গ্যাস কতটা পরিমাণে রয়েছে।

প্রদীপ কুমার দাস।

[*Source* : Industrial Toxicology Bulletin, Vol. 3, May 1979.]

বায়ু দূষণ

অরবিন্দ দাশ

সভ্যতার বিস্তার, শিল্পের প্রসার, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, অরণ্যের বিনাশ ও জনবসতির সম্প্রসারণের ফলে জল-বায়ু ও ভূ-প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন চলেছে তা মানুষেরই সৃষ্ট। কলকারখানা, যানবাহন, গৃহস্থবাড়ীর চুল্লির ধোঁয়ার সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাতাসে মিশছে এমন সব রাসায়নিক পদার্থ যা প্রকৃতির দান নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের সমীক্ষায় জানা গেছে মানুষের সৃষ্ট এ ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সংখ্যা এখন প্রায় ত্রিশ হাজার। বস্তুতঃ, বায়ু দূষণ বলতে বায়ুর এমন এক অবস্থাকে বুঝায় যাতে বিভিন্ন গ্যাসীয়, তরল বা কঠিন প্রলম্বিত অপদ্রব্য স্বাভাবিকের চেয়ে এমন উচ্চমাত্রায় উপস্থিত থাকে যে মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা বা অন্যান্য পদার্থের (যেমন, রবার, ধাতব-দ্রব্য, স্থাপত্য-শিল্প, ইত্যাদি) উপর অনভিপ্রেত প্রভাব বিস্তার করে। সামগ্রিকভাবে বায়ু দূষণ সমস্যা বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত, তবে সাধারণতঃ শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলেই প্রকট হয় কারণ এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রলম্বিত বস্তুসমূহের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

বায়ু দূষণ, যথা ধোঁয়াশা গঠন, একদা আমেরিকার লস্ এঞ্জেলস্ শিল্পাঞ্চলের মত শহরের বায়ুর বৈশিষ্ট্য হলেও অধুনা বিশ্বের অধিকাংশ বড় শহরেই এর প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়। তাই শীতকালে সন্ধ্যার ঠিক আগে কলকাতা, বোম্বাইয়ের মত যে কোন বড় কলকারখানাসমৃদ্ধ শহরে আমাদের অনেকেরই অস্বস্তি বোধ করবে অভিজ্ঞতা আছে। প্রসঙ্গতঃ, কলকাতা এখন পৃথিবীর বায়ু দূষণসম্পন্ন শহরগুলির মধ্যে অগ্রণী।

কারণ—বায়ু দূষণের জন্য যে সব বস্তু মুখ্যত দায়ী সেগুলি হল হাইড্রোকার্বন ও অন্যান্য জৈব যৌগ, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন মনো- ও ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ধূলিকণা প্রভৃতি। কয়লা, গ্যাসোলিন জাতীয় জীবাশ্ম জ্বালানীর দহনের ফলে তিন ধরনের দূষক উৎপন্ন হয়ে বায়ু দূষিত করতে পারে। যেমন, অসম্পূর্ণ দহনের ফলে উৎপন্ন হয় হাইড্রোকার্বন, কার্বন মনোক্সাইড ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ। জ্বালানীতে অবস্থিত দূষিত পদার্থের দহনে সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ গঠিত হয়। এছাড়া অতি উচ্চ তাপমাত্রায় দহনের সময় নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ উৎপন্ন হয়। কলকারখানার ধোঁয়া বায়ু দূষণের প্রধান উৎস হলেও মোটর গাড়ীর ধোঁয়া শহরাঞ্চলের দূষণের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। মোটর গাড়ীর নিঃসৃত গ্যাসে যে সব ক্ষতিকারক বস্তু থাকে তার মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহের মাত্রা খুবই বেশী থাকে।

ব্যাখ্যা—কোন শহরাঞ্চলের বায়ুতে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ ও হাইড্রোকার্বনের নিঃসরণ, উজ্জ্বল সূর্যালোকের উপস্থিতি এবং অপ্রতুল বায়ু চলাচল প্রভৃতি ঘটনার সম্মিলনের ফলে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়ে বায়ু দূষিত হয়। যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয় তা জটিল প্রকৃতির। দিনের শুরুতে বায়ুতে হাইড্রোকার্বন, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ইত্যাদি অল্পই থাকে। আর ওজোন, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি থাকে না বললেই হয়। কিন্তু পূর্বাহ্নে যানবাহন চলাচল যত বাড়তে থাকে এবং কলকারখানা থেকে যত ধোঁয়া নিঃসৃত হতে থাকে তত বাতাসে হাইড্রোকার্বন, নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ, সালফার ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সূর্যরশ্মির তীব্রতা বৃদ্ধি হেতু আলোক-রাসায়নিক ক্রিয়া শুরু হয় এবং চক্রাকারে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের ভাঙন, ওজোন গঠন, আবার নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের গঠন চলতে থাকে।

যাহোক, উৎস হতে নির্গত নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা বেশী হলে এই ধরনের বিক্রিয়ায় নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং একসময় তা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। আর নাইট্রিক অক্সাইডের হ্রাস ও ওজোনের বৃদ্ধি একই সঙ্গে ঘটে। দুপুর পর্যন্ত ওজোনও এইভাবে বাড়তে বাড়তে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। পরের কয়েক ঘণ্টায় এই মাত্রা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। ওজোন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সর্বোচ্চ মাত্রা হতে কমতে থাকে এবং বিকিরণের শেষ-ভাগে তার পরিমাণ হয় নগণ্য। এরপর বিকালের দিকে আবার যানবাহন চলাচল বাড়লে যে নাইট্রিক অক্সাইড নির্গত হয় তা পর্যাপ্ত মাত্রায় ওজোনের সংস্পর্শে না আসায় জমতে থাকে এবং চলে পরদিন সূর্যালোক তীব্র না হওয়া পর্যন্ত। বায়ুমণ্ডলে ওজোনের উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আলোক-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওজোন জৈব ও অন্যান্য যৌগের সান্নিধ্যে নানা বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। বস্তুতঃ, বাতাসে ওজোনের পরিমাণ দিয়েই কোন শহরাঞ্চল কি পরিমাণ ধোঁয়াশা আক্রান্ত তা ঠিক করা হয়।

ওজোন ছাড়া আর যে সমস্ত জারক পদার্থ এই ধরনের সরাসরি বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে সেগুলি হল—O (সক্রিয় অক্সিজেন),

$\cdot OH$ (হাইড্রোক্সিল মুক্ত-মূলক)। বিভিন্ন প্রকার হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে এই O_3, O, $\cdot OH$ বিক্রিয়া করে নানা ধরনের মুক্ত মূলক।

এইভাবে উৎপন্ন যৌগমূলক আবার খুবই সক্রিয় এবং বায়ুস্থিত O_2, NO, NO_2 ইত্যাদি যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করে যে পদার্থ উৎপন্ন করে সেগুলি আবার বিক্রিয়া-শৃঙ্খলের চলনে সাহায্য করে।

যে সব অঞ্চলের বায়ুতে অধিক সালফার ডাই-অক্সাইড ও বস্তুকণা বিদ্যমান সেখানে ধোঁয়াশা গঠনের ব্যাপারটি একটু অন্যরকম। সালফার ডাই-অক্সাইড আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা অথবা কোন অনুঘটকের উপস্থিতিতে সালফার ট্রাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। সালফার ট্রাই-অক্সাইড জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। সালফিউরিক অ্যাসিড আবার বায়ুস্থিত অ্যামোনিয়া বা অন্যান্য যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ উৎপন্ন করে। এছাড়া সালফার ডাই-অক্সাইড জৈব যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়ায় সালফিনিক অ্যাসিড (RSO_2H) হলুদাভ অনুৎবায়ী ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ধূমায়মান যৌগ গঠন করে। এইভাবে সালফার ডাই-অক্সাইড হতে উদ্ভূত যৌগসমূহ বায়ুস্থিত ভাসমান বস্তুকণার উপস্থিতিতে এরোসল গঠন করে।

প্রসঙ্গতঃ সালফার ডাই-অক্সাইড, সালফার ট্রাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি যৌগসমূহ বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে যথাক্রমে সালফিউরাস অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, কার্বনিক অ্যাসিড ইত্যাদি উৎপন্ন করে। বৃষ্টির সময় এই সমস্ত অ্যাসিড ধুয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসে। যে সব অঞ্চলের বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে উল্লিখিত অধাতব অক্সাইডসমূহ বিদ্যমান সেখানে 'অম্ল বৃষ্টি' খুবই সাধারণ ঘটনা। অম্ল বর্ষণের ফলে গাছপালা, ধাতব পদার্থ এবং স্থাপত্যশিল্পের খুবই ক্ষতি হয়।

প্রভাব—ধোঁয়াশময় দিনে শিল্পবহুল শহরের অধিবাসীরা দুপুর অথবা তার অব্যবহিত পরেই চক্ষুদাহ অনুভব করতে এবং পাঁশুটে বর্ণের কুয়াশার জন্য দূরবর্তী গাছপালা, বাড়ীঘর ইত্যাদি ঝাপ্‌সা দেখতে অভ্যস্ত। পৃথিবীর নানা স্থানে ধোঁয়াশাজনিত বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটেছে। যেমন, বেলজিয়ামের মিউজ ভ্যালীতে 1930 সালের 1—5ই ডিসেম্বরের মধ্যে হঠাৎ অতিরিক্ত ছ'হাজার লোক অসুস্থ হন। লণ্ডন শহরে 1952-র 5—9ই ডিসেম্বরের মধ্যে অতিরিক্ত মৃত্যু হয় চার হাজার তেমনি 1966 সালের 24—30শে নভেম্বরের মধ্যে নিউইয়র্ক শহরে মারা গেলেন প্রায় দু'শ আর অসুস্থ হয়েছিলেন কয়েক হাজার নাগরিক। এবার দেখা যাক্, প্রধান প্রধান বায়ু দূষকগুলি আমাদের কি কি ক্ষতি করছে।

নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড বায়ু মাধ্যমে দৃশ্যমানতার বিঘ্ন ঘটায়, গাছপালার ক্ষতি করে। প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলে বায়ু-রন্ধ্রের রোধ, নিউমোনিয়া ও ফুসফুসের নরম টিস্যুগুলি শক্ত হয়। তেমনি সালফার ডাই-অক্সাইডের বিশেষ ধর্ম হল এটি শ্বাসযন্ত্রের আর্দ্র রন্ধ্রে শোষিত হয়। সালফার ডাই-অক্সাইড ও বস্তুকণা সমন্বিত এরোসল ফুসফুসের ভিতরে ঢুকে টি. বি., ব্রঙ্কাইটিস ও অন্যান্য শ্বাসকষ্টজনিত ব্যাধির কারণ হয়। সালফার ডাই-অক্সাইডের প্রভাবে গাছের পাতা হয় বিবর্ণ, গাছের বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। ধোঁয়াশাস্থিত ওজোন ফুসফুসের গভীরে বায়ুরন্ধ্রকে সরু করে। ওজোন চারাগাছের গুরুতর ক্ষতি করে। চক্ষুদাহকারী বস্তুসমূহের মধ্যে ধোঁয়াশাতে যে সমস্ত যৌগ পাওয়া গিয়েছে তারা ফর্ম্যালডিহাইড, এ্যক্রোলিন, পার-অক্সিঅ্যাসিল-নাইট্রেট ইত্যাদি। পার-অক্সিঅ্যাসিলনাইট্রেট ক্যান্সার রোগেরও কারণ বটে। পিচ গলানোর সময় যে ধোঁয়া উৎপন্ন হয় তাতে বেঞ্জ-(এ)-পাইরিন জাতীয় যৌগ থাকে। এই জাতীয় বায়ু-দূষকসমূহ তীব্র ক্যান্সার সৃষ্টিকারী যৌগ। বায়ুস্থিত কার্বন মনোক্সাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনকে কার্বক্সিহিমোগ্লোবিনে পরিবর্তিত করে এবং রক্তের অক্সিজেন সংবহন ক্ষমতা বিঘ্নিত হয়। গাছপালার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড সরাসরি আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক না হলেও ভূপৃষ্ঠে যেভাবে এর মাত্রা বাড়ছে তাতে সমগ্র ভূমণ্ডলের বিপদের কারণ আছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড সূর্যরশ্মির অবলোহিত অংশ শোষণ করে এবং শোষিত তাপ বেড়িয়ে যেতে বাধা দেয়। এতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ক্রমশঃ বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন যে, বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে মেরুঅঞ্চলের সঞ্চিত বরফ গলে গিয়ে মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করতে পারে। বায়ুতে ভাসমান বস্তুকণার মধ্যে সীসা, পারদ প্রভৃতি ধাতু, কয়লা বা বালির মিহি-গুঁড়ো, অ্যাস্‌বেসটস্ বা তুলোর আঁশ শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। বিশেষ করে স্নায়ুর রোগ, রক্ত দূষণ, নিউমোকোনিয়োসিস্ প্রভৃতি জটিল রোগের কারণ হয়। তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে বায়ুমণ্ডল দূষিত হলে ঐ সকল তেজস্ক্রিয় রশ্মি গোটা প্রজন্মকে ধ্বংস করতে পারে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপান।

সভ্যতার উৎকর্ষবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা ফ্রিয়ন, টেফ্‌লন ইত্যাদি ক্লোরোফ্লুরোকার্বন সমন্বিত যৌগের ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছি। এছাড়া নাইট্রোজেনঘটিত সার বহুল পরিমাণে ব্যবহার করে চলেছি। অতি দ্রুতগামী সুপারসনিক জেট, রকেট প্রভৃতির ব্যবহার শুরু হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বায়ুর উপরিস্থিত ওজোনস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়ারের উপরে আছে ওজোনস্তর বা স্ট্রাটোস্ফিয়ার)। ওজোনস্তরই সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মিকে শোষণ করে ভূপৃষ্ঠে আসতে দেয় না। কিন্তু এই ওজোন-স্তর পর্যাপ্ত পরিমাণে ধ্বংস হয়ে পাত্‌লা হয়ে যায় তবে অতিরিক্ত-অতিবেগুনী রশ্মির বিকিরণে সমস্ত প্রাণীকুলেরই ত্বকের ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার আশংকা আছে।

নিয়ন্ত্রণ—বায়ু দূষকসমূহের নিয়ন্ত্রণপন্থা তিন রকমের হতে পারে। প্রথমতঃ, 'মূল' পদ্ধতিটিকে এমনভাবে সংশোধন করা যাতে কম দূষক উৎপন্ন হয়; দ্বিতীয়তঃ, দহন প্রক্রিয়ার জন্য এমন কোন জ্বালানী ব্যবহার করা যাতে কম পরিমাণ দূষক উৎপন্ন হয়; তৃতীয়তঃ, বাতাসে ছাড়ার আগে নিঃসৃত গ্যাসকে পরিষ্কার করে নেওয়া। উদাহরণস্বরূপ মোটর গাড়ীর ধোঁয়াজনিত দূষণ নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মোটর গাড়ীর ধোঁয়ায় প্রধানতঃ যে হাইড্রোকার্বন, কার্বন মনোক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ থাকে তা এঞ্জিনের কার্যপ্রণালী, এঞ্জিনের গঠন-প্রণালী, আর জ্বালানী বা নিঃসৃত গ্যাসের পরিবর্তন দ্বারা কমানো সম্ভব। এক্ষেত্রে এঞ্জিনের কার্যপ্রণালী সংশোধন বলতে বোঝায়

বায়ু ঃ জ্বালানীর অনুপাত এমনভাবে পরিবর্তিত করা যাতে কম মাত্রায় হাইড্রোকার্বন ও কার্বন মনোক্সাইড আর বেশী মাত্রায় নাইট্রিক অক্সাইড নিঃসৃত হয়। এঞ্জিনের গঠন প্রণালী পরিবর্তন করে দূষণ কমানো অবশ্য খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। গ্যাসোলিনের পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে দূষণের মাত্রা কমানো সম্ভব। আমেরিকার মত দেশে মোটর গাড়ীর এঞ্জিন থেকে গ্যাস নির্গমনের পথে দূষণের মাত্রা কমানোর জন্য 'যুগ্ম অনুঘটকবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ' ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এতে করে নাইট্রোজেন অক্সাইড বিজারিত হয়ে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোকার্বন ও কার্বন মনোক্সাইড জারিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিবর্তিত হয়। এইভাবে মোটর গাড়ীর ধোঁয়াজনিত দূষণের মাত্রা কমানো সম্ভব। তবে যুগ্ম অনুঘটক বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠটিকে মাঝে মাঝে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ এই পদ্ধতিটি দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

উপরে যে তিন জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণপন্থার উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে গ্যাস পরিষ্কার পদ্ধতিটি শিল্পক্ষেত্রে বেশী চালু। গ্যাস পরিষ্কার করার নির্দিষ্ট পদ্ধতিটি অবশ্য যে নির্দিষ্ট দূষক উপস্থিত থাকে তার উপরই নির্ভরশীল হয়। তবে দু'ধরনের প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, গ্যাস অধিশোষণ প্রক্রিয়া—দূষক গ্যাসপ্রবাহকে কোন তরল বা কঠিন শোষক মাধ্যমের মধ্যে চালনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সালফার ডাই-অক্সাইডকে বেশী সান্দ্রতাবিশিষ্ট তরল জৈব অ্যামিন যৌগে বা চুনে অধিশোষণ করা সম্ভব। আর এইভাবে অধিশোষণের দ্বারা সালফার ডাই-অক্সাইড ছাড়াও অ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ, হাইড্রোজেন সালফাইডকে দূর করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, গ্যাসীয় দূষকসমূহের রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা—সাধারণতঃ দহন প্রক্রিয়া বা অনুঘটকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম দূষিত বা দূষিত নয় এমন পদার্থে রূপান্তরিত করে বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাসকে অনুঘটকের উপস্থিতিতে কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন বা মিথেনের সংস্পর্শে বিজারিত করে নাইট্রোজেনে পরিবর্তিত করা হয়।

উপসংহার—বায়ু দূষণ আজ শুধু নির্দিষ্ট কোন দেশের সমস্যা নয়। সমগ্র পৃথিবীর জীবজগতের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নির্ভর করছে এই সমস্যাটির উপযুক্ত সমাধানের উপর। কাজেই বায়ু দূষণের ভয়াবহতার কথা মনে রেখে তার সম্ভাব্য প্রতিকার সম্পর্কে এখনই এগিয়ে আসা দরকার।

মোটরগাড়ীর বিকট আওয়াজ!

মোটরগাড়ী, মোটর সাইকেল চলাচলে যে শব্দের সৃষ্টি হয় তার ফলে ভারতীয়রা কেমন প্রভাবিত হয় সে নিয়ে এক সমীক্ষা চালান রুরকি বিশ্ববিদ্যালয়। উত্তরপ্রদেশ হাইওয়েতে মোটরগাড়ী, মোটর সাইকেল, ভাড়া-ট্যাক্সি, মিনি বাস, অটো-রিকসার উপর এই সমীক্ষার কাজ প্রথম শুরু হয়। সমীক্ষায় প্রকাশ ভারতীয় মোটরগাড়ী ও মোটর সাইকেল প্রশস্ত রাস্তায় চলাকালীন বিদেশের থেকে বেশি শব্দ সৃষ্টি করে যেটা কোনমতেই স্বাস্থ্যের পক্ষে সহায়ক নয়।

প্রদীপ কুমার দাস।

[*Source* : J. Occup. Health, Vol. 22, No. 10-12, 1979, 132-33]

মৃত্তিকা দূষণ

অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আধুনিক যুগে মানুষ বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে নিজের মত করে ব্যবহার করছে। এই বিরাট সাফল্য একদিকে যেমন তার কাছে খুলে দিয়েছে সীমাহীন প্রগতির পথ অন্যদিকে ঠিক তেমনি ইচ্ছামত প্রকৃতিকে ব্যবহার করার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে অনবরত নষ্ট করে চলেছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ, এর ফলে এক কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কী করে এই পরিবেশ বৈষম্য রোধ করা যায়, আর কী করে প্রকৃতির সহজাত ভারসাম্যকে ফিরিয়ে আনা যায় এইগুলি গভীর চিন্তার বিষয়।

শিল্পনির্ভর সমাজের মানুষ আজ তথাকথিত সভ্যজীবন যাপনের প্রয়োজনে অসংখ্য রাসায়নিক পদার্থ মাটিতে, বাতাসে জলে ঢালছে। পরিবেশ দূষণক্ষেত্রে এদের দুষ্কৃতি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মাটিতে এই সব পদার্থ চক্রাকারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জীবাণু, গাছপালা, মানুষ সমেত সমস্ত প্রাণিকুলের জীবনকে নিয়ত দূষিত করছে। দূষণ সংক্রান্ত তথ্য জানা গেছে কিন্তু তাদের তাৎপর্য সম্পর্কে যথেষ্ট উদাসীনতা বিদ্যমান।

সাধারণভাবে মৃত্তিকা দূষণের ক্ষেত্রে পাঁচ ধরনের বিষয়ে উল্লেখ করা যায়ঃ

(ক) রোগ, পোকা ও আগাছা দমনকারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি।

(খ) দূষণকারী অজৈব পদার্থ—ভারী ধাতব যৌগ পর্যায়ে মারক্যুরি (Hg), ক্যাডমিয়াম (Cd), লেড (Pb), নিকেল (Ni), কপার (Cu) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আছে ফ্লুরিন, বোরন, আর্সেনিক, ম্যাঙ্গানীজ ও জিঙ্ক। অতিরিক্ত পরিমাণে এইগুলি বিষাক্ত।

(গ) বর্জিত জৈবপদার্থ—এইগুলি প্রধানতঃ শহর, শিল্পাঞ্চল এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদি থেকে আসে।

(ঘ) অত্যধিক লবণাক্ততা।

(ঙ) তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

রোগ, পোকা ও আগাছা দমনকারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারে মৃত্তিকা দূষণঃ

কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের ফলে বহু রোগের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পেয়েছে, ফসল ও পশুপক্ষীদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে এবং জমিতে ফসলের প্রতিযোগী আগাছাদের নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে কিন্তু পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রয়োগে সফলতা লাভ করে বিজ্ঞানীরা নতুন এবং অধিকতর বিষাক্ত যৌগাদি সৃষ্টি করতে উৎসাহিত বোধ করছে। অথচ তাদের অবশিষ্টাংশ মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীদের কী ক্ষতিসাধন করতে পারে সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের পূর্বেই ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ যাদের উদ্দেশ্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হল তাদের ছাড়া অন্য কারোর ক্ষতি হল কিনা তা প্রায়ই দেখা হয় না। এই ভাবেই পরিবেশ দূষণ ঘটে। এই কারণে পরিবেশ দূষণকারী কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হয়েছে। কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যাদিঃ রোগ, পোকা ও আগাছা দমনের জন্য যে সব রাসায়নিক যৌগাদি ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে কীটনাশক রাসায়নিকের পরিমাণ সর্বাধিক। রাসায়নিক উপাদানের ভিত্তিতে এদের সাধারণতঃ তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়ঃ

(ক) ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন, (খ) জৈব ফসফেট এবং (গ) কার্বামেট।

ডি. ডি. টি ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন গোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কম দাম, অনেকদিন ধরে মাটিতে কার্যকরী অবস্থায় থাকতে সক্ষম এবং মানুষের উপর বিষক্রিয়া কম মাত্রায় হওয়ার দরুন এই গোষ্ঠীর কীটনাশকের ব্যবহার সর্বাধিক। মাটিতে যেহেতু সহজে জীবাণুদ্বারা বিশ্লিষ্ট হয় না সেইজন্য বছরের পর বছর ব্যবহার করার ফলে মাটিতে এদের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে পশুপক্ষী ও মাছের দেহে সঞ্চিত হলে মানুষের পক্ষে দূষণীয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; কিন্তু এখন পর্যন্ত সেরকম কোন তথ্য জানা যায় নি।

জৈব ফসফেট গোষ্ঠীর কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যাদি অতিশয় বিষাক্ত কিন্তু মাটির মধ্যে জীব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সহজেই বিশ্লিষ্ট হয় ফলে কোন অবশিষ্ট থাকে না এবং প্রাণিদেহে সঞ্চিত হতে পারে না। তা হলেও ব্যবহার করার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

কার্বামেট গোষ্ঠীর কীটনাশক যৌগাদিও সহজে এবং দ্রুত মাটির মধ্যে বিশ্লিষ্ট হয় সুতরাং মানুষ ও পশুপক্ষীর দেহে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা কম।

রোগ, পোকা ও আগাছানাশক রাসায়নিক পদার্থের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ :

শ্রেণী	গোষ্ঠী	উদাহরণ
কীটনাশক	ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন—	ডি. ডি. টি., অলড্রিন, বি. এইচ. সি., ইত্যাদি।
	জৈব ফসফেট—	ডায়াজিন, প্যারাথিয়ন, ম্যালাথিয়ন ইত্যাদি।
	কার্বামেট—	সেভিন।
ছত্রাকনাশক	থায়ো কার্বামেট—	
	মারকুরিয়েল—	সেরেসন।
	অন্যান্য—	পি. সি. এন. বি., কপার সালফেট।
আগাছানাশক	ফেনক্সি অ্যালকীল অ্যাসিড—	2.-4-ডি, 2-4-5টি, এম্.সি.পি.।
	ট্রায়াজিন—	অ্যাট্রাজিন, সিমাজিন।
	ফেনিল ইউরিয়া—	মন্যুরোন, ডায়ুরোন, ফেন্যুরোন ইত্যাদি।
	অ্যালিফেটিক অ্যাসিড—	টি. সি. এ।
	কার্বামেট—	আই. পি. সি., সি. আই. পি. সি।
	ডাইনাইট্রো অ্যানিলিন—	ট্রাইফ্লুরালিন, ডাইপ্রোপ্যুলিন।
	ডাইপিরিডল—	প্যারাকোয়াট্, ডাইকোয়াট।

সাধারণতঃ গাছের পাতায় অথবা মাটিতে এই রাসায়নিক পদার্থগুলি প্রয়োগ করা হয়। প্রয়োগ যেখানেই হোক না কেন, অবশেষে অধিকাংশই মাটিতে জমা হয়। মাটিতে প্রয়োগের পর মোটামুটি পাঁচ রকমে এইসব দ্রব্যাদি রূপান্তরিত হতে পারে। যেমন,

(ক) রাসায়নিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে গ্যাসীয় অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে মিশে যেতে পারে।

(খ) মাটির কাদাকণা কিম্বা হিউমাসের দ্বারা অধিশোষিত হয়ে থাকতে পারে।

(গ) জলের সঙ্গে মিশে মাটির গভীরে নেমে যেতে পারে বা মাটি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

(ঘ) মাটিতে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাতে প্যারে।

(ঙ) জীবাণু দ্বারা বিশ্লেষিত হতে পারে।

মাটির জীবাণুর উপর নাশক রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রভাব :

নাশক দ্রব্যাদি বিশেষ বিশেষ জীবাণু, কীটপতঙ্গ এবং আগাছাকে মারার জন্যই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মাটিতে বহু ধরনের অসংখ্য জীবাণু রয়েছে। অতএব একমাত্র বিশেষ কয়েক ধরনের গ্যাস ব্যবহার না করা হলে অধিকাংশ নাশক দ্রব্যই মাটির সব জীবাণুদের ধ্বংস করতে পারে না। জানা গেছে যে কয়েক শ্রেণীর জীবাণুদের উপর ঐ সব দ্রব্যের বিষক্রিয়া ক্ষতিকারক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ডি. ডি টি প্রয়োগের পর মাটির 99 শতাংশ আর্থ্রোপড শ্রেণীর প্রাণী মারা যায় এবং পুনরুদ্ধারে প্রায় দু'বছর লেগে যায়। কীটনাশক ও আগাছা দমনকারী রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে ছত্রাকের সংখ্যা কমে যায়। সেই কারণে ছত্রাকজনিত রোগও কমে। ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন ব্যবহারের ফলে মাটিতে নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

বিভিন্ন অজৈব যৌগের দ্বারা মাটির দূষণ :

এই ধরনের রাসায়নিক যৌগের উৎস যাই হোক না কেন তারা নানাভাবে মাটিতে এসে জমা হয় এবং ক্রমশঃ জীবনচক্রের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। মাটি থেকে গাছে, গাছ থেকে পশুপক্ষীর মধ্যে এবং সেখান থেকে মানুষের শরীরে ঐগুলি প্রবেশ করে।

মাটিতে অজৈব যৌগাদিজনিত দূষণ কমানর জন্য সাধারণতঃ দু'ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় : ঐ যৌগাদির প্রয়োগ বন্ধ করা বা কমান এবং মাটি ও ফসলের এমন পরিচর্যা করা যাতে তারা জৈবচক্রের বাইরে পড়ে থাকে। প্রথম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেশের নীতি নির্ধারক কমিটিগুলির সচেতনতা ও তৎপরতা প্রয়োজন। দূষণকারী দ্রব্যাদি যাতে বাতাসে, জলে এবং মাটিতে জমতে না পারে তার জন্য যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ জারী করা কর্তব্য। তাছাড়া ঐ ব্যবস্থা যথাযথ কার্যকর হচ্ছে কিনা তার জন্য নিয়মিত তদারকিও প্রয়োজন। মাটি ও ফসলের পরিচর্যা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার যাতে দূষণকারী ধাতব ও অধাতব মৌলগুলি মাটিতেই অগ্রহণযোগ্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। যেমন অম্ল মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে চুন প্রয়োগ করে অনেকগুলি ধাতব মৌলকে অদ্রবণীয় অবস্থায় পরিণত করা যায়। তাছাড়া জারিত অবস্থায় ঐ মৌলগুলি অগ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

বর্জিত জৈব পদার্থ দ্বারা মৃত্তিকা দূষণ :

শহর ও গ্রামের জৈব আবর্জনা পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে আজ একটি আন্তর্জাতিক সমস্যার আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে বড় বড় শহরে প্রতিদিন হাজার হাজার টন নানা ধরনের আবর্জনা জমা হয়। এই সব আবর্জনা হয় পুড়িয়ে ফেলা হয় নয়ত নদীতে ঢালা হয় অথবা পচিয়ে বা না পচিয়ে মাটিতে ফেলা হয়। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে ঐ সব আবর্জনা জলে

না ফেলে বা পুড়িয়ে বায়ুমণ্ডলকে দূষিত না করে বরং পচিয়ে বা না পচিয়ে জমিতে ফেলা ভাল। অবশ্য দেখা দরকার মাটি যেন দূষিত না হয়। দু'ভাবে এইসব আবর্জনাকে ব্যবহার করা যায়। বাড়ীর আনাজ ফলমূলের অবশিষ্টাংশ, বাড়ী ও রাস্তার ময়লা এবং পশুপক্ষীদের মলমূত্র প্রভৃতি চাষের জমিতে ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়। আর অন্যভাবে যে সব পদার্থ সহজে পচনশীল নয় এবং মাটির ক্ষতি করতে পারে সেই সব পদার্থ চাষের অযোগ্য জমিতে ফেলা দরকার। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক দিক বিচার বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

নাইট্রোজেনযুক্ত নানা ধরনের জৈব আবর্জনা মাটিতে বিশ্লেষিত হয়ে অত্যধিক পরিমাণে নাইট্রেট সৃষ্টি করতে পারে। ঐ নাইট্রেট জলের সঙ্গে মিশে দূষিত করতে পারে। পানীয় জলে নাইট্রেটের পরিমাণ বেশী হলে মারাত্মক বিষক্রিয়া করে।

ভূস্তরে অনেকগুলি তেজস্ক্রিয় মৌল রয়েছে। তাদের মধ্যে বিশেষ করে ^{40}K, ^{87}Rb এবং ^{14}C মাটিতে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পারমাণবিক গবেষণাদি ও বিস্ফোরণজনিত তেজস্ক্রিয়তা নিয়ত বাড়ছে। এই কর্মকাণ্ডে যে সমস্ত আবর্জনা জমছে তারা মাটি, জল ও বাতাস দূষিত করছে। এই সম্পর্কিত সমস্যাদি উন্নতশীল দেশগুলির নিকট অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলেও এগুলি পৃথিবীতে সর্বত্র প্রযোজ্য কারণ দূষিত জল ও বাতাস সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এই সকল তেজস্ক্রিয় অণুদের মধ্যে (^{90}Sr) স্ট্রনসিয়াম—90 (তেজস্ক্রিয়তার অর্ধজীবন—28 বছর), (^{137}Cs) সিজিয়াম—137 (তেজস্ক্রিয়তার অর্ধজীবন 30 বছর) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাটিতে ^{90}Sr ক্যালসিয়ামের মতই থাকে ও বিক্রিয়া করে। বায়ুমণ্ডল থেকে দ্রবণীয় অবস্থায় মাটিতে এসে জমা হয় এবং মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জৈব ও অজৈব কলয়ড দ্বারা অধিশোষিত হয় এবং ক্যালসিয়ামের মতই আয়ন বিনিময়ের মাধ্যমে গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় চলে আসে। গাছের দেহকোষের মধ্যেও স্ট্রনসিয়াম ক্যালসিয়ামের মত বিক্রিয়া করে বলেই ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিতে ^{90}Sr অণুর গ্রহণযোগ্যতা কম হয়।

রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য পটাসিয়ামের মত হলেও মাটিতে ^{137}Cs অপেক্ষাকৃত কম গ্রহণযোগ্য হয়। পটাসিয়ামের মত ^{137}Csও ইলাইট ও ভারমিকুলাইট কাদাকণার গঠনের মধ্যে একইভাবে আবদ্ধ থাকে। একইভাবে আবদ্ধ সিজিয়াম অবিনিময়যোগ্য অবস্থায় থাকে। গাছ অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে ^{137}Cs গ্রহণ করে।

পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তক

কৃষিবিদ্যা

পূর্বভারতের ফসল—	মতিলাল মজুমদার	১৫.০০
মৌলিক কৃষিবিজ্ঞান— (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর)	বলাইলাল জানা	১৪.০০
ঐচ্ছিক কৃষিবিজ্ঞান— (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর)	বলাইলাল জানা	১৩.০০
উদ্যান বিজ্ঞান এবং ফল ও সব্জী সংরক্ষণ— (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর)	রামানন্দ চক্রবর্তী	১৫.০০
শস্যোৎপাদনের মূলতত্ত্ব— (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর)	রামানন্দ চক্রবর্তী, বিজন কুমার মণ্ডল	২৮.০০
কৃষি উৎপাদনের অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ—	প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়	২৫.০০
অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ— (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর)	শচীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫.০০
কৃষিজীবাণুবিজ্ঞান—	নীলাংশু মুখার্জী	২৫.০০

পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও তার প্রতিক্রিয়া

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

তেজস্ক্রিয়-ভস্ম (Nuclear Fallout) কথাটা সাধারণভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে ছড়িয়ে পড়া তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমূহকেই বোঝায়। বলাই বাহুল্য পৃথিবীর আবহাওয়া এবং প্রাণিকূলের পক্ষে এই ভস্ম মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে যদি এর পরিমাণ অবাধে বাড়তে থাকে। বস্তুতঃপক্ষে ইতিমধ্যেই পৃথিবীর আবহাওয়ায় এত বেশী পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে যে, তার প্রভাব থেকে মানুষের পরবর্তী প্রজন্ম-গুলিও হয়ত মুক্তি পাবে না।

প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় 1945 সালে নিউ-মেক্সিকোতে। এটা ছিল পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ; কিন্তু এর ঠিক পরেই দু'টি পরমাণুবোমা নিক্ষিপ্ত হয় হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে। এ প্রসঙ্গে নতুন ক'রে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এর সুদূরপ্রসারী কুফল থেকে জাপান এখনো মুক্ত হয়নি, এখনো এরই প্রভাবে জাপানে প্রতি বছরই জন্ম নেয় বিকলাঙ্গ শিশুর দল। লিউকোমিয়ার শিকার হয় অনেক মানুষ।

1969 সাল পর্যন্ত পৃথিবীর পাঁচটি দেশ সারা পৃথিবীতে অসংখ্য পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এবং প্রায় অবাধেই এই সমস্ত পরীক্ষার কাজ চালানো হয়েছে। আমেরিকা একাজে বেছে নিয়েছে নেভাডা এবং প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলকে, বৃটেন পরীক্ষা চালিয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং ক্রিস্টমাস্ আইল্যাণ্ডে। পরীক্ষা মূলক বিস্ফোরণ সংখ্যার দিক থেকে প্রায় মাত্রা ছাড়িয়ে যায় 1954, 1958 এবং 1961 সালে। পরবর্তীকালে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, কিন্তু ফ্রান্স এবং চীন এই চুক্তিতে সই করেনি এবং তারপরও ফ্রান্স সাহারা এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং চীন তার নিজস্ব ভূখণ্ডে কোথাও বেশ কিছু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ভারতবর্ষও ঘটিয়েছে একটি।

এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে যত বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে তার তেজস্ক্রিয়-ভস্মরাশির মধ্যে দু'টি মূল দীর্ঘস্থায়ী তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক হ'ল স্ট্রনশিয়াম – 90 এবং সিজিয়াম – 137, যাদের মোট তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ যথাক্রমে 20 মেগাক্যুরী এবং 30 মেগাক্যুরী। ক্যুরী (curie) তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের একক। যদি কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থে প্রতি সেকেণ্ডে $3 \cdot 7 \times 10^{10}$ সংখ্যক পরমাণুর ভাঙন ঘটে তবে ঐ পরিমাণ ঐ বিশেষ পদার্থের তেজস্ক্রিয়তাকে বলা হবে এক ক্যুরী এবং এক মেগাক্যুরী বলতে বোঝায় দশলক্ষ ক্যুরী তেজস্ক্রিয়তা।

পৃথিবীর আবহাওয়ার পক্ষে বা আমাদের জীবনধারণের পক্ষে তেজস্ক্রিয়তার এই মাত্রা কতটা ক্ষতিকর হয়েছে তা এখনই সঠিক-ভাবে বলা কঠিন; তবে ভবিষ্যতের পৃথিবীকে তেজস্ক্রিয়তার মারাত্মক কুফল থেকে রক্ষা করার জন্য শুধু পারমাণবিক বিস্ফোরণই নয়, সমস্ত রকম পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পর্কেই আমাদের সচেতন হওয়ার সময় এসেছে।

পরিবেশে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ার উপায় মূলতঃ দু'টি। প্রথমতঃ পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে এবং দ্বিতীয়তঃ পরমাণু-চুল্লী বা রি-এ্যাক্টরগুলি থেকে। সারা পৃথিবীব্যাপী শক্তি সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে, শক্তি উৎপাদনের কাজে পরমাণু চুল্লীর ব্যবহার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমস্যা হ'ল পরমাণু চুল্লীতে ইউরেনিয়াম – 235 বা বিভাজনক্ষম (Fissionable) ধাতুর পরমাণু কেন্দ্রীন বিভাজনের পর যে সমস্ত অবশেষ থাকে তাকে নিরাপদে সংরক্ষণ ক'রে রাখা ক্রমেই সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পরমাণু চুল্লীর এই সমস্ত ছাইকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিরোধক পাত্রে ভ'রে বেশ কয়েকশো বছর রেখে দিলে হয়ত কাজ হ'তে পারে। এটা একটা উপায়। এমনি আরো অনেক উপায়ের কথাই চিন্তা করা হচ্ছে। উপায়ও শেষ পর্যন্ত একটা কিছু হয়ত পাওয়া যাবে। কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে সমস্যাটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। সে ক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম-235 বা প্লুটোনিয়াম-239 এর চকিত কেন্দ্রীন বিভাজনে মুক্ত হয় বিপুল পরিমাণ শক্তি যা তেজস্ক্রিয় অবশেষকে মুহূর্তেই ছড়িয়ে দেয় আবহমণ্ডলে। তথাকথিত হাইড্রোজেন বোমার ক্ষেত্রে এই ধরনের একটি পারমাণবিক বোমাকে তাপকেন্দ্রীন সংযোজক প্রক্রিয়ার পলতে বা ট্রিগার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত বোমার শক্তিকে সাধারণতঃ কিলোটন বা মেগাটনের এককে প্রকাশ করা হয়। যার অর্থ হ'ল ঐ বিস্ফোরণের সমতুল বিস্ফোরণের জন্য এক কিলোটন (এক হাজার টন) বা এক মেগাটন (দশলক্ষ টন) টি. এন. টির প্রয়োজন হবে। প্রথমতঃ, এক একটি তাপকেন্দ্রীন বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা কয়েকশো মেগাটন পর্যন্ত হতে পারে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ দু'ভাবে তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করে— বিভাজন-অবশেষ বা ফিশন প্রডাক্ট থেকে এবং এ্যাক্টিভেশন বা প্রভাবিত ক'রে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ বা ফিশনের মূল ব্যাপারটা হ'ল ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের মত কোনো ভারী মৌলের পরমাণুকেন্দ্রের দু'টি অপেক্ষাকৃত হালকা কেন্দ্রকে বিভাজন। সাধারণভাবে কিন্তু এই সমস্ত হালকা কেন্দ্রকগুলিই

অস্থায়ী এবং বিটা ও গামা বিকিরণের দ্বারা এগুলি অবশেষে এক একটা স্থায়ী কেন্দ্রকে পরিণত হয়। তেজস্ক্রিয়তার অন্য উৎসটি হ'ল, কেন্দ্রীন বিভাজন প্রক্রিয়ায় মুক্ত নিউট্রনের দ্বারা প্রভাবিত তেজস্ক্রিয়তা। অর্থাৎ কেন্দ্রীন বিভাজন শুরু হ'লে প্রতিটি কেন্দ্রের বিভাজনই মুক্তি দেয় দুই বা ততোধিক নিউট্রন। ফলতঃ বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র নিউট্রন কণিকার স্রোত পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহকে আঘাত করে এবং তাদের কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় আরো তেজস্ক্রিয় পরমাণুকেন্দ্র। হাইড্রোজেন বোমা অর্থাৎ তাপকেন্দ্রীন সংযোজন প্রক্রিয়া বিভাজন অবশেষ সৃষ্টি করে না কিন্তু দ্রুতগতি নিউট্রন কণিকার স্রোত সৃষ্টি করে যা যেকে তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি হতে পারে সাধারণ বস্তুতেই।

ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের একটিমাত্র পরমাণুর বিভাজন থেকেই মুহূর্তে উৎপন্ন হয় কুড়ি কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি এবং এক কিলোটন টি.এন.টি ক্ষমতার একটি বিস্ফোরণ ঘটাতে 50 গ্রাম সক্রিয় পদার্থই যথেষ্ট। এত সংক্ষিপ্ত সময়ে এই বিপুল শক্তির উন্মোচন স্বভাবতঃই প্রবল বিস্ফোরণের রূপ নেয় এবং তাপমাত্রা পৌঁছে যায় দশ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। বোমা এবং তার আশেপাশের বস্তুসমূহ সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পে রূপান্তরিত হয় এবং একটি অগ্নিগোলকের চেহারা নেয়। বিস্ফোরণের পরেই এটি দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং উঠে যায় আবহমণ্ডলের উচ্চতর স্তরে। কতটা ওপরে এটি উঠবে, সেটা অবশ্য নির্ভর করে বিস্ফোরণের শক্তির ওপর এবং সাধারণ ভাবে একটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ থেকে উদ্ভূত অগ্নিগোলক ট্রপোস্ফিয়ারে গিয়ে মেঘের মত স্থিতিশীল অবস্থায় আসে, কিন্তু তাপকেন্দ্রীন বিস্ফোরণজাত অগ্নিগোলক স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে প্রায় দশ মাইল উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

গোলকটি যত তার তাপশক্তি হারাতে থাকে, বাষ্পীভূত মাটি, বালি, ধাতু ইত্যাদি ততই দানা বাঁধতে থাকে। অতি সূক্ষ্ম দানাগুলি বায়ুতাড়িত হয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং অপেক্ষাকৃত বড় টুকরোগুলি ছড়িয়ে পড়ে কাছাকাছি এলাকায়।

বিস্ফোরণ যদি ভূ পৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে হয়, তাহ'লে কেবলমাত্র পারমাণবিক অস্ত্র ও তার তেজস্ক্রিয় অবশেষই বাষ্পীভূত হয় এবং সেক্ষেত্রে অগ্নিগোলকটি ক্রমশ শীতল হয়ে এলে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি সূক্ষ্ম মেঘের আকারে ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে। কিন্তু এক্ষেত্রেও পারমাণবিক শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত বহু সংখ্যক দ্রুতগতি নিউট্রন কণার স্রোত বায়ুমণ্ডলের পরমাণু বা ভূ-পৃষ্ঠেরও কিছু কিছু পরমাণুকে সরাসরি আঘাত ক'রে তাদের তেজস্ক্রিয় ক'রে তোলে।

সাধারণতঃ ভূ-পৃষ্ঠ বা তার কাছাকাছি কোনো পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হলে অগ্নিগোলকের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত নিরপেক্ষ পদার্থের বাষ্প যখন জমাট বাঁধে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু তেজস্ক্রিয় পরমাণুও গ্রথিত হয় এবং নিজস্ব ভারে অপেক্ষাকৃত বড় টুকরোগুলি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে; কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বেশ কিছু ওপরে উচ্চতর বায়ুস্তরে যখন কোনো একটি তাপকেন্দ্রীন বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তখন তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি এত সূক্ষ্ম আকার ধারণ করে যে, তার ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসতে কয়েক মাস, এমন কি কয়েক বছরও সময় লাগতে পারে।

সুতরাং এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, বায়ুমণ্ডলে এত দীর্ঘ সময় ভাসমান থাকার ফলে তাপকেন্দ্রীন বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয় অবশেষ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সাধারণ পরমাণু বোমা বা কেন্দ্রীন বিভাজন প্রক্রিয়ার শক্তি অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় তার তেজস্ক্রিয় অবশেষ এত ব্যাপক এলাকাকে এত বেশী প্রভাবিত করেনা। তবে ফিশন প্রক্রিয়ায় অন্তত 60টি বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের সৃষ্টি হয় এবং এছাড়া নিউট্রন কণার সঙ্গে সংঘাতে অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী বহু তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত সমস্থানিক তিন চারটি পর্যায়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ করতে করতে অবশেষে কোনো মৌলের স্থায়ী সমস্থানিকে রূপান্তরিত হয় এবং এদের অর্ধ-জীবনকাল (Half life) এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ থেকে একশো বছর পর্যন্ত হতে পারে। সামগ্রিকভাবে বিটা ও গামা বিকিরণের হার নির্ভর করে তাৎক্ষণিক তেজস্ক্রিয়তার $-1{\cdot}2$ ঘাতের উপর। সুতরাং গোড়ার দিকে বিকিরণ তীব্রতা অনেক বেশী থাকে, কিন্তু স্বল্পায়ু তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকসমূহের তেজস্ক্রিয়তা নিঃশেষ হয়ে এলে এই তীব্রতা হ্রাস পায়।

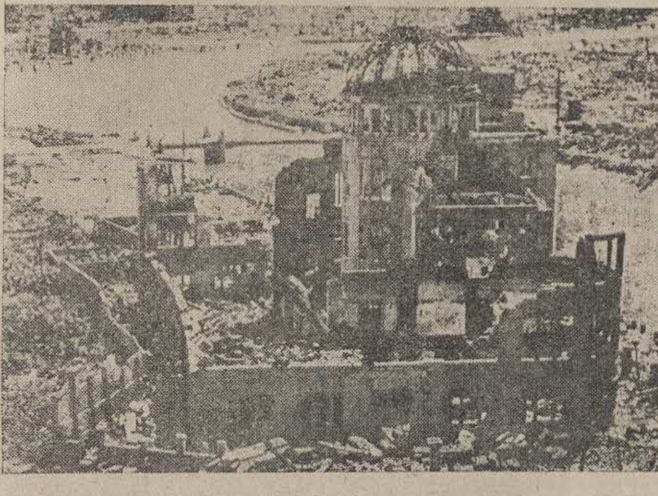
বিস্ফোরণের কাছাকাছি অঞ্চলে বিকিরণ জনিত বিপর্যয়ের মূল হল গামা রশ্মি, যা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে এবং পরে তেজস্ক্রিয় ভস্ম থেকে ছাড়া পায়। এই তীব্র বিকিরণ থেকে কোনো আবরণের সাহায্যে আত্মরক্ষা করা প্রায় অসম্ভব, কারণ বিস্ফোরণের প্রবল ঘাত যে আবরণ সহ্য করতে পারবে, তা অনায়াসেই গামা রশ্মিকে রুখতে পারবে। কিন্তু এই ঘাত সহ্য করার মত আবরণ তৈরী করাটাই আরো বড় সমস্যা। অবশ্য সমস্যা সৃষ্টির জন্যই তো পরমাণু বোমা।

প্রসঙ্গতঃ, একটা মজার ব্যাপার হ'ল, এই পরমাণু অস্ত্রেরও আবার দু'টি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে, পরিষ্কার (Clean) এবং নোংরা (Dirty) অস্ত্র! পরিষ্কার অস্ত্র হ'ল সেই সমস্ত অস্ত্র যার তেজস্ক্রিয় অবশেষ ও বিস্ফোরণ জনিত ঘাতের অনুপাত অপেক্ষাকৃত কম। আর ঠিক এর উল্টোটা হলে তাকে বলা হয় নোংরা অস্ত্র। কখন কোন্ ধরণের অস্ত্র বেছে নেওয়া হবে, সেটা নির্ভর করে যুদ্ধের পরিস্থিতির উপর। তবে বোঝা যায় জঙ্গীদের কাছে পরিষ্কারের চাইতে নোংরা অস্ত্রের কদরই বেশী, কেননা অস্ত্রকে আরো নোংরা ক'রে তোলার জন্য গবেষণার তো অন্ত নেই। পরমাণু বা হাইড্রোজেন বোমাকে কোবাল্টের আবরণ দিয়ে মুড়ে দিলে কোবাল্টের তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক ছড়িয়ে পড়ে বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে এবং পরিবেশ আর জীবনের পক্ষেও তার প্রভাব আরো বেশী ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। সেটা একটা মস্ত বড় লাভ তো নিশ্চয়ই!

যখন তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি পৃথিবীতে এসে জমা হয়, তারপর তার পরিণতি বা তার থেকে প্রাণীকূলের ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা অনেকটাই নির্ভর করে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় উপাদানের রাসায়নিক ধর্মের ওপর। যেমন ধরা যাক, উদ্ভিদ মাটি থেকে গ্রহণ ক'রে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম এবং আরো ষোলটি অনুখাদ্য। এই সমস্ত উপাদানের তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক মাটি থেকে শোষণ করে গাছ। গাছ ভক্ষণ করে তৃণভোজী প্রাণী, তৃণভোজীদের খায় মাংসাসীরা। এই ভাবে তেজস্ক্রিয়তা সংক্রমিত হয় জীবদেহে।

বিভিন্ন দিক বিবেচনা ক'রে যা দেখা গেছে, এই সমস্ত

আণবিক বোমার বিভৎসতা



অ্যাটম বোমা বর্ষণের পরে হিরোসিমা—সেপ্টেম্বর 1945। ফটো ঃ ইচি মাৎসুমোটো।



সেনজি ইয়ামাগুচি—হিরোসিমায় 6ই অগষ্ট আহত হন। পরে কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। জনমতের চাপে, অ্যাটম বোমার ভয়াবহতা'র সাক্ষ্য হিসাবে তাঁকে বেঁচে থাকতে বাধ্য করেছে। ফটো ঃ সাকী মুরাসাতো।



৯ই অগষ্ট—নাগাসাকি শহরে বোমা বর্ষণের পরে—
ফটো ঃ ওসুকে ইয়ামাহাতা।



মা ও শিশু—নাগাসাকি বোমায় উভয়েই আহত : উভয়েই মারা যাবে। তবু মা সন্তানকে বুকের দুধ দিচ্ছেন, সন্তানকে বাঁচাবার জন্য—
ফটো ঃ ওসুকে ইয়ামাহাতা।

[ফটোগুলি ডাঃ মনীশ প্রধানের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

তেজস্ক্রিয় উপাদানের মধ্যে সব চাইতে বিপজ্জনক হল তিনটি সমস্থানিক—স্ট্রনশিয়াম-90, সিজিয়াম-137 এবং আইওডিন-131. স্ট্রনশিয়াম-90 বিটা কণা বিকিরক এবং ক্যালসিয়ামের সঙ্গে শরীরের হাড়ে বাসা বাঁধে। বিকিরণ বেশী হলে এর ফলে হাড়ে ক্যান্সার বা লিউকোমিয়া হতে পারে। সিজিয়াম-137 দেহের নরম টিস্যুসমূহে ছড়িয়ে যায় এবং এর ফলে হয়ত বংশ-গতির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। আইওডিন-131, অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ঘাস বা গাছের পাতার মধ্যে থেকে এরা প্রবেশ করে গবাদি পশুর শরীরে এবং সেখান থেকে দুধের মাধ্যমে মানুষের দেহে। থাইরয়েড গ্রন্থি এই উপাদানকে সহজেই গ্রহণ করে এবং বিশেষতঃ শিশুরা, যারা বড়দের চাইতে বেশী দুধ খায়, তাদের ছোট্ট থাইরয়েড গ্রন্থিই আইওডিন-131 এর দ্বারা আক্রান্ত হয় বেশী—যার পরিণতি প্রায়শই…

পরিণতি কি, তা আমাদেরও জানা। কিন্তু এর থেকে পরিত্রাণের উপায় আমাদের জানা নেই। সম্ভবতঃ, একমাত্র মানুষের শুভবুদ্ধি এবং বর্তমান মনোভাবের আমূল পরিবর্তনই সৃষ্টি করতে পারে পরিত্রাণের পথ। কোনো নির্বোধ প্রাণী যখন সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশতঃ নিজের বিনাশ সাধন করে, পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, ঈস্ট শরীর থেকে এনজাইম ছড়িয়ে চিনি থেকে উৎপন্ন কোহলের মাত্রা বাড়িয়ে নিজের ধ্বংসের কারণ ঘটায়, সেটা অন্ততঃ অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু প্রাণী জগতের সবচাইতে রহস্যজনক ব্যাপার বোধ হয় এটাই যে, একটি প্রাণী মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির শীর্ষে আরোহণ ক'রেও তার বাঁচার পরিবেশকে ক্রমশঃ আরো বেশী ক'রে প্রতিকূল করে তুলছে। এটা যদি জীব-জগতেরই একটা অমোঘ নিয়ম হত, তবে তাকে অতিক্রম করার কথা আমরাও চিন্তা করতে পারতাম না; কিন্তু তা তো নয়। কাজেই মানুষের যে বৈজ্ঞানিক বৃত্তি এই সমস্যা সৃষ্টি করেছে, সেই বৃত্তিই এর সমাধানের পথও নির্দেশ করবে, এমন আশা আমরা অবশ্যই করতে পারি।

খাদ্যে দূষিত পদার্থের বিষক্রিয়া
(Toxic Contamination of Foods)

রামনারায়ণ চক্রবর্তী

জীবন ধারণের জন্য নিত্য খাদ্যের প্রয়োজন। সেই কারণে খাদ্যে কোনও বিষাক্ত দ্রব্য মিশে যাওয়ার ফল অতীব বিপজ্জনক হতে পারে। সভ্যতার ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের খাদ্যেরও প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। আগেকার দিনে মানুষ বন্যজন্তুদের মত মাঠঘাট, বনবাদাড় থেকে সোজাসুজি খাদ্য সংগ্রহ করে খেত। তখনকার দিনে রান্নার প্রচলন ছিল না অথবা খাদ্য গুদামজাত করার প্রয়োজন হত না। বর্তমানকালে অধিকাংশ লোক চাষ আবাদের মাঠ ও বনবাদাড় থেকে দূরে বাস করে, তাই বর্তমানে খাদ্য বহু দূর থেকে নিয়ে আসার ও ঐ খাদ্য গুদামে জমা করার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ প্রকৃতিতে সাধারণত যে খাদ্য জন্মায় তা বহু লোকের হাতে ঘোরার পর মানুষের ক্ষুধা নিবারণের কাজে লাগে। এই খাদ্য জোগাড়, পরিবহন, বিলিব্যবস্থা ইত্যাদির বিভিন্ন স্তরে যারা কাজ করে তাদের সকলেরই অন্তরের ইচ্ছা কি করে, কত সহজে, কত অল্প খেটে, কত কম খরচে কত বেশী আয় করা যায়। এই সর্বব্যাপী ইচ্ছার কিছুটা ছাপ খাদ্যের ওপরও গিয়ে পড়ছে।

এছাড়া খাদ্যাখাদ্য ও দূষিত পদার্থের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের দেশের সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব আছে আর কুখাদ্যের অঘটনগুলি প্রধানত এই কারণেই হয়ে থাকে। দুধে জল মেশান আইনত অন্যায় কিন্তু এর জন্য স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা তেমন নেই। স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা তখনই হয় যখন দুধে নোংরা জল মেশান হয়। অল্পজ্ঞানী লোকের সামান্য কারণে 'ভেজাল' 'ভেজাল' চীৎকার অনেক সময়ে জনসাধারণকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে, যার ফলে আসল ভয়ের কারণগুলির দিকে নজর পড়ে না।

সহজ জ্ঞান

প্রাচীন কালে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে মানুষের যে সহজ জ্ঞান (instinct) ছিল বর্তমানে তার বিশেষ চিহ্ন দেখা যায় না। এধরনের জ্ঞান বন্য জন্তুদের মধ্যে আজও যথেষ্ট দেখা যায় যদিও গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে এ জ্ঞান অনেক কম। গাছের পাতায় অনেক সময়ে সায়েনোজেনেটিক গ্লাইকোসাইড (cyanogenetic glycoside) থাকে। এ ধরণের গ্লাইকোসাইড পরিপাকের সময়ে ভেঙ্গে গিয়ে অতি বিষাক্ত হাইড্রোসায়ানিক এসিড (hydrocyanic acid) হয়। তৃণভোজী বন্যজন্তুদের এবিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়। মনে হয় এই সহজ জ্ঞানের অভাবের জন্য গৃহপালিত গরু অনেক সময়ে কাঁচ কাঁচ জোয়ার গাছ (*Sorghum vulgare*) খেয়ে মারা যায় যদিও ফসলের পর বড় বড় জোয়ার গাছগুলি গরুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে অসুবিধা হয় না।



ইউক্যালিপটাস শাখায় কোয়ালা জননী ও শিশু

এদিক দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার কোয়ালা (Koala) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোয়ালা দেখতে বেশ সুন্দর, খুব ছোট লোমশ ভালুকের মত—অনেকটা যেন ছোটদের খেলার পুতুল টেডি বিয়ার (Teddy bear) এর মত। এরা তৃণভোজী—অস্ট্রেলিয়ায় বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছে এদের দেখা যায়। ঐ গাছের পাতা এদের প্রধান খাদ্য। এরা গাছের ডালে বসে বিষাক্ত পাতাগুলি বেছে বেছে বাদ দিয়ে তবে খায়। মনে হয় খাদ্য সম্বন্ধে এ ধরনের বাদ বিচারের জন্য অন্যান্য দেশের চিড়িয়াখানায় এদের বাঁচিয়ে রাখা বেশ শক্ত।

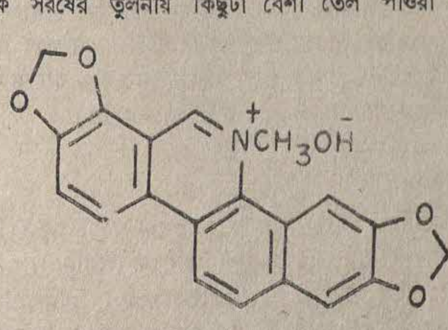
ধাতুর পাত্র

পিতল বা তামার পাত্র রান্নার কাজে ব্যবহৃত হলে সময়ে সময়ে খাদ্যে তাম্রজনিত বিষক্রিয়া দেখা যায় যার ফলে সাংঘাতিক ভেদবমির মত অবস্থা হয়। তামার পাত্রে অম্বল বা টকজাতীয় তরকারি রান্না করলে অথবা সবুজ কলঙ্কযুক্ত অপরিষ্কার তামার পাত্রে খাদ্য রাখলে এই বিষক্রিয়া দেখা যায়। পুরাতন ঘি ও তেলে তৈলজাত এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ঐ এসিড তামার সঙ্গে বিষাক্ত সল্ট (salt) হয়। অনেক সময়ে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে পোলাও প্রভৃতি খাওয়ার পর বহুলোক একসঙ্গে এই কারণে বিশেষভাবে ভুগেছে—এমনকি কিছু কিছু প্রাণহানিও ঘটেছে। রান্নার জন্য তামার পাত্র টিনের কলাইযুক্ত (tin plated) থাকে, কিন্তু বাসন মাজার সময়ে ঐ কলাই অল্প অল্প করে উঠে যায় যার ফলে খাদ্যে তাম্রবিষের আশঙ্কা দেখা দেয়। আজকাল অবশ্য আমাদের রান্নার বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটছে এবং এ ধরনের পাত্রের বদলে আমরা বর্তমানে প্রধানত এলুমিনিয়াম ও ষ্টেনলেস ষ্টীলের (stainless steel) পাত্র রান্নার কাজে ব্যবহার করছি।

এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে পুরাতন সবকিছুই খারাপ আর নতুন সবকিছুই ভাল তা ঠিক নয়। যেমন ধরা যাক লোহার বাসনের কথা। নানাকারণে এদের ব্যবহার ক্রমশ কমে যাচ্ছে অথচ লোহার কড়াই এ রান্না চড়চড়ি ইত্যাদিতে রিডিয়ুস্‌ড বা ফেরাস লোহার (reduced or ferrous iron) পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যা ছোটদের ও স্ত্রীলোকদের এনিমিয়া জাতীয় (anaemia) রক্তাল্পতা থেকে রক্ষা করে। আগেকার দিনে ছোটরা ও স্ত্রীলোকরা লোহার কড়ার চড়চড়ির চাঁচি খেতে ভালবাসত। মনে হয় এর সঙ্গে এদের শরীরের প্রয়োজনজনিত সহজ জ্ঞানের (instinct) সম্বন্ধ আছে।

এপিডেমিক ড্রপ্‌সি ও আর্জিমোন

শিয়ালকাঁটা বা আর্জিমোনের (*Argemone mexidana*) বীজ দেখতে অনেকটা কাল সরষের মত। এই বীজ সহজেই কাল সরষের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া যায়। তাছাড়া এই বীজ থেকে সরষের তুলনায় কিছুটা বেশী তেল পাওয়া যায়।



Sanguinarine

শিয়ালকাঁটার বীজে বিষাক্ত স্যানগুইনারিন অবক্ষার (sanguinarine alkaloid) পাওয়া যায় তাই এই দুই বীজের মিশ্রিত ভেজাল সরষের তেল থেকে বছরের পর বছর বহুলোক এপিডেমিক ড্রপ্‌সি (epidemic dropsy) নামে বেরিবেরির মত একপ্রকার রোগ থেকে ভুগেছে। এই রোগে প্রথম অবস্থায় পা কিছুটা রক্তাভ হয় ও ফুলে ওঠে ও ক্রমশ হৃদরোগ ও গ্লোকুমা (glaucoma) হয়। এভাবে আমাদের দেশে বহুলোক অন্ধ হয়েছে ও অকালে মারা গিয়েছে। এই রোগ 5/7 বছর অন্তর মহামারীর আকার ধারণ করত। 1878 খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-এ এই রোগ প্রথম দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে এভাবে বহু লোক ভুগেছে। 1950 খৃষ্টাব্দের পর এ ধরনের বিষক্রিয়া অনেক কমে গেছে। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে দেখা গেলেই তৎক্ষণাৎ যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি আরও দৃঢ় করা হয় যার ফলে এ ধরনের ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ হয়। 1966-67 খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-এ পুনরায় এই রোগ দেখা যায়। এক্ষেত্রে তেল ও বনস্পতি (hydrogenated oil) উভয়ের মধ্যেই ঐ বিষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। দক্ষিণ ভারতেও এর আগে লোকেরা জিঞ্জেলি বা তিলের তেল থেকে আর্জিমোনের বিষক্রিয়ায় ভোগে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে 1950 খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় আর্জিমোন দূষিত (argemone contaminated) ময়দা ব্যবহার করে কিছু লোক এভাবে কষ্ট পেয়েছে।

তেল বা অন্য কোনও খাদ্যদ্রব্যে আর্জিমোনের বিষ আছে কিনা তা পরীক্ষা করবার বিশেষ নির্ভরযোগ্য উপায় আছে। খাদ্য পরীক্ষাগারে এ ধরনের পরীক্ষার ভালই ব্যবস্থা আছে তাই এই ধরনের বিষক্রিয়া বর্তমানে অনেক কমে গেছে—কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে বলে যেন মনে করা না হয়। এই



আর্জিমোন—জানুয়ারী মাসে

রোগের আশঙ্কা এখনও বিদ্যমান, কেননা এখনও শিয়ালকাঁটার গাছগুলি চারিদিকেই দেখা যায়। যদি কেহ মনে করেন যে সরষে ও শেয়ালকাঁটা একই সঙ্গে হয় বলে এদের বীজ মিশে যায়, তাহলে তাঁরা যেন জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে সরষে

ক্ষেতে গিয়ে দেখেন। ঐ সময়ে সরষের ফসল হয়, কিন্তু শেয়ালকাঁটার ফসল হতে আরও মাস দুয়েক সময় লাগে।

একটা বিষয়ে আমি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দেশে আর্জিমোন-দূষিত তেলের যথাযথ পরীক্ষার সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত না এপিডেমিক ড্রপ্‌সির পুনর্প্রাদুর্ভাব ডাক্তারি বিবৃতিতে প্রকাশ পায় ও এ বিষয়ে বেশ কিছুটা হৈ চৈ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেন কিছুটা ঝিমিয়ে থাকি। তা না হলে রোগের প্রাদুর্ভাবের আগেই দূষিত তেলের চালান ধরা যেত ও ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যেত। এদিক থেকে একথাও ভাববার বিষয় যে যতদিনে রোগীর মাধ্যমে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ধরা পড়ে ততদিনে আরও অনেকেই ঐ একই তেল ব্যবহার করে রোগগ্রস্ত হয় আর ততদিনে বাজারে ঐ দূষিত তেলও নিঃশেষ হয়ে যায়। অবশ্য যদি কোনরকমে রোগীর বাড়ী থেকে দূষিত তেলের কয়েক ফোঁটা পাওয়া যায় তাহলেও যথাযথ পরীক্ষা করে ঐ তেলে আর্জিমোনজনিত দোষ আছে কিনা প্রমাণ করা সম্ভব।

অন্যদিকে আর একটা অসুবিধার কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। অসংখ্য ছোট ছোট কলে যথেষ্ট তেল নিংড়ান হয়, যাকে আমরা চলতি ভাষায় ঘানির তেল বলে থাকি। এদের পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে সংযত (control) করা শক্ত, বিশেষত যদি সাপ্তাহিক হাট থেকে ঘানির তেল কিনে এনে ব্যবহার করে কোথাও এই রোগ দেখা দেয়। মনে হয় শিয়ালকাঁটার গাছ সমূলে উপড়ে, পুড়িয়ে দেশ থেকে উজাড় করে দিতে না পারলে মাঝে মাঝে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের ভয় থেকেই যাবে। 1926 খৃষ্টাব্দে মালদহের আত্তার গ্রামে শিয়ালকাঁটার তেল মিশ্রিত সরষের তেল ব্যবহার করে এপিডেমিক ড্রপ্‌সি রোগ হতে দেখা যায়। ঐ সময়ে যথাযথ খোঁজখবর নিয়ে দেখা যায় যে কলু ওষুধের জন্য কাটাকার তেল কিছুটা শিয়ালকাঁটার বীজ নিংড়ে করে ও তারপর ঐ ঘানিতে সরষের তেল করে ও সেই তেল থেকেই এই রোগের উৎপত্তি। এই সময়েই প্রথম ঠিকভাবে বোঝা যায় যে এ ধরনের মিশ্রিত তেল ব্যবহার করলে ঐ রকম কিছুটা বেরিবেরির মত এপিডেমিক ড্রপ্‌সি রোগ হয়।

প্রায়ই একটা কথা শুনা যায় এই যে বৈজ্ঞানিকেরা হাতির দাঁতের কারুকার্যশোভিত প্রকোষ্ঠে ("ivory tower") বাস করেন, কেননা তাঁদের গবেষণার ফল জনসাধারণের কাজে লাগে না। কিন্তু যাঁরা প্রাণভরে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য খেটে গবেষণা করেন ও আজীবন ঐভাবে গবেষণাগারে কাটান তাঁদের বিশেষ দুঃখের, অভিমানের এমনকি সময়ে সময়ে নৈরাশ্যের (frustration) কারণও এই যে দেশ এদিকে যেন সব ব্যাপারেই 'বোসন' 'রমন' গবেষকদের নিয়েই ব্যস্ত। এটা বেশ স্পষ্টই বলা যায় যে এপিডেমিক ড্রপ্‌সি, শিয়ালকাঁটার তেলের বিষক্রিয়া ও এ-ধরনের ভেজাল তেলের পরীক্ষার বিষয়ে দেশে যথেষ্ট উচ্চাঙ্গের প্রকৃত জনহিতকর কাজ হয়েছে যদিও দেশের এ বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি প্রকাশ পায় নি।

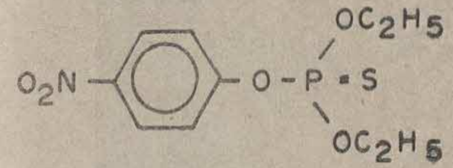


আর্জিমোন—মে-জুন মাসে

ফলিডল

বৈজ্ঞানিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যে নতুন নতুন বিষের আবির্ভাব হচ্ছে। এদের মধ্যে ফলিডল (folidol) ও ট্রাই-অর্থোক্রেসাইল ফসফেট (triorthocresyl phosphate) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাট প্রভৃতি চাষের কাজে ফলিডল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই বিষ খাদ্যের সঙ্গে মিশে অনেক সময় প্রাণহানির কারণ হয়েছে। পেলেগ্রার (pellagra) মত একপ্রকার রোগের বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য লেখক একসময়ে নদীয়ার কয়েকটি গ্রাম ঘুরেছেন। ওখানে চাষীদের ফলিডল ব্যবহার করার পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছু প্রশ্ন করেন।

ফলিডল ব্যবহারের পর খালি পাত্রগুলি সম্বন্ধে তারা বলে যে তারা সকলেই ওগুলি নির্দেশমত ফেলে দেয়, কিন্তু ঐ সময়ে দেখা গেল একটা ছোট ছেলের হাতে একটা চকচকে এলুমিনিয়ামের খালি ফলিডলের ছোট বোতল। গরীব চাষীদের

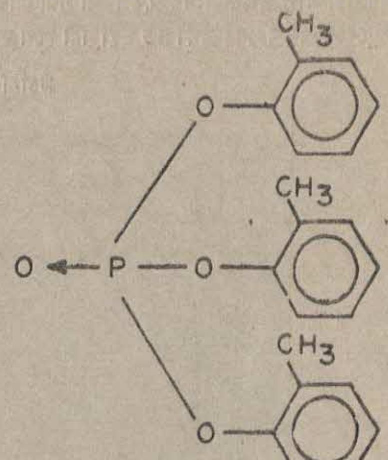


Folidol (Parathion)

পক্ষে ঐ ধরনের দ্রব্যের মায়া ত্যাগ করা বেশ শক্ত অথচ কিভাবে ঐ এলুমিনিয়ামের বোতল বিষমুক্ত হয় সে সম্বন্ধেও তাদের বিশেষ জ্ঞান নেই। এইসব কারণেও সময়ে সময়ে অঘটন ঘটে।

ট্রাইক্রেসাইল ফসফেট বা টিওসিপি

ট্রাইক্রেসাইল ফসফেট দূষিত খাদ্য, পানীয় ও ঔষধ ব্যবহার করে এ পর্যন্ত পৃথিবীর বহুদেশে একপ্রকার পক্ষাঘাতের (Paralysis) মত রোগে বহু লোক ভুগেছে। চালানী ট্রাইক্রেসাইল ফসফেটে থাকে ট্রাই অর্থোক্রেসাইল ফসফেট বা টিওসিপি (tri-ortho-cresyl phosphate বা TOCP), ট্রাই মেটা ক্রেসাইল ফসফেট (tri-meta-cresyl phosphate)



Tri-*ortho*-cresyl phosphate

ও ট্রাই প্যারাক্রেসাইল ফসফেট (tri-para-cresyl phosphate)। এদের মধ্যে টিওসিপির বিষক্রিয়া সব থেকে বেশী। এটা অনেকটা রেড়ির তেলের মত গাঢ় তরল পদার্থ, জলে মেশে না কিন্তু তেলের সঙ্গে সহজে মিশে যায়। এর ব্যবহার সাধারণত প্লাস্টিকের কারখানায়। কিছু কিছু জ্বালানী তেল ও মেসিনের তেলেও এর ব্যবহারের প্রচলন আছে। এর ট্রাইটলাইল ফসফেট (tritolyl phosphate), লিণ্ডল (lindol),

টিওসিপি বিষে একই মোরগ



প্রথম অবস্থা খাবার 13 দিন পরে—থমথমে ভাব

সেলুফেক্স (celluflex), ক্রোনিটেক্স (kronitex), পি এক্স 917 (PX-917) নামগুলিরও প্রচলন আছে।

এর খালি ড্রামগুলি পরিষ্কার করা শক্ত, কেন না গাঢ় বলে বেশ কিছুটা লেগে থাকে ও জল দিয়ে ধুয়ে ড্রাম পরিষ্কার করা যায় না। এধরনের খালি ড্রামে রান্নার তেল বা সুরা জাতীয় পানীয় রেখে বহুদেশে এই ধরনের পক্ষাঘাত মহামারী রূপে হতে হয়েছে, তবে পক্ষাঘাতে বেশ কিছুলোক পাঁচ ছয় বছর ভুগেছে।

এই বিষের সব থেকে অসুবিধা এই যে যখন এই বিষ খাওয়া যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তখন কিছুই বোঝা যায় না। মাত্রা বেশী হলে খাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বমি ও উদরাময়ের মত হয়। কিন্তু মাত্রা কিছুটা কম থাকলে প্রথমে এ ধরনের কিছুই

টিওসিপি বিষে একই মোরগ



দ্বিতীয় অবস্থা 20 দিনে—হাঁটু গেড়ে



তৃতীয় অবস্থা 30 দিনে—ধরাশায়ী কিন্তু জীবিত

দেখা গেছে। এছাড়া একসময়ে এপিয়ল (apiol) নামে একটি গর্ভস্রাবকারী (abortifacient) ঔষধ ব্যবহার করে কিছু স্ত্রীলোক ভুগেছে। পশ্চিমবঙ্গের মালদহে ও আসামের দারাং এ আমদানীকৃত দূষিত ময়দা ব্যবহার করে এই রোগ হয়। এধরনের ঘটনাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব 1নং তালিকায় (table 1) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই বিষক্রিয়ায় মৃত্যু খুবই কম হয় না ও মনে কোনও সন্দেহ থাকে না যে শরীরে কোন মারাত্মক বিষ প্রবেশ করেছে। পক্ষাঘাত দেখা যায় পাত্রবিশেষে খাবার দুই থেকে চার সপ্তাহ পরে আর ততদিনে অনেকেই বলতে পারে না কি খেয়ে হয়েছে, বিশেষত যারা হাটবাজারে, যেখানে সেখানে রান্না জিনিষ কিনে খায়। এইভাবেই এই রোগ মালদহে ছড়ায়।

1নং তালিকা (Table 1)

ট্রাই অর্থোক্রেসাইল ফসফেটজনিত পক্ষাঘাতের ঘটনাবলির হিসাব

খৃষ্টাব্দ	স্থান	রোগীর সংখ্যা	দূষিত খাদ্য / পানীয় / ঔষধ
1930	আমেরিকা	15,000 (মৃত-10)	জনপ্রিয় সুরা জামাইকা জিঞ্জার বা জেক (Jamaica Ginger or Jake)
1931	হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া	90	এপিয়ল (28-50% টিওসিপি)
1937	ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা	41	সোয়েবিনের তেল (soybean oil)
1937	ডারবানের জাহাজ	27	সোয়েবিনের তেল
1938	মরিসাস	95	সোয়েবিনের তেল
1946	বৃটেন	17	রান্নার তেল
1959	মরক্কো	10,000	রান্নার তেল
1959	বোম্বাই	—	সরষের তেল
1962	মালদহ (পশ্চিমবঙ্গ) ও দারাং (আসাম)	500-600	আমদানীকৃত ময়দা
1968	কাঁকিনাড়া (পশ্চিমবঙ্গ)	25-30	সরষের তেল
1972	দমদম (কলিকাতা)	200	সরষের তেল

1962 খৃষ্টাব্দের এপ্রিল-জুন মাসে বামনগোলা, হাবিবপুর ও গাজোল থানার অন্তর্গত বহু গ্রামে বিশেষত রাজবংশী ও সাঁওতালদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। বাড়ী বাড়ী ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখা যায় যে এদের সকলেই কিছুদিন আগে হাটের, বিশেষত চৈত্র সংক্রান্তির মেলার, ডালপুরি খেয়েছে। প্রথমে কিছু হয়নি, কিন্তু কিছুদিন পরে কোমর থেকে পা পর্যন্ত পক্ষাঘাতে ধরে যায় ও উত্থান শক্তি কমে যায় বা রহিত হয়। দেখা যায় বাড়ীর কর্তা হাট থেকে ডালপুরি কিনে এনে সকলকে খাইয়েছে, ছোট আদুরে ছেলেকে বেশী করে খাইয়েছে, কিন্তু নিজে খায়নি, এর ফলে বাড়ীর সকলের ঐ রোগ হয়েছে, ছোট ছেলের খুবই বেশীরকম পক্ষাঘাত হয়েছে, কিন্তু কর্তার কিছু হয়নি।

টিওসিপি বিষে বিভিন্ন মোরগ



দ্বিতীয় অবস্থা—হাঁটু গেড়ে (Kneeling)

হাবিবপুর থানার রাহুতারা মিশন ও ছোটপুকুরি মিশনের অনাথ আশ্রমে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা যায় মিশনের আমদানীকৃত ময়দায় ট্রাইঅর্থোক্রেসাইল ফসফেট আছে। এখানে দুটি প্রশ্ন ওঠে—(1) হাটের ডালপুরিতে কি করে ঐ দূষিত ময়দা গেল, ও (2) কেন ছেলেমেয়েদের এই রোগ হয় কিন্তু কর্মচারীদের কিছু হয়নি।

মিশনে তিনটি পৃথক পৃথক ব্লক বা বাড়ী ছেলেদের, মেয়েদের ও কর্মচারীদের জন্য। ময়দা আমদানী হয় বস্তায়—প্রতি বস্তায় কতকগুলি মুখ বন্ধ কাগজের ঠোঙাতে ময়দা থাকে, কিন্তু পরিবহনের সময়ে অনেক ঠোঙা ছিঁড়ে যায়। এভাবে দুরকম ময়দা পাওয়া যায়—ঠোঙা ছেঁড়া বস্তার ময়দা ও মুখবন্ধ ঠোঙার ময়দা। মনে হয় ছেলেমেয়েদের খাবার হয় প্রথমোক্ত ময়দা থেকে যাতে এই বিষের অস্তিত্ব দেখা যায় ও



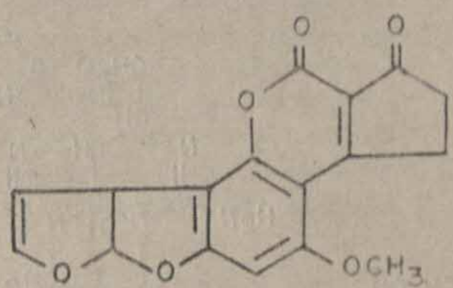
তৃতীয় অবস্থা—ধরাশায়ী কিন্তু জীবিত



তৃতীয় অবস্থা—ধরাশায়ী কিন্তু জীবিত

কর্মচারীদের জন্য মুখবন্ধ ঠোঙার ময়দা ব্যবহৃত হয়। এভাবে মনে হয় কর্মচারীরা এই রোগ থেকে অব্যাহতি পায়। কিছু দিনমজুর নিজেদের বাড়ীতে থেকে মিশনের কাজ করে দেয়—তারাও মনে হয় ঐ বস্তার ময়দা পায়। কথায় কথায় প্রকাশ পায় যে তাদের অনেকেই আটা পছন্দ করে তাই তারা ডালপুরি-ওলার কাছ থেকে ময়দার বদলে আটা নেয় ও এইভাবে হাটের ডালপুরিতে ঐ দূষিত ময়দা এসে যায়।

এর থেকে আরও বোঝা যায় যে ময়দাতে আসলে টিওসিপি ছিল না। কোথাও বস্তাতে ঐ বিষ লেগে যায়, যেমন জাহাজের হোল্ড (hold), ডক বা রেলের ওয়াগন। মনে হয় রেলের ওয়াগনেই বস্তাগুলি দূষিত (contaminated) হয়। হয়ত ঐ ওয়াগনে তার আগে টিওসিপি ড্রাম থেকে কিছু টিওসিপি পড়েছিল। ঐ একই সময়ে একই ময়দা বেশ কিছুটা কলিকাতায়ও অর্ফানেজ (orphanage) প্রভৃতির জন্য এসেছিল কিন্তু এখানে এ ধরনের কোনও পক্ষাঘাতে দেখা যায়নি। অন্যদিকে রাহুতারা মিশনের কয়েকটি খালি বস্তা পরীক্ষা করে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঐ বিষের অস্তিত্ব দেখা যায়। এ বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় যখন প্রথম বিষয়টা বুঝতে পারা যায় তখন সঙ্গে



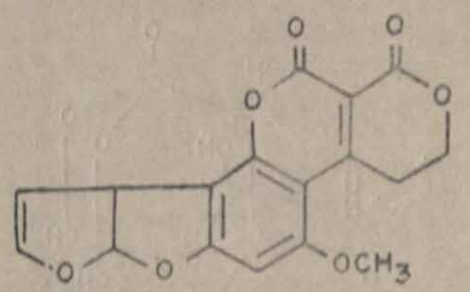
Aflatoxin B_1

সঙ্গে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তরকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয় যার ফলে আসামের দারাং জেলার মিশনের এ ধরনের বিষক্রিয়ার পক্ষাঘাত ধরা পড়ে।

এর পর কাঁকিনাড়া ও দমদমে এই রোগ দেখা যায়। এক্ষেত্রে কিন্তু সরষের তেলের সঙ্গে টিওসিপি মিশে এই রোগ হয়েছিল। এগুলি সবই ঘটেছে অজ্ঞানতার জন্যে। তেলের দোকানীকে শাস্তি দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়, বিশেষত এসব ক্ষেত্রে তাদেরও এই রোগ হতে দেখা যায়। টিওসিপির খালি টিন ও ড্রামগুলোর ঠিকমত ব্যবস্থা করা উচিৎ। এটা দুঃখের বিষয় যে লেখকের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও কিভাবে টিওসিপি আমদানী হয় তা খুঁজে বার করা সম্ভব হয়নি। এ হয়ত কোন গুপ্ত নামে এদেশে আসে। অথচ দেশের জনসাধারণকে এই রোগ থেকে দূরে রাখতে হলে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের এ বিষয়ে যথাযথভাবে জানা বিশেষ প্রয়োজন।

খাদ্যে ছত্রাকজনিত দূষিত পদার্থ

ইউরোপে আরগট ছত্রক বা ক্লাভিসেপ্স পারপুরিয়া (ergot-fungus or *Claviceps purpurea*) দূষিত রাই (যবের মত rye—*Secale cereale* ; রাই সরষে নয়) ব্যবহার করে এর্গটিস্‌ম (ergatism) বা আরগটের বিষক্রিয়ায় বহুলোক এক সময়ে ভুগেছে। আমাদের দেশের বজরা সম্বন্ধে এ বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন। নদীয়ার চাষীদের গ্রামে মাঝে মাঝে পেলেগ্রার (pellagra) মত রোগ দেখা যায়। গোলায় ভিজে ধান থাকলে বা গোলার চালা দিয়ে বৃষ্টির সময়ে ধানে জল পড়লে কিছু ধান খয়েরি বা কাল রং-এর হয়। বলা যায় না এর সঙ্গে এই রোগের কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা। এ বিষয়ে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য গবেষণার প্রয়োজন আছে। ভিজে বা স্যাঁতসেঁতে গুদামে চীনাবাদাম রাখলে এস্পার্জিলাস ফ্লাভাস (*Aspergilus flavas*) ছত্রক হয়ে থাকে। এর আফ্লাটক্সিনগুলি (aflatoxins) যকৃৎ (liver)-এর পক্ষে বিশেষ বিষাক্ত ও এভাবে ক্যান্সার (cancer) বা কর্কটরোগও হতে পারে। কিছু ব্যাঙের ছাতা (mushroom) জাতীয় ছত্রক খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রায় একই রকম দেখতে কিছু বিষাক্ত বেঙের ছাতা আছে যেগুলি খেলে বিষক্রিয়া দেখা দেয়।



Aflatoxin G_1

বিষাক্ত সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি

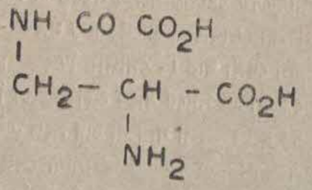
সমুদ্রের ধারে এক রকম পেট ফুলো মাছ (tetrodon or puffer fish) পাওয়া যায় যা ভাল মাছের সঙ্গে মিশে বাজারে আসে। এদের মুখে ফুঁ দিলে এদের পেট বেলুনের মত ফুলে ওঠে। এই মাছে বিষাক্ত টেট্রোডোটক্সিন (tetrodotoxin) থাকে।* এই বিষ এদের যকৃৎ (liver) ও গর্ভাশয় (ovary) থেকে পাওয়া যায়। কিছু লোক চিংড়ি, কাঁকড়া, ডিম প্রভৃতি খেয়ে এলার্জিতে (allergy) ভোগে। যাদের এই অসুবিধা থাকে তাদের দিনে দিনে এলার্জি এতই বেড়ে যায় যে ঠিক সময়ে ঔষধ না পড়লে প্রাণের সংশয় দেখা দেয়। এ ধরনের অবস্থায় ঐ ব্যক্তিবিশেষের সাবধানে থাকা উচিৎ, যদিও তাই বলে ঐ খাদ্যগুলিকে সাধারণের পক্ষে বিষাক্ত বলা যাবে না। কিছু সামুদ্রিক চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতিতে সাক্সিটক্সিন (saxitoxin) থাকে।* এর থেকে এক ধরনের পক্ষাঘাতের বিষক্রিয়া (paralytic shell-fish poisoning) দেখা দেয়।

---

* রাসায়নিক সঙ্কেত পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

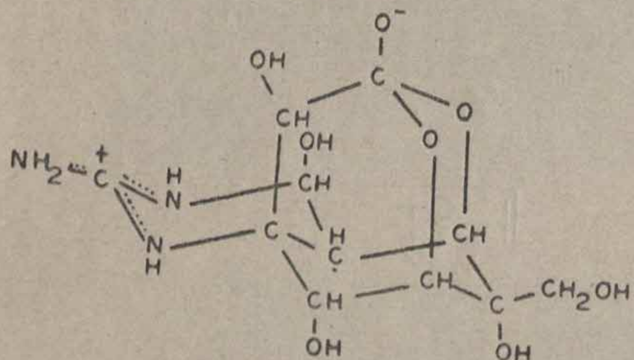
ল্যাথিরিস্‌ম্ (Laathyrism)

খেঁসারি (*Lathyrus sativus*) ও আকৃতা বা আঁকড়ার (*Vicia sativa*) ডালে এল্-আল্ফা-এমাইনো-বিটা-অক্সালিল এমাইনো প্রোপিয়নিক এসিড (L-α-amino-β-oxalylamino propionic acid) কম বেশী থাকে। এই এমাইনো

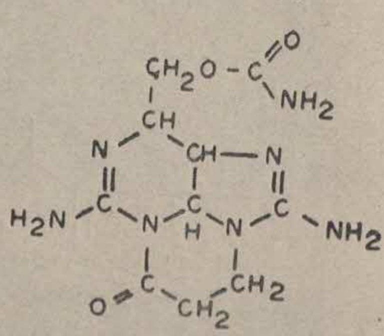


α-Amino-β-oxalylamino-propionic Acid

এসিড বেশী মাত্রায় বেশী দিন খেলে ল্যাথিরিস্‌ম্ (lathyrism) বা খেঁসারি ডাল জনিত পক্ষাঘাত হয়। মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জায়গায় যারা খেঁসারি ডাল নিত্য ও বেশী মাত্রায় খায় তাদের মধ্যে এই রোগ বেশী দেখা যায়। আকৃতা সাধারণত খেঁসারী ডালে মিশে থাকে।



Tetrodotoxin



Saxitoxin

সীসাজনিত পক্ষাঘাত

সীসার সল্ট (lead salt) শরীরে প্রবেশ করলে শরীরে থেকে যায় ও এভাবে অল্প অল্প করে শরীরে সীসা জমে সীসা জনিত অবসাদ (lethargy) বা পক্ষাঘাতে ভুগতে হয়। গুঁড়া হলুদে লেড ক্রোমেট (lead chromate) মেশান এই কারণে অতীব অন্যায় যদিও এর পাকা হলুদ রং এর জন্য হলুদ গুঁড়ায় এর ভেজাল সময়ে সময়ে ধরা পড়েছে।

খাদ্যে বিষাক্ত রং ও কার্বাইডের অবৈধ ব্যবহার

সম্প্রতি খাদ্য সম্বন্ধে আইন আরও কড়া করা হয়েছে, তাই খাদ্যে অনুমোদিত রং (permitted colour) ছাড়া অন্য কোনও রং দেওয়া আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। বেশ কিছু রং আছে যা থেকে ক্যান্সার (cancer) বা কর্কট রোগ হতে পারে। আইনের কড়াক্কড়ির ছাপ সাধারণ বাজারে পড়েছে বলে মনে হয় না। এর আগে কাটা মাছে ও রাঙ্গালুতে লাল রং ব্যবহার হয়েছে, যা আজও হচ্ছে। বর্তমানে এর ওপর পটলে সবুজ রং এর প্রচলন পাইকারী হারে হয়েছে, অনেকটা পাকা চুলে কলপ লাগিয়ে ছোকরা সাজার মত। খাদ্যদপ্তরের ও স্বাস্থ্যদপ্তরের ওপর দেশের লোক নির্ভর করে তাই এই রংগুলি অনুমোদিত রং কিনা এদিকে নজর রাখা এঁদের বিশেষ কর্তব্য। আরও একটি নীতি-বহির্ভূত প্রথার সম্প্রতি প্রচলন হয়েছে—কার্বাইডের (calcium carbide) এসিটিলিন (acetylene) গ্যাস দিয়ে কলা, আম প্রভৃতি তাড়াতাড়ি বাহ্যিকভাবে পাকা ফলের মত করা। এবিষয়ে ভালমন্দ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা করা উচিত।

অন্যান্য দূষিত খাদ্য

অন্যান্যদের মধ্যে জীবাণু দূষিত খাদ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাঁচা ডিম খাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে, কেন না এতে সময়ে সময়ে সালমনেলা (Salmonella) জীবাণু থাকে, যা থেকে কঠিন উদরাময় হয়। এমন কি সিদ্ধ ডিমের তরকারি, বিশেষত গরমের দিনে খেলে এই রোগ হতে পারে। কেননা ডিমের অন্তঃস্থলের জীবাণুকে নাশ করা বেশ শক্ত। ক্ষীর, রাবড়ি প্রভৃতিতে জীবাণু না থাকলেও, অধিক রাত্রে ভূরিভোজনের পর ক্ষীর, রাবড়ি খেলে উদরাময় হতে পারে। এ-ধরনের ঘন দুধে পাকস্থলীতে হজমের হাইড্রোক্লোরিক এসিড (hydrochloric acid) বিশেষভাবে কমে যায়, যার ফলে পাকস্থলীতে উদরাময়ের অল্প কিছু জীবাণু, যা সাধারণত থাকে, তারা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সহরের পানীয় জল সহজেই জীবাণু দূষিত হয় বলে অনেকেই কোলাইটিস বা আমাশয় ও হেপাটাইটিস (hepatitis) রোগে ভোগে। বিষাক্ত বে-আইনী মদ (toxic illicit liquor) পান করে বহু লোক একসঙ্গে মারা গেছে এরকম যেখানে সেখানে আজও ঘটছে। আবগারী দপ্তর, পুলিশের দপ্তর ও স্বাস্থ্যদপ্তরের এ বিষয়ে সংযুক্ত প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ ধরনের ঘটনা মিথাইল এলকোহল (methyl alcohol) ভেজাল দেওয়ার জন্য অনেক সময়ে ঘটে, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থের সংমিশ্রণের জন্যও ঘটেছে।

পরিশেষে একথা পরিষ্কার করে বলা দরকার যে কড়া আইন ও কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করলেই দেশের অবস্থা ভাল হবে না। এ সব বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রসারেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

পরিবেশ দূষণ এবং মানবদেহে তার প্রভাব

সুখময় ভট্টাচার্য

পরিবেশ বলতে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে 'কার পরিবেশ', অর্থাৎ কোন সজীব বস্তুর সাপেক্ষে পরিবেশের আলোচনা করতে হয়। সজীব বস্তুটির চারপাশের যাবতীয় সজীব ও নির্জীব বস্তু নিয়ে তার পরিবেশ। মানবেতর প্রাণীরা যদি চিন্তা করতে ও কথা বলতে পারত, তবে তাদের মধ্যেও পরিবেশের আলোচনা উঠত এবং তারা তাদের দৃষ্টিকোণ ও নিরাপত্তার দিক থেকে পরিবেশের বিবেচনা করত। কিন্তু পৃথিবীর জীবজগতে মানুষই চিন্তা করা ও ভাষা ব্যবহারে সক্ষম। তাই কীটনাশক ছিটিয়ে 'অনিষ্টকারী' জীবের পরিবেশ বিষাক্ত ও তাদের বিনাশ করার পর সেই পদার্থটি যদি বিনষ্ট না হয়ে অবিকৃত অবস্থায় চারপাশে জমতে থাকে, বিষয়টি নিয়ে তখনই আলোচনা শুরু হয়, কারণ মানুষের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুসারে পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে অবস্থানরত কোন বস্তুর আধিক্য বা নূতন কোন ক্ষতিকারক বস্তুর অনুপ্রবেশের ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর অবস্থার উদ্ভব হলেই পরিবেশ দূষণ ঘটেছে বলা চলে।

প্রায় চারশ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম আবির্ভাবের পর থেকে বিবর্তনের পথ ধরে যে অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে, নিশ্চিহ্ন হয়েছে বা বর্তমান রয়েছে, তাদের সকলকে নিয়ে প্রকৃতি প্রভাব ফেলে এক সুশৃঙ্খল জৈবিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে পেরেছে। আপাত-অদৃশ্য অণুজীবজগৎ এবং দৃশ্য জীবজগতের মধ্যে বিভিন্ন অজৈব ও জৈব পদার্থরূপে চক্রাকারে খাদ্যশৃঙ্খলে আবর্তিত হয়েছে জীবন সৃষ্টিকারী গোটা কুড়ি মৌল পদার্থ। সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে ধরে রাখা সৌরশক্তি চক্রাকারে সঞ্চারিত হয়েছে ভিন্নতর প্রজাতিতে। প্রাণের বিবর্তনের শেষপর্বে পৃথিবীতে এসেছে মানুষ, গুরুমস্তিষ্কের ক্রমিক বিকাশে অমিত শক্তির অধিকারী। স্বভাবতঃই সে প্রকৃতির নিয়ম নির্বিবাদে মেনে নিয়ে প্রকৃতির বহু প্রজাতির অন্যতম হয়ে থাকতে চায়নি। প্রকৃতিতে কোন প্রাণীই বার্ধক্যে মরে না (সাম্প্রতিক সংযোজন মানুষ ও তার দ্বারা পালিত কিছু প্রাণী বাদে), কারণ তারা বার্ধক্যে পৌছনর অনেক আগেই খাদকের দ্বারা বা অণুজীবের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে প্রকৃতি নির্দিষ্ট খাদ্য শৃঙ্খলের অঙ্গীভূত হয়। মানুষ প্রকৃতির এই অমোঘ বিধান অকালমৃত্যুকে অস্বীকার করে চাইল অমৃতত্বের সন্ধান, নিজেদের প্রজাতি বাড়িয়ে চলল এবং নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে নির্মমভাবে যথেচ্ছ শোষণ করতে লাগল। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরার" যাবতীয় ভূভাগ তার জন্য উদ্দিষ্ট, হরেক প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ তার ভোগে উৎসর্গীকৃত। পরিবেশের নির্মলতা বা দূষণের সংজ্ঞা তার জীবনধারণের স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্যের নিরিখে বিচার্য। ফলে চারশ কোটি বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে-ওঠা পৃথিবীর জৈবিক সাম্যাবস্থা আজ মনুষ্য প্রজাতির যথেচ্ছ ব্যবহারে বিপর্যস্ত। অতঃপর পরিবেশ যখন নিজের অস্তিত্বের পক্ষেই প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে ও দাঁড়াচ্ছে, এই অবিমৃষ্যকারী মনুষ্য প্রজাতিরও কিঞ্চিৎ চেতনা হচ্ছে যে প্রাকৃতিক সব ব্যবস্থাকে অস্বীকারের বা প্রকৃতি থেকে বেশীদূর সরে আসার মধ্যে সম্ভবতঃ কল্যাণ নেই। মানুষ ক্রমশঃ বুঝতে শিখছে যে তার নিজের প্রয়োজনেই জীবজগতের অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের নিরাপত্তা বিধান করা প্রয়োজন।

মানুষের পরিবেশ দূষণের প্রকৃতি ও মাত্রা, তার স্থানিক পার্থক্য, দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার উপায় প্রভৃতি বিষয় অন্যান্য প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব মানবদেহের ওপর নানাপ্রকার দূষণ কি কি প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ঘটাতে পারে।

আমরা জানি, জীবনের একক হচ্ছে কোষ। এই কোষের ভেতর নিয়ত সংঘটিত জৈবরাসায়নিক ক্রিয়াকলাপের সমষ্টিগত ফলই জীবন। এককোষী জীবের ক্ষেত্রে জীবটি বাইরের পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। বহুকোষী জীবের ক্ষেত্রে কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন। এসব জীবের দেহে অসংখ্য বিভিন্ন প্রকারের কোষ, যেগুলি প্রত্যেকটি পৃথকভাবে সজীব, সন্নিবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং এই কোষগুচ্ছ বহিঃপরিবেশ থেকে নির্দিষ্ট আবরণ দিয়ে ভিন্ন। দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন কোষের মধ্যবর্তী স্থানগুলি তরল ও তাতে দ্রবীভূত নানা পদার্থ দিয়ে পূর্ণ। এই আন্তঃকোষীয় তরলকে জীবটির অন্তঃ পরিবেশ বলা হয়। বহিঃপরিবেশের কোন সংকেত বা পদার্থ বহুকোষী জীবের কোষে কোষে পৌঁছয় এই অন্তঃ পরিবেশের মাধ্যমে। অর্থাৎ বহুকোষী জীবের দুটি পরিবেশ—বহিঃপরিবেশ (milieu exterior) ও অন্তঃপরিবেশ (milieu interior)। স্তন্য-পায়ীদের ক্ষেত্রে বহিঃপরিবেশ আবার জীবনের পর্যায়ভেদে দুরকমের হয়। জীবনশুরুর প্রথম কয়েকমাস এরা মাতৃগর্ভে কাটায়; সে সময় মাতৃগর্ভের অভ্যন্তরস্থ পরিবেশই তার বহিঃ

পরিবেশ। জন্মের পর তার দ্বিতীয় বা স্থায়ী পরিবেশে জীবন শুরু হয়।

উপরের আলোচনামত তাহলে আমাদের পরিবেশকে আমরা 1 নং সারণীর মত বিন্যস্ত করে দেখতে পারি :—

- মানুষের পরিবেশ
  - অন্তঃপরিবেশ
  - বহিঃপরিবেশ
    - জন্মের পূর্বে-মাতৃজঠর
    - জন্মের পরে-
      - প্রাকৃতিক পরিবেশ
      - সামাজিক পরিবেশ

1 নং সারণী

প্রাণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অভিযোজনের (adaptation) ক্ষমতা। এর ফলে বহিঃপরিবেশের পরিবর্তন অনেকটা পরিমাণে মানিয়ে নিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। আমাদের অন্তঃপরিবেশ পর্যাপ্ত ঘাতসহ। কিন্তু নির্দিষ্ট মাত্রার বেশী বহিঃপরিবেশের কোন আকস্মিক বৃহৎ পরিবর্তন বা দীর্ঘস্থায়ী স্বল্পমাত্রার পরিবর্তন অন্তঃপরিবেশে বড়ো মাপের পরিবর্তন আনে এবং ফলে কোষসমূহে রাসায়নিক বা অন্য বৈকল্য ঘটায়।

সাধারণতঃ বহিঃপরিবেশ দূষণের প্রতিফলনই পড়ে আমাদের অন্তঃপরিবেশের ওপর এবং তার চরম ফলশ্রুতি আমাদের স্বাস্থ্যের বৈকল্য। তবে বহিঃপরিবেশের নিরপেক্ষ ভাবেও কারুর কারুর অন্তঃপরিবেশ দূষণ ঘটান যায় এবং ঘটে থাকে। ব্যাপকতার বিচারে ইদানীং এইপ্রকার দূষণও যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, নানাপ্রকার ভেষজের অবিমৃষ্য ব্যবহার অন্তঃপরিবেশের দূষণ ঘটায় এবং ফলে বিভিন্ন ধরনের অস্বাস্থ্যের উদ্ভব ঘটে। স্বদূষণের একটি চরম উদাহরণ সাম্প্রতিক "ড্রাগ অ্যাডিকশান" বা বিভিন্ন নেশাসৃষ্টিকারী ওষুধে আসক্তি, অবশ্য এখানে স্বদূষণের কারণ সামাজিক পরিবেশের অব্যবস্থা। অন্য কিছু নেশার উপকরণও আমাদের অন্তঃপরিবেশ দূষিত করে তোলে। একটি পরিচিত উদাহরণ হল ধূমপান। চিকিৎসকের মতে, ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে একপ্রকার দৃষ্টিক্ষীণতা, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যানসার এবং অন্যান্য অসুখের ঘটনা অধূমপায়ীদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী ঘটে থাকে। (অবশ্য ধূমপান বহিঃপরিবেশ দূষণ ও চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদেরও ক্ষতি করে। সাম্প্রতিক একটি তথ্যে প্রকাশ, ধূমপান ধূমপায়ীর চেয়ে পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তির বেশী ক্ষতি করে।) অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অন্তঃপরিবেশ দূষণ থেকে গর্ভস্থ সন্তানের বহিঃপারবেশও দূষিত হয় এবং অজাত শিশুটির ক্ষতি সাধন করে। বছর কয়েক আগেকার থ্যালিডোমাইড দুর্ঘটনা এর একটি চরম উদাহরণ। অন্তঃসত্ত্বা মায়েরা ঘুমের ওষুধ থ্যালিডোমাইড খাওয়ার ফলে হাজারে হাজারে নানাধরনের বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়েছিল ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশে (2 নং সারণী)।

- বহিঃপরিবেশ দূষণ ↓ / স্বদূষণ → অন্তঃপরিবেশ দূষণ
  - ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বৈকল্য
  - (অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে) গর্ভস্থ সন্তানের পরিবেশ (বহিঃ / অন্তঃ) দূষণ
    - ↓ সন্তানের স্বাস্থ্য বৈকল্য

2 নং সারণী

পরিবেশ দূষণের সমস্যা বলতে অবশ্য ব্যাপকতর মাত্রার এবং জটিলতর প্রকৃতির সমস্যা বহিঃপরিবেশ দূষণকেই বোঝায়। আমরা যে পরিবেশে জন্মাই ও বড় হই, প্রকৃতির যে বাতাস আমরা বুকভরে নিঃশ্বাস নিই, যে জল আমরা পান করি, যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, এককথায় ভূপৃষ্ঠের প্রাথমিক স্তর যে বায়োস্ফিয়ার তার যে ব্যাপক দূষণ মানুষই ঘটিয়েছে এবং ঘটিয়ে চলেছে, তাই আজ তার অস্তিত্বকে আঘাত হানতে উদ্যত। প্রাকৃতিক সাম্যাবস্থা অস্বীকার করে কয়েক শতক ধরে মানুষ দ্রুত সংখ্যায় বেড়েছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে এই সংখ্যা এক সংকটজনক অবস্থায় দাঁড়ানর উপক্রম হয়েছে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর আহার্যের প্রয়োজনে (যদিও পৃথিবীতে অভুক্ত / অর্ধভুক্তই এখনও বেশী) জমিতে সংবৎসর ফসল ফলান হচ্ছে কৃত্রিম সার দিয়ে, কীটনাশক দিয়ে ফসলের সুরক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে, বন কেটে বসতি বিস্তার হচ্ছে, গ্রাম ও শহরে দ্রুতগতিতে শিল্পায়ন হচ্ছে, জনপদের ও কলকারখানার নিঃসৃত আবর্জনা পরিবেশে এসে মিশছে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার শুরু হয়েছে—এই ঘটনা পরম্পরা আজ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের পক্ষেই সংকটজনক এক দূষিত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। তাই আজ পরিবেশ দূষণ এবং মানবদেহে তার নানাবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা এত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা বহিঃ পরিবেশ দূষণকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেব (3 নং সারণী) :—

- বহিঃ পরিবেশ দূষণ
  - ভৌত রাসায়নিক দূষণ
    - ভৌত দূষণ
    - রাসায়নিক দূষণ
  - জৈবিক দূষণ
    - অণুজীবঘটিত দূষণ
    - সামাজিক দূষণ

3 নং সারণী

ভৌত দূষণ :

(1) উষ্ণতা বৃদ্ধি—

মানুষ উষ্ণ রক্তের প্রাণী। পরিবেশের উষ্ণতা নিরপেক্ষে

মানুষ নিজের দেহাভ্যন্তরের অর্থাৎ অন্তঃপরিবেশের উষ্ণতা একটা নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ রাখতে পারে। দেহাভ্যন্তরে উষ্ণতার ব্যাপক হেরফের হলে কোষের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপের ব্যত্যয় ঘটে। আমাদের দেহের উষ্ণতা নির্দিষ্ট সীমায় বজায় রাখার ক্ষমতা কিন্তু সীমিত। পরিবেশের উষ্ণতার বড় রকমের পরিবর্তন হলে দৈহিক তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন, প্রচণ্ড গরম ও আর্দ্র দিনে অনেকের "হিট স্ট্রোক" হয়। পৃথিবীতে মনুষ্য প্রজাতির মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধি, মনুষ্য বসতির চাহিদা ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে বনাঞ্চলের ক্রমিক অবলুপ্তি এবং ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস ও ধরনের পরিবর্তন, নানা প্রয়োজনে জ্বালানীর বর্ধিত ব্যবহার প্রভৃতি পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে পরিবেশতত্ত্ববিদেরা আমাদের জানাচ্ছেন। পৃথিবীর জলরাশির সাম্যাবস্থায় পরিবর্তন আনার আশংকা ছাড়াও এই উষ্ণতাবৃদ্ধি বিশেষ করে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলিতে মানুষের দেহে মনে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

(2) শব্দদূষণ—

মানুষের যান্ত্রিক সভ্যতায় উদ্ভূত শব্দব্রহ্ম আজ মানুষেরই কর্ণপটাহে তপ্তশলাকার রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষতঃ স্বল্পপরিসর ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় কলকারখানা, যানবাহন, অবসর বিনোদনের নানা উপকরণ ইত্যাদির সম্মিলিত বা বিক্ষিপ্ত শব্দ আমাদের শ্রবণযন্ত্রের পক্ষে বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ, শহর কলকাতার অধিবাসীদের শ্রবণক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। 85 ডেসিবেলের চেয়ে জোরাল শব্দ আমাদের শ্রবণযন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে। শব্দমাত্রা 120 ডেসিবেলের বেশী হলে কানে যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং 130-140 ডেসিবেল হলে হঠাৎ বধির হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শহরে যে ভারী যানবাহন চলে, উৎসবাদিতে যে বোমা-পটকা ফাটান হয় বা তারস্বরে মাইক বাজান হয়, তাদের অনেকেরই শব্দমাত্রা সহনীয় মাত্রার ঊর্ধ্বে থাকে। শহরে বহুতল বাড়ী থাকায় শব্দদূষণের মাত্রা বাড়ে। যে সব শ্রমিককে উচ্চশব্দযুক্ত পরিবেশে কাজ করতে হয়, তাদের অনেককেই এই দূষণের কমবেশী শিকার হতে হয়।

(3) পারমাণবিক দূষণ—

এই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনটির জন্ম চার দশক পূর্বে, কিন্তু এটি ইতিমধ্যেই পৃথিবীর তাবৎ জীবন বিনাশের আশংকা নিয়ে এসেছে। জীবজগতের সমস্ত প্রজাতির মধ্যে মানুষের একটি অনন্যতা হল এই যে কারণে অকারণে নিজ প্রজাতির বিনাশ সাধনে সে তৎপর। এই প্রবণতাই এই অধুনাতম এবং সর্বধ্বংসী মারণপন্থাটির উদ্ভব ঘটিয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্র বিস্ফোরণ, বিশেষতঃ যে মাপের শক্তিসম্পন্ন মারণাস্ত্র পৃথিবীতে এখন সঞ্চিত আছে তাদের বিস্ফোরণ, অবশ্য পরিবেশ দূষণ ও মানবদেহে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনার অবকাশ রাখবে না, কারণ চকিতে সর্বাকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই তার উদ্দিষ্ট। তবে পৃথিবীতে কিছু উন্নত দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের যেসব পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছে ভূগর্ভে, সমুদ্রতলে কিংবা বায়ুস্তরে, বিভিন্ন দেশ তথাকথিত শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে, যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এসবই পরিবেশ দূষণের সমস্যা নিয়ে আমাদের সামনে আসছে। কারণ পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষার ধোঁয়া (fall-out) বা রিঅ্যাক্টরের অপজাত পদার্থের (ash) তেজস্ক্রিয়তাই এ সম্পর্কে ভীতির কারণ।

মানবদেহে তেজস্ক্রিয়তার সহনীয় মাত্রা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞেরা যাই বলুন না কেন, প্রকৃত সত্য এই যে মানবদেহে তেজস্ক্রিয়তা কোন মাত্রাতেই নিরাপদ নয়। একটিমাত্র তেজস্ক্রিয় পরমাণুই কারুর দেহের একটি কোষে যে পরিবর্তন ঘটায়, তাই ক্রমিক বৃদ্ধিতে তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তেজস্ক্রিয়তার ফলাফল ক্রমপুঞ্জিত (accumulative) হয়, অর্থাৎ বেশীমাত্রায় কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শ এবং তথাকথিত সহনীয় মাত্রায় সেই পদার্থের বারংবার সংস্পর্শের ফলাফল একই রকমের মারাত্মক হতে পারে। পারমাণবিক কেন্দ্রে যেসব কর্মী কাজ করেন, এ তথ্যটি তাদের দিক থেকে বিশেষ বিবেচ্য।

আর একটি জ্ঞাতব্য হল, প্রাণীটিকে বিনষ্ট করেই তেজস্ক্রিয় পদার্থটি নিজে বিনষ্ট হয় না, পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। তেজস্ক্রিয়তা স্বতঃবিনষ্ট হয় বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়সীমায়। যেমন, মনুষ্যসৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্লুটোনিয়াম-239 এর অর্ধজীবন (Half-life—তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা যে সময়ে অর্ধেক কমে) 24,400 বছর। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আলফা, বিটা ও গামা—এই তিনরকম রশ্মি বেরোয়। এদের মধ্যে গামা রশ্মির ত্বক ভেদ করার ক্ষমতা বেশী, কিন্তু আলফা ও বিটা রশ্মির কোষবিধ্বংসী ক্ষমতা অধিকতর মাত্রার। খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে শেষোক্ত কণিকাদ্বয় দেহে প্রবেশ করলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশী হয়। প্রাকৃতিক যে তেজস্ক্রিয়তা আমাদের ওপর আপতিত হয়, তাতে গামারশ্মি বেশী থাকে; মনুষ্যসৃষ্ট তেজস্ক্রিয়তায় আলফা ও বিটা কণিকার পরিমাণ বেশী।

তেজস্ক্রিয়তা মানবদেহে কোষকে সরাসরি বিনষ্ট করে অথবা তাদের বিভাজন বন্ধ করে দেয়। অনেকক্ষেত্রে, তেজস্ক্রিয়তা কোষের কেন্দ্রীনে কিছু পরিবর্তন ঘটায় যার ফলে কোষটি পরিবর্তিত (Mutation) হয়ে যায়। এই পরিবর্তিত কোষটি বিভক্ত হতে থাকলে কালক্রমে ক্যানসারের উৎপত্তি ঘটে। জননেন্দ্রিয়ের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে অর্থাৎ শুক্রকোষ বা ডিম্বকোষের জীনে তেজস্ক্রিয়তার ফলে পরিবর্তন হলে তার ফলাফল পরবর্তী প্রজন্মে বর্তায়, বিকলাঙ্গ সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়। হিরোশিমা নাগাসাকিতে তাৎক্ষণিক ধ্বংস ছাপিয়ে তেজস্ক্রিয়তার বিষক্রিয়া বর্তেছে পরবর্তী প্রজন্মের বহু জাপানী ছেলেমেয়ের ওপর।

রাসায়নিক দূষণ:

মানুষ নিজ পরিবেশের যতরকমের দূষণ করেছে বা করছে, রাসায়নিক দূষণ এখন পর্যন্ত তাদের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক। কলকারখানায় সৃষ্ট এবং যানবাহন এমনকি প্রতি গৃহে যে জ্বালানী ব্যবহার হয় তাদের অসম্পূর্ণ দহনে জাত নানা রাসায়নিক পদার্থ বায়ুস্তর দূষিত করে; কলকারখানা ও জনপদের নিঃসৃত জৈব ও অজৈব পদার্থ নদী, সমুদ্র ও অন্যান্য জলরাশিকে দূষিত করে; তৈলজাহাজ থেকে ছড়িয়ে-পড়া তেল সমুদ্রজল

দূষিত করে ; কিছু রাসায়নিক কীটনাশক, যেগুলি প্রকৃতিতে বিনষ্ট না হয়ে অপরিবর্তিত থেকে যায়, উৎপন্ন শস্য ও জল দূষিত করে এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকারী অণুজীবনকে বিনষ্ট করে। এভাবে এবং আরও অনেকভাবে চলছে আমাদের পরিবেশের রাসায়নিক দূষণ।

পৃথিবীর অনেক শহরাঞ্চলে রাসায়নিক বায়ুদূষণ কমবেশী মাত্রার শংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, সীসা প্রভৃতি রাসায়নিক দূষণের কারণ হিসেবে বিশেষ উল্লেখ্য। অনেক শহরাঞ্চলে বাতাসের ধূলিকণা, জলীয় বাষ্প এবং এইসব রাসায়নিক পদার্থ মিশে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। বাতাসে এইসব গ্যাসীয় পদার্থের বৃদ্ধির ফলে শ্বাসকষ্ট, ব্রঙ্কাইটিস ও ফুসফুসের অসুখ, চোখজ্বালা করা ইত্যাদি হয়। কলকাতা শহরের ওষুধের দোকানগুলিতে খোঁজ নিলে দেখা যাবে কি বিপুল পরিমাণে কাশি-হাঁপানীর ওষুধ বিক্রী হচ্ছে।

কলকারখানা, যানবাহন ইত্যাদির উপজাত একটি পদার্থ হল কার্বন মনোক্সাইড। কার্বন মনোক্সাইডের মাত্রাধিক্য ঘটলে রক্তের অক্সিজেন বহনক্ষমতা কমে যায় এবং দেহের কোষগুলি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হয়। অধিকমাত্রার কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়ায় মাথায় তীব্র যন্ত্রণা হয়, দেহের বিভিন্ন টিসুতে রক্তপাত হয় এবং কিড্‌নী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন, কার্বন মনোক্সাইডের একটি উৎস হল ধূমপান। শহরাঞ্চলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্যও শ্বাসকষ্টের একটি কারণ। যানবাহনের আধিক্যের ফলে শহরবাসীদের দেহে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় সীসার আধিক্য দেখা যায়। সীসা দেহের পক্ষে বিষাক্ত।

কিছু রাসায়নিক কীটনাশক প্রকৃতিতে বিনষ্ট হয় না এবং খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে আমাদের দেহে আসে। যেমন ডি.ডি.টি.। পৃথিবীর অনেক দেশে নিষিদ্ধ এই পদার্থটি কিন্তু ভারতে নিষিদ্ধ নয়। ডি.ডি.টি. দেহের ফ্যাটে সঞ্চিত হতে থাকে। শরীরে কীটনাশকের প্রভাবে ক্যালসিয়াম বিপাকজনিত ব্যাধি, ক্যানসার প্রভৃতি সৃষ্টি হতে পারে।

পরিবেশের রাসায়নিক দূষণ বাতাস ও জলে, বিশেষতঃ ঘনবসতির শহরাঞ্চলে এমন অনেক পদার্থ ছড়িয়ে দিচ্ছে, যা খাদ্য, পানীয় ও শ্বাসের মাধ্যমে দেহে ঢুকে দেহকোষে পরিবর্তন আনে এবং এই পরিবর্তিত কোষ থেকে ক্যানসারের উৎপত্তি ঘটে। ঊর্ধ্বাকাশে একটি ওজোন-স্তর ছাতার মত পৃথিবীকে অতিবেগুনী ও অন্যান্য রশ্মি থেকে রক্ষা করছে। জেটবিমান প্রভৃতি যানবাহন চলাচল এবং বায়ুস্তরে তেজষ্ক্রিয় পদার্থের পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে এই ওজোনস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে ভবিষ্যতে ক্যানসার প্রভৃতি রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে।

ক্ষুদ্র ও অণুজীবঘটিত দূষণ ঃ

পৃথিবীতে অণুজীবের জগৎ আপাত-অদৃশ্য হলেও প্রকৃতই বিশাল, অবশ্য এই অণুজীবজগতের অধিকাংশ প্রজাতিই স্বনির্ভর। কেবল কিছু অণুজীবের কয়েকটি প্রজাতি বহুকোষী জীবের দেহে পরজীবী হিসেবে অবস্থান করে। এদেরই কিছু অংশ পোষকের দেহে অনেক সময় মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি করে। প্রকৃতির বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে জৈবিক সাম্যাবস্থার ব্যত্যয় মানুষের নিজের অস্তিত্বের পক্ষেই বিপদ হয়ে দাঁড়াবে, এ কথা সত্য বলে ধরে নিলেও সীমিত পরিবেশে ভিন্নতর প্রাণীর পরিকল্পিত বিনাশ মানুষকে করতেই হয় নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনে। কিছু প্রজাতির কীটপতঙ্গ সংক্রামক ব্যাধির বাহক (vector), অন্য কিছু পরোক্ষভাবে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তারে সাহায্য করে। বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ প্লেগ, ডেঙ্গুজ্বর, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফাস প্রভৃতি অসুখের বাহক হিসেবে এবং উদরাময় কলেরা প্রভৃতি অসুখ পরোক্ষভাবে জনপদে ছড়ায়। বাসস্থান ও তার আশেপাশে এসব প্রাণী নিয়ন্ত্রণের ফলে অনেক সংক্রামক ব্যাধি এখন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ভারতে কুকুরের কামড়ে প্রতিবছর বহু লোক জলাতঙ্কে মারা যায়। মানুষের জনপদে যত্রতত্র সারমেয়বাহিনীর অবস্থান, যেমন আছে আমাদের তিলোত্তমা কলকাতা শহরে, স্বভাবতঃই জনস্বাস্থ্যের বিচারে কাম্য নয়।

আধুনিক শহরাঞ্চলগুলিতে ব্যাপক জনঘনত্বের জন্য অণুজীব ঘটিত পরিবেশ দূষণ এড়ান প্রায়শঃই সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ ভাইরাসঘটিত ব্যাধিগুলি সরাসরি প্যানডেমিক (pandemic—কাছাকাছি সময়ে পৃথিবীর বহুদেশে প্রাদুর্ভাব) হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা বা 'ফ্লু', চক্ষুর প্রদাহ (বছর কয়েক আগের 'জয় বাংলা') ইত্যাদি কয়েকটি প্যানডেমিক নিকট অতীতেই ঘটেছে। এছাড়া অনেক সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমণ ঘটে বায়ু ও জলদূষণের মাধ্যমে। জনঘনত্ব, বৃহত্তর জনতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার অপ্রতুলতা (ভারতের বড় শহরগুলিতেও সকল অধিবাসীর জন্য পয়ঃপ্রণালী বা জলসরবরাহের ব্যবস্থা নেই, বৃহত্তর দেশের কথা তো দূরস্থান) ইত্যাদি কারণে শহরে ও গ্রামে ব্যাধিসৃষ্টিকারী অণুজীবের দ্বারা বাতাস ও জল দূষণ ঘটে। বাতাস দূষণের ফলে সর্দি, ব্রঙ্কাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি, এবং জল দূষণের ফলে কলেরা, টাইফয়েড, উদরাময়, পোলিও, হেপাটাইটিস প্রভৃতি ব্যাধি ছড়ায়। একটি সংখ্যাতত্ত্বে প্রকাশ, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কেবলমাত্র উদরাময়ে দৈনিক প্রায় চল্লিশ হাজার শিশু মারা যায়।

সামাজিক দূষণ ঃ

বর্তমানে স্বাস্থ্যের যে ধারণাটি সর্বজনস্বীকৃত তা হল "স্বাস্থ্য হচ্ছে দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক এক সুখাবস্থা। কেবলমাত্র অসুখের অভাবকেই স্বাস্থ্য বলা চলে না।" সামাজিক ব্যবস্থা বা অব্যবস্থা ব্যক্তির দেহমনের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। আমাদের দেশে এক বৃহৎ সংখ্যক জনতার পর্যাপ্ত আহার, শিক্ষা এবং জীবনধারণের অন্যান্য উপকরণগুলির ন্যূনতম সংস্থানও নেই। এই দারিদ্র্য ও অশিক্ষাই বৃহত্তর জনসমষ্টির কাছে সবচেয়ে বড় পরিবেশ দূষণ ; সমাজদেহে এই দূষণের ফলে সবুজ বিপ্লবের দেশেও তারা অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত থাকে। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বিদায়ী সভাপতি ফিডেল ক্যাস্ট্রো বলেছেন "উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 1982 সালে যত লোক অনাহারে মারা গেছে,

তাদের প্রত্যেকের জন্য যদি আমরা এক মিনিট করে নীরবতা পালন করি, তাহলে আমরা 2000 সালকে স্বাগত জানাতেই পারব না, কারণ তখনও আমরা নীরবে দাঁড়িয়েই আছি।"

সমাজের বৃহত্তর অংশকে অস্বাস্থ্য ও অপুষ্টির মধ্যে রেখে ক্ষুদ্রতর ও স্বচ্ছলতার অংশটির স্বাস্থ্যও দীর্ঘদিন নিরাপদ রাখা যায় না। আমাদের সমাজের স্বচ্ছলতর শ্রেণীর মধ্যে নানা মূল্যবোধের অবক্ষয় ক্রমে এক ব্যাপক দূষণের আকার নিচ্ছে। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছলতা ও সামাজিক বিষয়ে ঔদাসীন্য এই আত্মকেন্দ্রিক অংশকে ঠেলে দিচ্ছে জিন্‌স্‌-কোলা-পপ-ম্যারিজুয়ানা-হুইস্কির অপজগতে, দীর্ঘদিনের নিজস্ব মূল্যবোধগুলি হচ্ছে অন্তর্হিত।

সবশেষ কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, পৃথিবীর বৃহত্তম ধনতান্ত্রিক দেশ আজ বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্বের মোহে এবং দ্বিতীয় বৃহৎ শক্তি সমাজতান্ত্রিক দেশটি তার প্রতিরোধে যে পারমাণবিক মারণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে, তাতে কেবল পরিবেশ দূষণ নয়, পৃথিবীর তাবৎ জীবন যে কোন মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশংকা আছে।

পরিশিষ্ট ঃ

মানুষের পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে সুনিশ্চিতভাবেই মানুষ প্রজাতির অপরিমিত সংখ্যাবৃদ্ধিকে উল্লেখ করা চলে। এই বিরাট জনসমষ্টির প্রয়োজনেই বনাঞ্চলের ক্রমিক অবলুপ্তি, জলাশয় ভরাট করে বসতি নির্মাণ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, ব্যাপক কলকারখানা ও যানবাহনের প্রচলন। অবশেষে বিলম্বে হলেও মানুষের চৈতন্য হয়েছে, 1972 সালে স্টকহোমে পৃথিবীর 113টি দেশের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে পরিবেশ দূষণ রোধের সঙ্কল্প নিয়েছে। পরিবেশ দূষণ রোধে বিভিন্ন দেশে নানা সরকারী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, জনমত জাগ্রত হচ্ছে। এমনকি, পরিবেশের ওপর চাপ কমাতে মানুষ অবশেষে নিজ প্রজাতিকেই বিনাশ করতে শুরু করেছে। অজাত মানব-সন্তানকে বিনাশ করা বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই এক স্বীকৃত বিধি। আশংকা হয়, সংখ্যাবৃদ্ধি রোধের এই যুক্তি ভ্রূণ হত্যাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে তো? নাকি ভবিষ্যতে বৃদ্ধ ও অন্যান্য দুর্বলতর জনসমষ্টিও সমাজে অবাঞ্ছিত এবং পরিবেশ দূষণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হবে?

সমাজ-মানসিক পরিদূষণ

অসীম বর্ধন

মানসিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মানুষ মাত্রই নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করেন এবং তিনি আবেগ-প্রক্ষোভজনিত সকল বিষয়ে নিরাপত্তা বোধ করে থাকেন ; তাঁর সামর্থ্য সম্পর্কে তিনি আস্থা পোষণ করেন। জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতা ও সজীবতা উপলব্ধি করেন এবং স্বাধীনভাবে তিনি তাঁর সৃজনশীল আত্মিক সম্পদের উন্নতি সাধন ও অভিপ্রকাশ ঘটাতে পারেন।

মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার বিচার-বিবেচনায় আমাদের মধ্যে অল্প-সংখ্যক মানুষই আজ প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি যথেষ্ট-ভাবে নিজেদের মধ্যে সুরক্ষিত রাখতে পারেন। তবুও আমরা স্বভাবতঃ কেউ নিজেকে মানসিক স্বাস্থ্যহীন বা রুগ্ন বলে স্বীকার করতে চাই না।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অবিরাম পীড়নের ফলে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকেই হারিয়ে ফেলে মানসিক স্বাস্থ্যহানির কবলায়িত হচ্ছেন। সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন সমাজকল্যাণ সংস্থা থেকে জনসাধারণকে মানসিক স্বাস্থ্য পরিদূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা দরকার।

তবে এর বিপজ্জনক পরিণামের আরও একটি দিক চিন্তা করা প্রয়োজন। কারণ মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, সমাজবদ্ধ মানুষকে মানসিক স্বাস্থ্যের কথা মনে করিয়ে দিলে যেন আরও বেশী ভীতিপ্রবণতা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই ব্যর্থতা হতাশা আসে, আবেগ-প্রক্ষোভের তরঙ্গ আঘাত করে, নিরাপত্তাবোধের অভাব জর্জরিত করে, দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে ইচ্ছা হয়। এই সব মানসিক অবস্থা থেকে আমাদের জীবনে কত মানসিক তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, কিন্তু তাতে মানসিক স্বাস্থ্যহানি তো ঘটে না। কিন্তু এইসব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যদি আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি আগ্রহ কমে যায়, দায়িত্ববোধের বিকৃতি ঘটে, তাহলে বাস্তব জগৎ থেকে দূরে সরে যাবার, অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতা-বোধের প্রবণতা জাগে। তখনই শুরু হয় মানসিক স্বাস্থ্য পরিদূষণ।

এই ধরণের মানসিক পরিদূষণ সংক্রান্ত কয়েকটি মাত্র গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় নিয়ে এই নিবন্ধে সংক্ষেপে বর্ণানুক্রমিকভাবে আলোচিত হল। এই সমস্ত মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমষ্টি বিচার-বিবেচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যাবে, মানব-সমাজের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক বহু সমস্যার মূল কারণ হল পরিদূষিত সমাজ-মন।

আগ্রাসন (Aggression) ঃ

সকলেই স্বীকার করবেন, বর্তমান সমাজ যেন ক্রমশঃ উগ্র আগ্রাসী মনোভাবে পরিদূষিত হয়ে পড়ছে।

এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, মানুষ প্রজাতি স্বভাবধর্মেই আগ্রাসী। কিন্তু সন্দেহ জাগে, কেন এমন হল ? মনোবিজ্ঞানীর অনেক তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষের আগ্রাসী চরিত্র কি সত্যই স্বভাবজ ?

সিগম্যাণ্ড ফ্রয়েড মনে করতেন, হ্যাঁ, তাই। তিনি বলতেন, মানুষের দুটি স্বভাবধর্ম আছে যার দ্বারা সে চালিত হয়—সে দুটি স্বভাবধর্ম বা সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) হল—স্নেহভালবাসার উন্মুখতা (libido) আর, ধ্বংস-মৃত্যুর উন্মুখতা (mortido)। এই দুটি সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে সদাসর্বদা দ্বন্দ্ব চলেছে এবং প্রক্ষোভ পীড়ন অত্যধিক এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে আগ্রাসী আচরণে। এই আগ্রাসী মনোভঙ্গী সুস্থ সৃজনধর্মী কর্মকাণ্ডে প্রবাহিত হতে না পারলে সকলের মানসিক-সামাজিক পরিবেশকে করে তোলে পরিদূষিত এবং বিকারগ্রস্ত।

সুতরাং, এই দুটি শক্তিশালী সহজাত প্রবৃত্তির সুস্থ অভি-প্রকাশের জন্য প্রয়োজন স্নেহ-ভালবাসা আদানপ্রদানের আদর্শ পরিবেশ এবং দুঃসাহস চর্চার সমাজসম্মত সুযোগ-সুবিধা।

মনোবিজ্ঞানী কনরাড লোরেন্‌জ্ বলেন, আগ্রাসী সহজাত প্রবৃত্তিকে পশুরা নিজ নিজ প্রজাতি নিধনে প্রয়োগ করে না, কিন্তু মানুষ ঐ আগ্রাসী মনোভাবকে নিজ প্রজাতি নিধনেই নিয়োজিত করে থাকে। ফলে, মানুষ ক্রমশঃ পশুদের থেকেও বেশি আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ছে, যার ফলে পশুরাও মানুষদের ঘৃণা করতে শিখছে। মানুষদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা যত সহজে ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক-মানসিক পরিদূষণ সৃষ্টি করছে, পশুজগতে তেমন এখনও দেখা যায়নি।

আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে অবশ্য আগ্রাসী মনোভাব মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। এই মনোভাব মানুষ শিখেছে মানসিক-সামাজিক পরিদূষণের ফলে। মা-বাবা বিরক্তিভরে যখন সন্তান-সন্ততির প্রতি উগ্রতা প্রকাশ করেন, তখনই তো সেই উগ্র আগ্রাসন ছোটদের মনকে নিদারুণভাবে পরিদূষিত করে দেয়। আমরা যতখানি উগ্র আগ্রাসী মনোভাবের অভিপ্রকাশ কমাতে পারব, ঠিক সেই পরিমাণেই তো উগ্রতা এবং আগ্রাসী মানসিকতার পরিদূষণ সমাজ থেকে দূরীভূত হতে পারবে।

আর এক দৃষ্টিভঙ্গীর মনোবিদ্‌গণ বলেন যে, ব্যর্থতা ও হতাশাবোধ থেকেও উগ্রতা এবং আগ্রাসী মনোভাব জাগে। আমরা যখন যা চাই তা পাই না, তখন উগ্র আগ্রাসী মানসিক অভিপ্রকাশ ঘটে থাকে। কিন্তু ব্যর্থতা ও হতাশার সর্বক্ষেত্রেই এই পরিণাম পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং অন্য কারণও আছে।

জর্মন মনঃসমীক্ষক এরিখ ফ্রোম একেবারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দুটি আগ্রাসী মনোভঙ্গী সক্রিয় আছে। প্রথমটি হল—**প্রতিরক্ষী আগ্রাসন (defensive aggression)**, যার সাহায্যে আমরা কোনও আক্রান্ত পরিস্থিতিতে পশুদের মতই নিজের প্রতিরক্ষার জন্য সচেষ্ট হতে পারি। দ্বিতীয়টি হল—**ধ্বংসোন্মুখী আগ্রাসন (malignant aggression)**, যা কেবল মনুষ্য প্রজাতিরই একান্ত ধর্ম। মনুষ ভালবাসতে চায়, সৃষ্টি করতে চায়, স্বাধীন হতে চায় এবং এই চাওয়ার তৃপ্তি ঘটে মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির বিভিন্ন কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কিন্তু মনুষ্য প্রজাতি যতই বিবর্তন লাভ করেছে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বুঝতে শিখেছে, ততই লক্ষ্য করা গেছে, আমাদের ভূমিকা কতই নগণ্য, আমাদের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা এবং অসহায়ত্ব কতই সুস্পষ্ট। এই সর্বব্যাপ্ত বিচ্ছিন্নতা বোধ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য যে সংগ্রামে মানুষ মনোযোগী হয়ে আছে, তা থেকেই জেগেছে আগ্রাসী মনোবৃত্তি।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রোমের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সমসাময়িক তথা-কথিত সভ্য সমাজ মানুষকে একটা বিশাল নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রদানবের মধ্যে সামান্য একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের মত নগণ্য ভূমিকায় নামিয়ে এনেছে বলেই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামী অবস্থা স্বরূপ গতানুগতিকতা এবং অসহনীয় দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবার অভিব্যক্তিই হল উগ্র আগ্রাসী মানসিকতা এবং তার পরিদূষণ।

আত্মহত্যা :

দারিদ্র, নিঃসঙ্গতা, দুঃসহ পরিবেশ পীড়নে অসহায় বোধ প্রভৃতি কারণে আত্মহত্যার মানসিকতা আক্রমণ করে। এই ভয়াবহ মানসিক পরিদূষণ আজ সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে হতাশাচ্ছন্ন পরিবেশের অবিরাম পীড়নের ফলে। সমাজের অবিচারে প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন অথবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অভিপ্রায় নিয়েও বহু মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নেয়। ফলে, আত্মহত্যাকারী মানুষ সমাজের এক শ্রেণীর সহানুভূতি অর্জনেও সক্ষম হয়। সুতরাং এই মানসিক পরিদূষণ যেন এক মর্যাদার পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যাচ্ছে। অতএব একথা অনস্বীকার্য যে, ত্রুটিপূর্ণ হতাশাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থাই এই মানসিক পরিদূষণ সৃষ্টি করে।

আধকপালে যন্ত্রণা (Migraine) :

আজকাল দশ-শতাংশ লোকই এই ধরনের মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পান। কপালের একটি দিকে, একটি চোখের চারিপাশে দপ্‌ দপ্‌ করে যন্ত্রণা বোধ হয়। যন্ত্রণা বেশি বেড়ে গেলে মানুষ চোখে ঝাপসা দেখে, মাথা ঘোরে, বমি পায়।

মস্তিষ্কের রক্তবাহী নালীতে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হলে এই যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। এ যুগের অত্যধিক মানসিক ও সামাজিক পীড়নের মধ্যে যাঁরা জীবন যাপন করতে বাধ্য হন, তাঁদের দেহের মধ্যে মাত্রাধিক পরিমাণে অ্যাড্রেনালিন হরমোন রসক্ষরণ হতে থাকলে এই যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং এই যন্ত্রণার প্রতিরোধ করতে হলে দেহমনকে পীড়নমুক্ত করে সহজ স্বচ্ছন্দভাবে কাজ করবার পরিবেশ খুঁজে নিতে হবে।

শরীরে শর্করার অভাব ঘটলেও আধকপালে যন্ত্রণা হতে পারে। তার জন্য চকোলেট, দুধ, মাখন, লেবু এসব খেলে অনেকের ঐ যন্ত্রণার উপশম হতে দেখা যায়।

বর্তমান সমাজের কোলাহল, বদ্ধ পরিবেশ, তীব্র আলো ইত্যাদি নানা কারণেও আধকপালে যন্ত্রণা আক্রমণ করে থাকে এবং মনকে দূষিত করে দেয়। অতএব আধকপালে যন্ত্রণায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের এই সব পরিদূষিত পরিবেশ বর্জন করে চলতে হবে।

আবেশজাত অনুকর্ষী আচরণ (Obsessive-Compulsive Behaviour) :

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার চাপে একই চিন্তা বা কাজের অনিচ্ছাকৃত পুনরাবৃত্তিকে আবেশজাত অনুকর্ষী আবেশ বলা হয়। বর্তমান যুগের প্রচণ্ড পীড়নমূলক সামাজিক পরিবেশে এই ধরনের আচরণ-বিকৃতি প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। দরজায় তালা দিয়ে বারেবার টেনে দেখা, কোনও প্রশ্নের উত্তরে একই কথা বারেবার বলা—এই ধরনের আচরণের পর্যায়ে পড়ে। এই অস্বাস্থ্যকর অনুকর্ষী আচরণের ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির মনে সদাসর্বদা এক বিরক্তি জেগে থাকে এবং অকারণে **দোষী মনোভাব (guilty feeling)** সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তি এবং অস্বস্তির পরিদূষণ সহযোগীদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা (Anxiety) :

মানুষের স্বাভাবিক প্রগতির পক্ষে অল্পস্বল্প উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভাল। কারণ তার ফলে ভুলত্রুটি সম্পর্কে সচেতনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু যখন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মাত্রা অস্বাভাবিক পর্যায়ে চলে যায়, তখন তা নিঃসন্দেহে দেহমনের ক্ষতি করতে থাকে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

বর্তমান সমাজের অতৃপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অসম প্রতিযোগিতা, আর্থনীতিক অস্থিরতা, রাজনীতিক স্থিতিহীনতা এবং নানাপ্রকার পারিবেশিক অশান্তির সর্বব্যাপকতা মানুষকে যেভাবে অস্বাভাবিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অধীন করে রেখেছে, তাতে অবিরাম ভয়াবহ মানসিক পরিদূষণে সমাজের ছোট বড় প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এই ধরনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে **আতঙ্কজনিত উদ্বেগ (phobic anxiety)** বলা হয়। জীবনহানি, দুর্ঘটনা, কর্মবিচ্যুতি, সম্মানহানি প্রভৃতির আতঙ্ক থেকে যে সব উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বর্তমান সমাজ মানসিকতাকে অহরহ পরিদূষিত করছে, সেগুলির অধিকাংশই আতঙ্কজনিত উদ্বেগ, অর্থাৎ অপরিসীম ভয়-আতঙ্ক দূর করতে না পারার ফলে সদাসর্বদা গভীর অজানা উদ্বেগে মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। এই মানসিকতার ফলে অগণিত মানুষের দেহমন নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। চরম পর্যায়ে এ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে **উদ্বেগ মনোবিকলন** (anxiety neurosis), যার ফলে অতি সামান্য বিষয়ে মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে।

বৃদ্ধ বয়সে অসহায় অবস্থায় বহু মানুষও এই ধরনের আতঙ্ক-জনিত অজানা উদ্বেগে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছেন।

এছাড়া, কর্মসংস্থানহীন তরুণ সম্প্রদায়ও আজ সর্বত্র এই আতঙ্কজনিত উদ্বেগে কষ্ট পাচ্ছেন এবং তাঁদের ঐ অসুস্থ মানসিকতা বিপুল তরুণ সমাজ-মনকে গভীরভাবে পরিদূষিত করে চলেছে। এই অবিরাম আতঙ্ক উদ্বেগের ফলে বিভ্রান্ত তরুণ সম্প্রদায়ের মনে নানা প্রকার মনোবিকার প্রচ্ছন্নভাবে বাসা বাঁধছে, এবং তারই অভিপ্রকাশ ঘটছে বিক্ষুব্ধ তরুণ সমাজের অভাবনীয় ক্রিয়াকলাপে।

কর্মাসক্তি (Workaholism) :

সুরাসক্তির মত কর্মাসক্তিও এক ধরনের নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কর্মময় সমাজব্যবস্থার চাপে। আরও-আরও বেশি অর্থ উপার্জন এবং যশ প্রতিপত্তি লাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় নানাপ্রকার আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলস্বরূপ মানুষ ভারবাহী পশুর মত খেটে চলেছে—মনে করতে শিখেছে, এইভাবে উদয়াস্ত অহোরাত্র দু-তিন দফায় কাজ না করলে এ জগতে ভালভাবে বেঁচে থাকা যাবে না।

এই কর্মাসক্তির মানসিক পরিদূষণে আজ বহু মানুষই আক্রান্ত হচ্ছেন এবং তাঁরা কর্মব্যস্ততার আসক্তিকে এতখানি মর্যাদা দিয়ে থাকেন যে, অনেকে নিজের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রের বিবিধ কর্তব্য পালনেও অবহেলা করে ফেলছেন।

ব্যস্তবাগীশ শহুরে সভ্যতার এই মানসিক পরিদূষণ আজ ধীরে ধীরে গ্রামাঞ্চলের শান্ত সমাজ পরিবেশে প্রতিপালিত জনমানুষের মনকেও পরিদূষিত করে তুলেছে। গ্রামের মানুষ শহরের সদাব্যস্ত কর্মাসক্ত মানুষদের দেখে সেইরকম হবার চেষ্টা করে যাতে সবাই তাকে চটপটে বলে মর্যাদা দান করে। ফলে, গ্রামের শান্তশীতল পরিবেশেও আজ কর্মাসক্ত মানুষ তার মূল কর্তব্যে অবহেলা করে কর্মীসুলভ মর্যাদা লাভের মরীচিকাময় আসক্তির পানে ছুটে চলেছে।

গোষ্ঠী চাপ (Group Pressure) :

স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে এবং কাজ করতে আমরা সকলে ভালবাসি। কিন্তু সমাজ-মানসিক গোষ্ঠীচাপের ফলে আজকাল অনেকের ক্ষেত্রেই আরও এক ধরনের মানসিক পরিদূষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যার ফলে রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী মতবাদের চাপে বহু লোক নিজস্ব চিন্তাভঙ্গী বিকৃত করতে বাধ্য হচ্ছে। এমন অনেক পরিস্থিতিও সৃষ্টি হচ্ছে, যেখানে নিজস্ব স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা মাত্র প্রচণ্ড আগ্রাসী গোষ্ঠীচাপে দেহ-মনের ক্ষতি ও পীড়নের আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ তার চিন্তাধারা আচার-আচরণগুলিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিবর্তন করতেই চাইছে। এতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ অবশ্যই ব্যাহত হচ্ছে। তবে এ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেকের বহুমুখী বিকাশ সাধনের সর্বপ্রকার উদ্যোগের উৎসাহ দিতে হবে এবং গোষ্ঠী চাপের প্রকাশ্য নিন্দা করতে হবে।

গোষ্ঠী চাপের কাছে নতিস্বীকার না করলে মানুষ সামাজিক বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কায় প্রচ্ছন্নভাবে উদ্বিগ্ন বোধ করতে থাকে। সুতরাং গোষ্ঠীবদ্ধ থাকার সহজ সরল আকাঙ্ক্ষা যাতে তৃপ্তিলাভ করতে পারে, সেজন্য সমাজনেতাদের উচিত, অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে নানাপ্রকার স্বচ্ছন্দ গোষ্ঠীরূপ গড়ে তুলতে উৎসাহ দেওয়া। বিশেষ কোনও গোষ্ঠীবদ্ধ থাকার চাপে যেন মানুষ নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ ধরনের কোন বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত হতে বাধ্য না হয়। কারণ ঐ ধরণের বাধ্যতামূলক গোষ্ঠীবদ্ধতা মোটেই সুস্থ সামাজিক লক্ষণ নয়। ঐ গোষ্ঠীচাপ এবং বাধ্যতামূলক গোষ্ঠীবদ্ধতা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত গণতান্ত্রিক মনকে সর্বপ্রকারে পরিদূষিত করতে থাকে এবং পরিণামে গতিক্ষু সমাজ ক্রমেই অচলায়তন জনতায় পরিণত হয়। তাই হচ্ছে ইদানীংকালে বিশ্বের বহু দেশে, বহু সমাজে।

চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (Schizophrenia, সিজো-ফ্রেনিয়া) :

দুঃখ-দারিদ্র্য অশান্তি জর্জরিত সমাজের আর একটি অভিশপ্ত মানসিক পরিদূষণ হল চিত্তভ্রংশী বাতুলতা বা সিজোফ্রেনিয়া মনোরোগ, যা আজ দ্রুত ব্যাপ্ত হচ্ছে। বৃটিশ মনোগবেষক অধ্যাপক জন উইং দেখেছেন, যে-সব পরিবার পরিবেশে দৈহিক ও মানসিক পীড়নমূলক আচরণ বেশি হয়, সিজোফ্রেনিয়া মনো-রোগীরা সেখান থেকেই হাসপাতালে বেশি আসে। আমাদের দেশেও অল্প বয়স থেকে বহু ভদ্র ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এই মনোরোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সিজোফ্রেনিয়া রোগাক্রান্ত কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতীরা বাস্তব জগত থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি করে। বাস্তব জগত তাদের কাছে বিভীষিকাময় বলে মনে হয় এবং তা থেকে বাঁচবার আশায় কাল্পনিক জগতে বাস করতে চায়।

স্কটল্যাণ্ডের মনোবিদ ডঃ লেইং বলেন যে, সিজোফ্রেনিয়া হল অপ্রকৃতস্থ সমাজব্যবস্থার প্রতি সুস্থ প্রকৃতির মানুষেরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তার মানে, সমাজ-ব্যবস্থা সুস্থ হলে এবং মানসিক পরিদূষণ মুক্ত হলে, এই ধরনের পরিদূষিত মানসিকতাও হ্রাস পাবে। সমাজব্যবস্থা শোচনীয়ভাবে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ছে বলেই সমাজের প্রাথমিক পারমাণবিক ইউনিট হিসাবে প্রতিটি মানুষই স্বভাবতঃ অপ্রকৃতিস্থ প্রতীয়মান হচ্ছে। সুতরাং সর্বাগ্রে সমাজব্যবস্থার পরিদূষণ রোধ করতে হবে।

ধর্ষমর্ষকামিতা (Sadomasochism) :

সংগ্রামী সমাজে মানুষের হতাশা ব্যর্থতা বাড়ছে বলে অন্যের ওপর ব্যথা বেদনা আরোপ করেও মানুষ এক ধরনের বিকৃত তৃপ্তিবোধ লাভ করতে চাইছে ; আবার অনেকে ব্যর্থতার জর্জরিত হয়ে অন্যের দ্বারা আরও ব্যথিত হবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে। বর্তমান সমাজের সর্বত্র আজ এই বিকারগ্রস্ত মানসিকতার অবিশ্বাস্য অথচ বাস্তব পরিদূষণ ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এরই ফলে পরস্পর পরস্পরকে বিকৃত বোঝাপড়ার মাধ্যমে আঘাত দিয়ে, অপদস্থ করে, মর্যাদা হানি করেও তৃপ্তি পাচ্ছে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও চোখ খুললেই সমাজের চারিদিকে এই পরিদূষিত মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে। ধর্ষকামিতা (sadism) এবং মর্ষকামিতা (masochism) আজ আর দুটি পৃথক মানসিকতা নেই—এখন পরিদূষিত সামাজিক-মানসিক পরিস্থিতিতে এক ধর্ষকামী এবং অন্য এক মর্ষকামীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ভয়াবহভাবে ঘরে বাইরে পথে ঘাটে অষ্টপাশ মেলে দিচ্ছে।

পরিচয় জ্ঞাপনা (Labelling) ঃ

গ্রন্থাগারে, দোকানে, রান্নাঘরে লেবেল লাগিয়ে জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখার যে উপযোগিতা আছে, মানবসমাজে সেই ধরনের পরিচয়জ্ঞাপনা বা লেবেলিং-এর প্রতিক্রিয়া অন্যরকম। স্কুলে যারা পড়াশুনায় অনগ্রসর, তাদের 'সি' সেকশনে বা 'ডি' সেকশনে বসিয়ে দিয়ে যে ধরনের লেবেলিং করা হয়, তাও ক্ষতিকর। শিশুমনকে ঐ লেবেলিং ভয়াবহভাবে পরিদূষিত করে এবং সুদক্ষ শিক্ষকের পক্ষেও ঐ ধরনের হীনমন্য পরিচয়জ্ঞাপক শিশুকে উৎসাহিত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রকাশ্য সমাজে ঐভাবে ক্রমাগত পরিচায়িত হয়ে যাওয়ার ফলে কেবল শিশু কেন, অনেক বয়স্ক মানুষও বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়ে যে, তার দ্বারা আর কোনও উন্নতি করা অসম্ভব।

সুতরাং স্বাভাবিক সমাজব্যবস্থায় ছোটবড় কাউকেই বিশেষ কোনও আচরণ বৈশিষ্ট্যের বিচারে পরিচয়চিহ্নিত করে ফেলা উচিত নয়। সকলের ভালমন্দ সবকিছু মিলিয়ে সহনশীলতার মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারাটাই বাঞ্ছনীয়। নিকৃষ্টতর লেবেলিং দিলে যেমন হীনমন্যতায় সমাজ-মন পরিদূষিত হয়, তেমনি উৎকর্ষতার নির্বিচার লেবেলিং থেকে সৃষ্টি হয় অবাঞ্ছিত উচ্চ-মন্যতা।

মানসিক রোগব্যাধির চিকিৎসার জন্য অনেককে মনোরোগ হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেওয়া হয়, কিন্তু চিকিৎসার পরেও সেই সব মনোরোগীদের বৃহত্তর সমাজে পরিচয়চিহ্নিত করে রাখা হয় মনোরোগী হিসাবেই। এর ফলে, চিরকালের জন্য একটি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষকে সমাজে অস্বাভাবিক মানসিকতার পরিচয়চিহ্ন বহন করে কাটাতে হয়। এজন্যই, যথাসম্ভব ঘরোয়া পরিবেশে সামাজিক সহানুভূতির মধ্যে রেখে অসুস্থ মনোরোগীর চিকিৎসা করানোই বাঞ্ছনীয়। হাসপাতালের পরিচয় চিহ্নিত সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক মর্যাদা লাভের অসুবিধাটা বুঝতে চেষ্টা করা উচিত।

প্রতিরক্ষা অভিযন্ত্রক্রিয়া (Defence Mechanism) ঃ

আমরা বর্তমান যুগের প্রচণ্ড জটিলতার সম্মুখীন হয়ে যখন উদ্বিগ্ন বোধ করি, তখন আমরা নানাপ্রকার প্রতিরক্ষী আবরণ মনের মধ্যে সৃষ্টি করে থাকি। ফ্রয়েড একেই বলতেন প্রতিরক্ষা অভিযন্ত্র ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে আমরা সমস্যাসংকুল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে না পারার জন্য যুক্তিগ্রাহ্য অজুহাত সৃষ্টি করে মনকে মর্যাদাহানির হাত থেকে রক্ষা করে থাকি। কেউ যদি দরকারী কোন সভা-অধিবেশনে উপস্থিত হতে না পারেন, তাহলে মনে ভাবেন, ওখানে গিয়ে বাজে সময় নষ্ট হত ; প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁর অবহেলার মনোভাবকে ঐভাবে প্রতিরক্ষা করলেন।

মানসিক **অবদমন (repression)** করার অভ্যাসটিও এক ধরনের প্রতিরক্ষা অভিযন্ত্র কৌশল। সমাজে অলভ্য কোন বাসনা চরিতার্থ করতে না পারার ফলে যদি বাধ্য হয়ে অবচেতন মনের মধ্যে সেই বাসনাকে অবদমিত করে রাখতে হয়, তাহলে সেই অতৃপ্ত অবদমিত বাসনার ফলে এক ধরনের অবিরাম উদ্বেগ মনকে কষ্ট দিতে থাকে, যার কোনও ব্যাখ্যা মানুষ নিজেও দিতে পারে না।

প্রতিরক্ষা অভিযন্ত্র প্রক্রিয়ার আর একটি অস্বস্তিকর কুফল হল এই যে, অবদমিত বাসনার উদ্বেগে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে অব্যক্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে অন্য কোনও জনের ওপর। যেমন, বাড়িতে অতৃপ্ত বাসনার অশান্তিজনিত ক্ষোভ অবদমিত হয়ে পথে ঘাটে ট্রামে বাসে অফিসে সহযাত্রি-সহকর্মীদের প্রতি উদ্গারিত হয়। অথবা অফিসের কর্তার কাছে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে সেই মর্যাদালাভের বাসনা অবদমিত ক্ষোভরূপে বাড়িতে সন্তান-সন্ততি, গৃহিণীর কাছে অভিব্যক্ত হয়। ফলে, এক স্থানের মানসিক পরিদূষিত পরিবেশের কুফল এইভাবে সুদূরে সঞ্চারিত হয়।

অতৃপ্ত বাসনার প্রতিরক্ষা অভিযন্ত্র প্রক্রিয়ার ফলে অনেক মানুষ নিজের অব্যক্ত ত্রুটির **অভিক্ষেপ** (projection) ঘটায় অন্যের ওপর। বর্তমান সমাজে একজনের মানসিক পরিদূষণ এইভাবে অন্যের উপর নিয়ত সংক্রামিত হচ্ছে। যে লোক ঘুষ নেয়, কাজে ফাঁকি দেয়, সে তার নিজের দুষ্কৃতির প্রতিরক্ষী মনোভাবের বশে অন্যকে সর্বসমক্ষে ঘুষখোর, ফাঁকিবাজ রূপে প্রতিপন্ন করবার সুযোগ পেলে অব্যাহতি দেয় না। এর ফলে বহু সৎ নির্দোষ লোকের মনে, এমন কি কোমলমতি শিশুদের মনেও পরিদূষিত দুর্নীতিমূলক চিন্তার বিষবৃক্ষ নির্বিচারে রোপিত হচ্ছে।

ব্যক্তিত্ব বিকলন (Personality Disorders) ঃ

রাগ, উদ্বেগ, লজ্জা অথবা বহির্মুখিতা মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম, কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকলন ঘটলে কোনও কোনও মানুষ এই সব আচরণের তীব্রতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং চেষ্টা করলেও অবাঞ্ছিত আবেগ প্রক্ষোভ-গুলির তীব্রতা পরিবর্তন করতে পারে না। ব্যক্তিত্ব বিকলনের এই ধরনের অসহায় অবস্থায় মানুষ সদাসর্বদা ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে এবং চলতে-ফিরতে, ট্রামেবাসে উঠতে-নামতে, এমন কি সরল নির্দোষ শিশুর সঙ্গে কথা বলতে গেলেও অকারণে উগ্রতা প্রকাশ করে ফেলে।

অনেকে ব্যক্তিত্ব-বিকলনকে মানসিক অসুস্থতা বলে মনে করেন না, একে ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য বলেই ধার্য করে থাকেন। কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে, এ ধরনের ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য মানুষকে সমাজে হাস্যাস্পদ করে এবং এ থেকে অনেকের বিরক্তির সৃষ্টি হয়। সুতরাং এর ফলে মানসিক পরিদূষণ ছড়িয়ে পড়ে এবং মনে হয়, সামাজিক সহানুভূতির অভাববোধের ফলেই এই বিকলতা ঘটে।

অবশ্য, ব্যক্তিত্ব-বিকলতাকে বাতুলতা (psychosis) বলা চলে না। কারণ ব্যক্তিত্ব বিকলনপ্রাপ্ত মানুষ বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে জানেন, কিন্তু তাঁর আচরণে এমন কতকগুলি বৈসাদৃশ্য দেখা যায়, যার ফলে অন্যের বিরক্তি সৃষ্টি হয়। এগুলি সৃষ্টি হয় অবদমিত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকেই। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশার আগ্রহও কমে যায় ঐ অবদমিত উদ্বেগের প্রতিক্রিয়াতে। বাড়িতে লোকজন এলে কিংবা কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সামনে যেতে গেলে, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এই ধরনের মানুষ তাঁর ব্যক্তিত্ব-বিকলনের ফলে।

বিষঙ্গী প্রতিক্রিয়া (Dissociative Reaction) :

উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার তীব্রতায় ভরা এই সমাজের পরিদূষিত পরিবেশে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ যখন তা-এড়িয়ে চলতে চায়, তখন তার মধ্যে আবার অন্য এক মানসিক পরিদূষণ সংক্রামিত হতে থাকে—সেটি হল বিষঙ্গী প্রতিক্রিয়া। এটি কিন্তু প্রতিরক্ষী অভিবন্তক্রিয়া (ডিফেন্স্ মেকানিজ্ম্) পর্যায়ের মানসিক পরিদূষণ থেকে পৃথক ধরনের মানসিকতা, কারণ মূলতঃ উদ্বেগ-জনিত আতঙ্ক থেকে এটির উৎপত্তি হলেও, সেই প্রবুপ্ত উদ্বেগ অভিব্যক্তি হয় কোনও এক পৃথক ব্যক্তিস্বরূপের মাধ্যমে। তাই প্রতিরক্ষী অভিবন্তক্রিয়ার চেয়ে গভীরতর মানসিক পরিদূষণ ঘটলে বিষঙ্গী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, এবং তখন মানুষ দুঃসহ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার পীড়ন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য শুধু যে প্রতিরক্ষামূলক আচরণ এবং যুক্তিবিন্যাস অভ্যাসের আশ্রয় নেয়, তাই নয়—তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার প্রচণ্ড পীড়নমূলক চাপে অবচেতন মানসিকতা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়ে ব্যক্তিত্ববিকার দেখা দেয়। তখন তার আর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সচেতনতা বোধ থাকে না, কিন্তু অন্য এক ব্যক্তিত্বের অভিপ্রকাশ ফুটে ওঠে।

মানসিক ভয়াবহ পরিদূষণের ফলে আজ সর্বত্র এই যে ব্যক্তিত্ববিকার দেখা দিচ্ছে, তা সত্যিই সমাজ-শান্তির পক্ষে শোচনীয়ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।

এই বিষঙ্গী প্রতিক্রিয়া প্রধানতঃ তিনভাবে ধরা পড়ে। এক হল, **স্বপ্নচারিতা** (Somnabolism) অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে হাঁটা চলা। ঘুমের ঘোরে স্নান করতে যাওয়া, ঘড়িতে দম দেওয়া ইত্যাদি কাজ ক'রে পরের দিন আর কিন্তু সেসব কাজের কথা মনেই আনতে পারে না স্বপ্নচারী মানুষ। অথবা এই ধরনের বিষঙ্গী প্রতিক্রিয়াধীন মানুষ ঘুমের ঘোরে অনেক সময়ে গভীর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যপূর্ণ কাজও করে থাকে—যেমন, অবাঞ্ছিত স্ত্রীর ছবিটা ঘুমের ঘোরে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলা, কিন্তু পরের দিন সেই কাজের কথা আর মনে করে বলতে না পারা।

আর-একটি সাংঘাতিক ধরনের বিষঙ্গী প্রতিক্রিয়া হল **অস্মার** বা **স্মৃতিভ্রংশতা** (amnesia), যার ফলে মানুষ প্রচণ্ড উদ্বেগের অস্বাস্থ্যকর তাড়নায় সব কিছু ভুলতে থাকে, এমনকি নিজেরই নাম ঠিকানা পরিচয় মনে করতে পারে না—নিজেকে অন্য জন বলে পরিচয় দিয়েও বসে। বর্তমান সমাজের অবিরাম অসহনীয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ফলস্বরূপ ব্যাপক মানসিক পরিদূষণ কবলায়িত এধরনের স্মৃতিভ্রংশ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এবিষয়ে সতর্ক হবার সময় এসেছে।

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নকারী এই বিষঙ্গী প্রতিক্রিয়ারূপী মানসিক পরিদূষণের তৃতীয় দৃষ্টান্ত হলো—**বহুধা ব্যক্তিত্ব (multiple personality)** দীর্ঘায়িত প্রতিকারহীন উদ্বেগের তাড়নায় পরিদূষিত মানসিকতা থেকে এমন আন্তর দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যার ফলে একই মানুষের অন্য একটি, কিংবা অনেকগুলি পৃথক্ ব্যক্তিস্বরূপ অভিপ্রকাশিত হয় তার আচরণ-বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে—যে-আচরণগুলি সে অবচেতন মনে অবদমিত করে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছিল।

বিষঙ্গী প্রতিক্রিয়াজনিত এই ধরনের বহুধা ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির ফলেই আজ ভদ্রঘরের সন্তানকেও দেখা যাচ্ছে ব্যাঙ্ক ডাকাতি, রাহাজানি, এবং নানা প্রকার ঘৃণ্য দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের ভূমিকায়। তাদের ঐ সকল দুর্নীতিমূলক সমাজবিরোধী কার্য-কলাপের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পোষণ না করলেও সহৃদয় মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিবেচনায় ঐসব বহুধা ব্যক্তিত্বরূপী মানুষগুলির প্রতি সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ রেখে বলা চলে যে, নিদারুণ প্রতিকারহীন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মানসিক পরিদূষণের ফলেই তারা আজ ঐ মনোবিকারের শিকার হয়েছে।

সুতরাং এই ধরনের সুদূরপ্রসারী মানসিক পরিদূষণ থেকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের রক্ষা করতে হলে চাই যথাসম্ভব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠামুক্ত নির্মল সমাজ পরিবেশ, চাই প্রকৃত সহানুভূতিসম্পন্ন পিতামাতা অভিভাবক শিক্ষক সমাজনেতা প্রমুখ সকলেরই সস্নেহ পথপ্রদর্শন এবং অবিরাম উৎসাহ-সঞ্জীবনী, চাই আলো-কোজ্জ্বল ভবিষ্যতের সত্যকার প্রতিশ্রুতি, চাই সকল বয়সের শক্তি-সামর্থ্যের অনুপাতে আশু সাফল্য-উদ্দীপনা লাভের উপযোগী করে বিশেষজ্ঞ-প্রণীত আনন্দময় কর্মসূচী।

মগজধোলাই (Brainwashing) :

আবেগ-প্রক্ষোভের অহরহ প্রচণ্ড তাড়নায় মস্তিষ্কের শরীরগত পরিবর্তন যে সত্যিই হয়, একথা প্রথম স্বীকার করেছিলেন রাশিয়ার স্বনামধন্য স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ পাভলভ। পরবর্তীকালে বৃটিশ মনঃসমীক্ষক ডাঃ উইলিয়াম সারগান্ট-ও এর সমর্থনসূচক গবেষণা থেকে জেনেছেন যে, উত্তুঙ্গ প্রক্ষোভের পীড়ন সৃষ্টি হলে মানুষের মস্তিষ্কের চিন্তাধারা, এমনকি মতবাদও বদলে যায়।

এই মগজধোলাই মানসিক পরিদূষণ আজকাল খেলার মাঠে, রাজনৈতিক সমাবেশে, ধর্মীয় আন্দোলনে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথমে বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধবন্দীদের মতবাদ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রক্ষোভ পীড়নের মাধ্যমে নির্মমভাবে মগজধোলাই করানো হত। এখন, সকলের অজ্ঞাতে ঐ ধরনের প্রচণ্ড প্রাক্ষোভিক উত্তুঙ্গতার ঝঞ্ঝাতাড়নে খেলার মাঠের উত্তাল জনতার মগজধোলাই হয়ে যাচ্ছে, সে তো আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। রাজনৈতিক বিপুল জনসভায় উদ্বেলিত জনসমাবেশের মুহুর্মুহু শ্লোগান বিস্ফোরণে কত লোকের মস্তিষ্কের চিন্তাস্রোত যে গতিপথ বদলে ফেলছে, তার হিসাব কে রাখে!

এ সবই সুস্থ প্রশান্ত মানসিক পরিবেশের পরিপন্থী। এগুলি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ মানসিক পরিদূষণের পর্যায়ভুক্ত।

মনোশারীরিক অসুস্থতা (Psychosomatic Illness) :

অনেক সময় শারীরিক অসুস্থতার কোনও দেহগত কারণ খুঁজে না পাওয়া গেলে বিশেষজ্ঞরা বলেন, মানসিক রুগ্নতার ফলেও শারীরিক রোগের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। বর্তমান যুগের সামাজিক জটিলতার পীড়নে মানুষের নানাপ্রকার মনো-বিকার দেখা যাচ্ছে এবং তার তীব্রতা এত বেশি যে, দেহের নানাপ্রকার অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণে বিঘ্ন ঘটে থাকে। এরই পরিণামে শারীরিক রুগ্নতার লক্ষণ অভিব্যক্ত হয়।

হাঁপানী এবং আন্ত্রিক ক্ষতরোগ (পেপ্টিক আল্সার) হলে বহু চিকিৎসা করেও যখন রোগ সারে না, তখন অনেক চিকিৎসক রোগীকে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার পরামর্শ দিয়ে ছেড়ে দেন।

বিশেষ করে, **শৈশবকালীন হাঁপানী (Infantile Asthma)** প্রায় 99 শতাংশ ক্ষেত্রেই এক ধরনের মনোশারীরিক অসুস্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ছোটরা মা-বাবার আকস্মিক বকুনি ধমক তাড়না অনেকক্ষেত্রে সহ্য করতে না পেরে স্নায়বিক আক্ষেপের কবলায়িত হয়, এবং তা থেকেই জাগে শৈশবকালীন হাঁপানীর মত দুর্ভোগ। এজন্যই কোমলমতি শিশুদের আকস্মিক তাড়না করা বিশেষভাবে ক্ষতিকর, একথা মনে রাখতে হবে। কিন্তু নানাভাবে উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত সদাব্যস্ত বর্তমান যুগের অভিভাবক ও শিক্ষকগণ অসংযত ক্রোধের বশে অনেক সময়ে ছোটদের মনকে এইভাবে পরিদূষিত করে দেন, যার পরিণামে শিশু ও তার সমাজের বহু লোক দীর্ঘকাল কষ্ট পায়।

নিদারুণ উদ্বেগজনিত মানসিক পরিদূষণের ফলে যেমন আন্ত্রিক ক্ষত সৃষ্টি হয়, তেমনি মানসিক কারণে একজিমা জাতীয় আজীবন চর্মরোগের উদ্ভব হতেও দেখা যায়—বাইরে তার যতরকম চিকিৎসাই হোক, কিছুতেই রোগ সারে না।

মনোশারীরিক অসুস্থতা থেকে আধকপালে যন্ত্রণা, পৃষ্ঠবেদনা, এমন কি বাতব্যাধিও হতে পারে।

অত্যধিক ধূমপানও এক ধরনের মনোশারীরিক অসুস্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পীড়ন থেকে মুক্তি অব্যাহতি পাবার প্রয়াসেই মূলতঃ ধূমপানের আসক্তি জাগে।

মনোবিজ্ঞানী রেমণ্ড ক্যাটেল বলেন, মানসিক আবেগ-প্রক্ষোভজনিত পীড়ন থেকে যাঁরা নিজেদের অবিচলিত রাখতে পারেন, সেই সব মানুষ নিশ্চয়ই স্বনির্ভর, দৃঢ়চেতা, অন্তর্মুখী মানসিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন, কিন্তু তাঁরাই প্রক্ষোভ অবদমনের কুফল পরিণাম স্বরূপ উপরোক্ত মনোশারীরিক অসুস্থতার কবলিত হয়ে পড়েন। দুর্বলমনা কোনও মানুষ ঐ ধরনের প্রক্ষোভ অবদমন করলে মনোবিকলন ঘটতে পারে, ব্যক্তিত্ব-বিকলন সৃষ্টি হতেও পারে।

শকৃথেরাপী (ECT, Electro-Convulsive Therapy)ঃ

আজকাল মনোবিকলনের ক্ষেত্রে প্রায় সব হাসপাতালেই বৈদ্যুতিক অভিঘাত (শক্) দিয়ে মনোবিকারগ্রস্ত মানুষকে সুস্থ করে দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্বের সব দেশে বিশেষ মতানৈক্য দেখা যাচ্ছে।

মাথায় বৈদ্যুতিক তার লাগিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত-মাত্র উচ্চশক্তির-মৃদু বৈদ্যুতিক অভিঘাত পাঠালে অনেক ক্ষেত্রে নানারকম মনোবিকলতা সেরে যায়, এই ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর মনঃসমীক্ষকদের সৃষ্টি। সাধারণতঃ আট সপ্তাহ ধরে এই অভিঘাত চিকিৎসা (শকথেরাপী) চলে।

মস্তিষ্ক যে কত সূক্ষ্ম দেহযন্ত্র, তার আমরা কতটুকুই-বা জানি? এরকম রহস্যময় জটিল অমূল্য মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুতের অভিঘাত দেওয়া কি উচিত? অনেক মনোরোগী শকথেরাপীর পরে স্মৃতিশক্তিতে দুর্বল হয়ে পড়েন। সবচেয়ে বড় কথা, অভিঘাত চিকিৎসার মনোরোগীমাত্রই নিজেকে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত পর্যায়ে বিবেচনা করে থাকেন এবং জনসমাজে বিশেষভাবে পরিচয় জ্ঞাপিত (labelled) হয়ে চিরকালের জন্য অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এর ফলে, যে সমাজ-মানসিক পরিদূষণ ঘটছে, তার কথা বিবেচনা করে শকৃথেরাপীর বিকল্প স্বরূপ আধুনিক ইনসুলিন থেরাপী, গ্রুপথেরাপী, অকুপেশ্যনাল থেরাপী, প্রভৃতি প্রয়োগের সুব্যবস্থা করা উচিত। শক্-থেরাপীর কুফল সম্পর্কে সর্বাধুনিক গবেষণাদির পর্যালোচনা করে যতশীঘ্র সম্ভব সমস্ত হাসপাতালে ঊনবিংশ শতাব্দীর এই চিকিৎসা-ব্যবস্থার যথেচ্ছ প্রয়োগ বন্ধ করা উচিত।

শিখনপ্রাপ্ত অসহায়বোধ (Learned Helplessness)ঃ

মারকিন মনোবিদ মারটিন স্যালিগ্মান গবেষণার মাধ্যমে প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরিবেশের প্রতিক্রিয়াজনিত অবসাদ (reactive depression) অবিরামভাবে কোনও মানুষের ওপর পীড়ন করতে থাকলে সেরকম পরিবেশের মধ্যে সকলেই কোন-না-কোন প্রকারে অসহায়তা বোধ করতে শেখে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করতে বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারার ফলে আজ বহু মানুষ অসহায়তা বোধ করতে শিখছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করেও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে সাফল্যের উপযোগী করে নিতে পারছে না বহু মানুষ, তার ফলে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ছে। তারা নিজেদেরকে ব্যর্থতার মূর্তিমান প্রতীক বলে মনে করতে শেখে এবং উৎসাহ আগ্রহ প্রেষণাবোধ (motivation) ক্রমেই হারিয়ে ফেলে।

মনোবিদ্ স্যালিগ্মান আরও লক্ষ্য করেছেন যে, প্রচণ্ড অস্বস্তিকর শব্দের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি না পাওয়ার ফলেও এই ধরনের শিখনপ্রাপ্ত অসহায়বোধ এবং প্রতিক্রিয়াজনিত অবসাদের নিদারুণ মনোবিকার আজ সভ্যসমাজে সর্বদেশে সংক্রামিত হয়ে দুরারোগ্য ব্যাধির মাধ্যমে সমাজ-মানসিক পরিদূষণ ঘটাচ্ছে।

এরকম একটি-দুটি অসহায়তা বোধ থেকে সামগ্রিক অসহায়তা বোধ শিখছে আজকের বিপুল সমস্যাজর্জরিত জনসমাজ, এবং ব্যর্থতা ঘটবেই ভেবে নিয়ে কোনও সৎকাজে আর উদ্যোগী হতে কেউ চাইছে না। কারণ, প্রতিক্রিয়াজনিত ব্যর্থতার অবসাদে নতুন কিছু শেখবার আগ্রহ এবং উপযোগিতা-বোধ হারিয়ে ফেলছে সকলে।

এ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে হলে এমন এক সহজ স্বচ্ছন্দ পরিবেশ রচনা করে দিতে হবে, যার মধ্যে মানুষ স্বল্প আয়াসে সফল হওয়ার সার্থক আনন্দ পেতে পারে। এ দায়িত্ব রাষ্ট্র, পৌর কর্তৃপক্ষ এবং সমাজনেতাদের। কেবল জনগণের দায়িত্ব বলে ছেড়ে দিলে এই শিখনপ্রাপ্ত অসহায়তা বোধের বিভীষিকা দৈত্যরূপে ধারণ করবে একদিন। তখন শত শহস্র শ্লোগানেও আর জনগণকে উদ্দীপিত করা যাবে না। বলা বাহুল্য, একাজ প্রকৃতপক্ষে নেতাদের পক্ষে দুঃসাধ্য, কারণ এটা রাজনীতিক সমস্যা নয়—এ হল সমাজ-মানসিক সমস্যা। একাজে সমাজবিদ্ এবং মনোবিদ্দের ডাকতে হবে।

সমাজ-মানসিক পীড়ন (Stress)ঃ

অবিশ্বাস্য মনে হলেও, সামাজিক-মানসিক পীড়নমূলক পরিবেশ দূষণের ফলে জর্জরিত দেহমন নিয়ে বহু লোক আজকাল থ্রম্বোসিস, আলসার, হাঁপানী, পৃষ্ঠশূল, আধকপালে যন্ত্রণা, চর্মরোগ, এমন কি দুরারোগ্য কর্কটরোগে (ক্যানসার) আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন। ইন্সপেক্টর, কারখানা কর্মী,

জনসংযোগ কর্মী, ল্যাবরেটরী কর্মী, যন্ত্রবিদ, ধাতুকর্মী, কুলিকামিন ইত্যাদিদের মধ্যে এই মানসিক পরিদূষণ পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। বিভ্রান্ত চিকিৎসক সমাজের অনেকেই আজ একথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন।

রাষ্ট্র এবং বৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলির প্রধানগণ যেভাবে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানসিক পীড়ন প্রতিনিয়ত সহ্য করে চলেন, তার ফলে তাঁদেরও মানসিক স্বাস্থ্য ক্রমে পরিদূষিত হতে থাকে এবং কালক্রমে সেই পরিদূষিত মানসিকতার প্রভাব বিস্তারিত হয়ে পড়ে তাঁদের সংস্থার অধস্তন কর্মীদের ওপরেও। সেখান থেকে কর্মীদের পরিবারবর্গের সদস্যদের মধ্যে এবং সর্বশেষ স্তরে, সমাজের সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যে পীড়নজাত সেই অস্থির মানসিকতার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেতে থাকে। এই সামাজিক শোচনীয় সত্য আজ অনস্বীকার্য।

সবসময়ে যে ব্যবসাবাণিজ্য অফিস আদালতের দায়িত্বপূর্ণ কাজের চাপেই মানসিক পীড়ন সৃষ্টি হয়, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে, আনন্দমুখর উৎসব—যেমন, বিবাহ অনুষ্ঠান, সামাজিক সমাবেশ, প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সময়েও মানসিক পীড়ন সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের তারতম্য ঘটলেই পীড়ন সৃষ্টি হয়।

* * *

এসব নিয়ে বিস্তারিতভাবে ভাবতে বসতে হবে সমাজনেতা এবং রাষ্ট্রনেতাদের। তাঁদের সকলকে আজ অনতিবিলম্বে উপলব্ধি করতে হবেই যে, ইদানীংকালের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার মূলগত কারণ হল এই ধরনের অগণিত মানসিক পরিদূষণ প্রক্রিয়া। এ কাজে সহযোগিতা প্রয়োজন সমাজবিদ ও মনোবিদ ব্যক্তিদের ; তাঁদের পরামর্শ ও নির্দেশমত পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

পরিবেশ পরিদূষণ নিয়ে যেমন আজ বিশ্বব্যাপী দেশব্যাপী চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে, তেমনি সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে মানসিক পরিদূষণের বিষয়েও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এজন্য সর্বভারতীয় এবং রাজ্যভিত্তিক তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে উচ্চশক্তিসম্পন্ন অনুসন্ধান কমিশন নিয়োগের প্রস্তাবও বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

কলরব দূষণ

গোরাচাঁদ কুণ্ডু

সাধারণতঃ অপ্রিয় ও অবাঞ্ছিত শব্দকে কলরব হিসেবে ধরা হয়। এটি কিন্তু প্রধানতঃ অধ্যাত্মীয় (subjective)। কারণ কোন শব্দ যখন কারও কাছে বাঞ্ছিত বা প্রীতিকর, ঠিক তখনই সেই শব্দ আরেকজনের কাছে অবাঞ্ছিত বা অপ্রীতিকর অর্থাৎ কলরব (noise)। আবার যে শব্দ যার কাছে কোন এক সময় প্রীতিকর, ঠিক সেই শব্দই অন্য এক সময় তার কাছে কলরব মনে হতে পারে। এবং তা দূষণের পর্যায়ের মধ্যে পড়ে।

কলরব দূষণ যেমন যানবাহন, কলকারখানা, যন্ত্র ইত্যাদির শব্দর দ্বারা হতে পারে, তেমনি ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাও হতে পারে। যেমন, বোমা, পটকা ফাটিয়ে; বাজি পুড়িয়ে; মাইক ইত্যাদি চালিয়ে; কিম্বা অন্য কোন উপায়ে একজন ব্যক্তি কলরব দূষণের মাধ্যমে পরিবেশকে কলুষিত (দূষিত) করতে পারে।

কলরব দূষণের বিষয় নিয়ে পশ্চিমের শ্রুতিবিজ্ঞানীরা (audiologists) দেখেছেন যে, একটানা অষ্টআশি ঘণ্টা রেকর্ড করা রক-সঙ্গীত (rock music) শোনানর ফলে গিনিপিগের সমস্ত কর্ণ-কোষ (ear cell) নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় দেখা গিয়েছে যে, পঁচিশে বৈশাখ কোন ব্যক্তি আনন্দের আতি-শয্যে রুকমিনী পাণ্ডের ঘরের কাছে প্রচণ্ড জোরে বোমা ফাটায়। যার শব্দে শ্রীমতী পাণ্ডের সুস্থ ও সরল এক বছর চার মাস বয়সের পুত্র সম্পূর্ণ বধির হয়ে যায়। এতে শুধু শিশুটিরই যে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয়, তা নয়, শ্রীমতী পাণ্ডেরও মানসিক ক্ষতি হয়। তিনি পঁচিশে বৈশাখ শুনলেই আতঙ্কিত হন।

পশ্চিমে শরীরবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা ইঁদুরকে প্রচণ্ড কলরবের মধ্যে আট সপ্তাহ রেখে দেখেছেন যে, ইঁদুরের ধমনীর কঠিন হওয়ার (atherosclerosis) বৃদ্ধিকরণ এবং উচ্চতর কোলেশটেরোলের (cholesterol) মাত্রা সমেত রক্তনালী তন্ত্র (vascular system) ভাবান্তর বহুদিন ধরে চলেছে। আরো দেখেছেন যে, সমকামিতা কামবিকৃতি সমেত বহু প্রকারের মানসিক বিকলতার লক্ষণ তাদের কামজ আচরণের (sexual behaviour) মধ্যে।

কলরব দূষণ কোথাও কম, কোথাও আবার বেশি হয়। যেমন, কলকাতায় দেখা যায় যে যানবাহনের শব্দ, জনবহুল স্থানের লোকেদের কথা-বার্তার শব্দ ইত্যাদির জন্য যে স্থান স্বাভাবিকভাবেই কলরব দূষণে ভরপুর হয়ে আছে, সেখানেও দোকানী প্রচারের উদ্দেশ্যে জোরে মাইকে গান এবং / বা বাদ্য সঙ্গীত বাজাচ্ছে। এই এলাকায় কলরব দূষণ বেশী। দেখা গিয়েছে যে, এই সমস্ত এলাকায় যাঁরা থাকেন এবং / বা যাঁদের কাজের জন্য থাকতে হয়, তাদের মধ্যে আক্রমের (aggression) মাত্রা বেশি হয়। কারণ বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, বেশি হয়, তখন তা মাত্র যখন পঁচাশি ডেসিবেলের (decible) কলরব দূষণের শরীর পক্ষে হানিকর হয়। এই বিজ্ঞানীরা আরো দেখেছেন যে, প্রতি বছর কলরব দূষণ বেড়ে এক ডেসিবেল করে বাড়ছে। যার ফলে শারীরিক ব্যাধির সংখ্যাও বাড়ছে।

সাধারণতঃ শিল্পাঞ্চলে কলরব দূষণের মাত্রা একটু বেশি। কলকারখানার শ্রমিকরা একটু চিৎকার করে কথা বলেন এবং তাদের সঙ্গে যদি একটু জোরে কথা না বলা হয়, তাহলে তারা বক্তব্য সহজে ধরতে পারে না। কারণ, কলকারখানায় কলরব দূষণের জন্য এদের শ্রবণ শক্তি তেমন তীক্ষ্ণ থাকে না।

শরীরের ক্ষতিকারক নয়, এমন ধারাবাহিক কম মাত্রার কলরব দূষণের মধ্যেও যদি মানুষ থাকে তাহলেও তার অস্মিতার (personality) উপর কলরব দূষণের প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ভাবান্তর ঘটায়। পরিবেশ মনোবিজ্ঞানীদের মতে শহর, নগরবাসীদের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক যে ক্রোধপ্রবণতা দেখা যায়, তার অন্যতম কারণ হল কলরব দূষণ। শুধু তাই নয় শহর, নগরবাসীদের মধ্যে উচ্চ মানসিক চাপের প্রাধান্যের অন্যতম একটা কারণ হল কলরব দূষণ। যানবাহনের ড্রাইভার, কণ্ডাকটার ইত্যাদিরা সাধারণতঃ একটু বেশি মাত্রায় উগ্র ও কর্কশ স্বভাবের হয়। তাদের এই রূঢ় স্বভাব সৃষ্টির জন্য অন্যতম একটা কারণ হল যে, ধারাবাহিকভাবে কলরবের মধ্যে থাকা।

কলকারখানার কলরব দূষণের মাত্রা অনুপাতে বেশি হওয়ার জন্য গড়ে শ্রমিকদের মধ্যে রুক্ষতা, আক্রমণতা ইত্যাদির মাত্রা একটু বেশি দেখা যায়। কারখানায় বিভিন্ন কার্য-বিভাগে (department) কলরব দূষণের মাত্রা সমান নয়। যে কার্য-বিভাগে কলরব দূষণের মাত্রা বেশি; সেইখানকার শ্রমিকদের উগ্রতা, আক্রমতা প্রভৃতি গড় অনুপাতে বেশী হয়। যেমন, জুট মিলের সেলাই বিভাগের কর্মীদের গড় উগ্রতা, আক্রমতার তুলনায় তাঁত বিভাগের কর্মীদের গড় উগ্রতা আক্রমতা বেশি হয়। এই গড় প্রক্ষোভ (emotion) পার্থক্যকে কলরব দূষণ দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, সেলাই বিভাগের পরিবেশ কলরব

দ্বারা যতখানি দূষিত হয়, সেই অনুপাতে তাঁত বিভাগের পরিবেশ অনেক বেশী দূষিত হয় সক্রিয় তাঁতের কলরবে।

কলকারখানার কলরব কর্মীদের কাজে উদ্বুদ্ধ করে, কি করে না, তা নিয়ে পশ্চিমের পরিবেশ মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন। একদল বলেছেন যে, পরিবেশ সম্বন্ধীয় কলরব কার্য সম্পাদন ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। আরেক দল বলেছেন যে, এটির উপকারী প্রভাব আছে। এই তর্কবিতর্কের মধ্যে না গিয়ে, শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কর্ম যেখানে অত্যন্ত একঘেয়ে সেখানে কাজে উদ্বুদ্ধ করার মাত্রা হল কম, এই সব ক্ষেত্রে সহজে শোনা যায় কিন্তু আপত্তিজনক নয় এমন অনিয়মিত কলরব কর্মীদের মাঝারি ধরনের উদ্বুদ্ধ করে, ফলে কাজের উন্নতি হয়। কিন্তু ধাপে ধাপে আগাবার জন্য একাগ্রতা, বিচার ইত্যাদির আবশ্যক হয়, এই রকম দুরূহ কাজ যেখানে কর্মীকে করতে হয় সেখানে প্রথম থেকেই কর্মীর উত্তেজনা মধ্যমমাত্রায় থাকে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অনিয়মিত বা আকস্মিক কলরব কর্মীদের উত্তেজনার মাত্রাকে ভীষণভাবে বাড়িয়ে দেয়, ফলে কাজের অবনতি হয়। আরও দেখা গিয়েছে, যে একই ধরন ও মাত্রার কলরব রাত্রের কর্মীদের তুলনায় দিনের কর্মীদের কর্মক্ষমতাকে কমায়।

যেখানে উচ্চ কলরবের জন্য পরিবেশ দূষিত হয়, সেখানে কর্মীদের আরামদায়ক ইয়ারফোন ধরনের ট্রানজিস্টার রেডিও দেওয়ার পরামর্শ পরিবেশ মনোবিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। এতে শুধু যে বিরক্তিকর অথবা শ্রবণ সম্বন্ধীয় ক্ষতিকারক উদ্দীপক সমূহকে রোধ করা যায় তা নয়, সঙ্গীতাদির সুখকর এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক অনুভূতিকে প্রতিস্থাপন (replace) করা যায়। সঙ্গীতের ব্যবহার পদ্ধতি হল যে, সাদাসিধে রুটিন মাফিক কাজের ক্ষেত্রে সঙ্গীত হবে মধ্যম ভারাক্রান্ত এবং জটিল ও বিবিধ কাজের ক্ষেত্রে সঙ্গীত হল নিম্ন ভারাক্রান্ত।

কলরব দ্বারা পরিবেশ দূষিত হলে মানুষের ক্রোধপ্রবণতা (irritability), মানসিক চাপ (tension), স্নায়বিক দুর্বলতা (nervousness), উৎকণ্ঠা (anxiety) ইত্যাদি বাড়ে; বিশ্রাম ও শ্লথন (relaxation) প্রভৃতির ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং কর্মদক্ষতাকে কমায়।

স্বাভাবিক শব্দের আরম্ভ, যাকে শূন্য ডেসিবেল ধরা হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের শব্দ, যা দৈনন্দিন কাজে কর্মে মানুষকে শুনতে হয়, সেই সমস্ত শব্দের পরিমাপ সাউণ্ড লেভেল মিটার (Sound-level Meter) দিয়ে আমেরিকার ডিপার্টমেণ্ট অফ্ ট্রান্সপোর্টেশন (Department of Transportation) করেছে। যেমন, তিন ফুট দূরের মোটর গাড়ির হর্ণের শব্দ হল 110 থেকে 120 ডেসিবেল; শূন্য দশমিক পাঁচ ফিট দূরের চিৎকার 100 ডেসিবেল; পঞ্চাশ ফুট দূরের ভারী ট্রাকের শব্দ হল 90 ডেসিবেল; বাসস্থান, শোবার ঘরের শব্দ হল 40 ডেসিবেল; লাইব্রেরী, পোনের দূরের মৃদু ফিসফিসানির শব্দ হল তিরিশ (30) ডেসিবেল; বেতারকেন্দ্রের স্টুডিওর (Studio) শব্দ হল কুড়ি (20) ডেসিবেল ইত্যাদি।

শব্দের ডেসিবেলের হেরফেরের জন্য মানুষের কি প্রতিক্রিয়া হয়, তাও, সংক্ষিপ্তভাবে, এই গবেষণায় পাওয়া যায়। যেমন দশ ডেসিবেল—শ্রবণযোগ্য; তিরিশ ডেসিবেল—অত্যন্ত শান্ত; পঞ্চাশ ডেসিবেল—শান্ত; সত্তর ডেসিবেল—টেলিফোনে কথার আদান-প্রদান কষ্টকর; আশি ডেসিবেল—বিরক্তিজনক; নব্বই ডেসিবেল—অত্যন্ত বিরক্তিজনক এবং একটানা আট ঘন্টা শুনলে শ্রবণশক্তির ক্ষতি করে; একশদশ থেকে একশকুড়ির মধ্যে ডেসিবেল—সর্বোচ্চ কণ্ঠস্বর সৃষ্টির চেষ্টা করতে হয়; একশ-তিরিশ ডেসিবেল—বাক্য সম্প্রসারণ বা চিৎকারের শেষ সীমা, এবং যন্ত্রণাদায়ক চিৎকার ইত্যাদি।

মিছিল করে যাওয়ার সময় চিৎকারের শব্দের ডেসিবেল, যানবাহন, ও জনবহুল স্থানে অসংখ্য মাইকের সাহায্যে নেতাদের বক্তৃতা দেওয়ার শব্দের ডেসিবেল, যানবাহন ও জনবহুল স্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় বাদ্যযন্ত্র ও ভক্তদের চিৎকার মিশ্রিত শব্দের ডেসিবেল ইত্যাদি আমেরিকার বিজ্ঞানীদের গবেষণায় পাওয়া যায় না। কারণ আমেরিকার পরিবেশ এই রকম কলরবের দ্বারা দূষিত কখনই হয় না। কলরবের দ্বারা আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি দেশের পরিবেশ সব থেকে বেশি দূষিত হয় জেট প্লেনের শব্দ, যার ডেসিবেল হল একশ চল্লিশ বা তার বেশি।

সংখ্যায় কম হলেও কিছু ভারতীয় মনোবিজ্ঞানী নিজেদের প্রচেষ্টার পরিবেশ নিয়ে কিছু গবেষণা করেছেন, এবং সম্ভবতঃ প্রথম দেখিয়েছেন যে, কলরব দূষণের জন্য গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে ও মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে শিশু জন্মাতে পারে।

দেহের সংকোচনের ফলে দেহের চাপ জরায়ুর উপর পড়ে এবং জরায়ুও সংকুচিত হয়। জরায়ু হল গর্ভস্থ শিশুর প্রত্যক্ষ পরিবেশ। জরায়ুর সংকোচনের ফলে গর্ভস্থ শিশুর পরিবেশ যে শুধু ভারসাম্য হারায় তা নয়; গর্ভাশয়ের জলীয় পদার্থ (liquor amnion) হঠাৎ সংকুচিত হয়ে গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্কে যখন আঘাত করে, তখন শিশুটির অপরিণত মস্তিষ্ক চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং শিশুটি মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে।

আদিবাসী, অভ্যন্তরীণ পল্লীবাসী ইত্যাদিদের তুলনায় শহর, নগরবাসীদের মধ্যে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যাধিক্যের একটা কারণ হল কলরব দূষণ। শহর, নগর ইত্যাদিতে যানবাহনের সংখ্যা বেশি। গর্ভবতীরা কাজের জন্য বা অন্য কোন কারণে যখন পথে ঘাটে যাতায়াত করে, তখন অনেক সময় আচমকা মোটর গাড়ী কাছে এসে পড়ার শব্দ এবং / বা মোটর-গাড়ীর হর্ণের শব্দ খুব কাছ থেকে শোনে, ফলে তারা চমকে ওঠে এবং ভয়ের অভিঘাত (shock) পায়। এই অভিঘাতের মাত্রা যদি খুব বেশী হয় কিম্বা মাত্রা বেশী না হলেও যদি গর্ভবতীরা বার বার কয়েকটি অভিঘাতের দ্বারা আক্রান্ত হয়; তাহলে ভাবী মাতার মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম দেওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে।

ভারতবর্ষের অরণ্যের পরিবেশ সচরাচর কলরব দূষণ থেকে মুক্ত এবং শান্ত। গভীর অরণ্যের অভ্যন্তরে বন্য জীবজন্তু ও হিংস্র সরীসৃপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এখনও যে সমস্ত প্রাচীন আদিবাসী টিকে আছে, দেখা গিয়েছে যে তাদের শ্রবণশক্তি গড়ে তীক্ষ্ণ এবং দূরের অতি সূক্ষ্ম শব্দের প্রভেদ তারা অতি সহজেই ধরতে পারে। এখনও অরণ্যবাসী এমন অনেক আদিবাসী

আছে যারা বাদ্যযন্ত্র তৈরী করতে জানে না। এ সমস্ত ক্ষেত্রে আদিবাসীদের সমবেত কণ্ঠসঙ্গীতের জন্য অরণ্যের শব্দর ডেসিবেল সাময়িকভাবে বাড়ে কিন্তু তা কলরবের পর্যায়ে পৌঁছায় না। যেমন, আন্দামানের ওঙ্গী আদিবাসী।

আন্দামানেরই আরেকটি প্রাচীন আদিবাসী "আন্দামানীজ", যারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে (বর্তমানে এদের সংখ্যা হল চব্বিশ জন), তাদের মধ্যেও বাদ্যযন্ত্র নেই। কিন্তু সমবেত গানের সময় উত্তেজনাকে বাড়াবার জন্য এবং "পুকুতা যেমঙ্গ" (Pukuta Yemnga) বাজায়। এটি হল চাল আকৃতির (shield-shaped) একটি কাঠের টুকরা, যার সংকীর্ণ দিকটা মাটির উপর রেখে তার উপর লাথি মেরে আন্দামানীজরা শব্দ করে। এতেও অরণ্যের শব্দর ডেসিবেল বাড়ে, তবে তা কলরবের পর্যায় পৌঁছায় না।

মধ্যপ্রদেশের সাতপুড়া পাহাড়ের গভীর অরণ্যের অভ্যন্তরে বাইগাচকের ভূমিয়া বাইগা আদিবাসীরা ওঙ্গীজের মত অত আদিম ভাবাপন্ন নয়। সংখ্যায় অল্প হলেও নানা বাদ্যযন্ত্র দিয়ে শব্দর হেরফের করতে এরা জানে যেমন, তেমনি প্রয়োজন হলে চিৎকার, বাদ্যযন্ত্রর শব্দ ইত্যাদি দিয়ে পরিবেশকে কলরবে ভরিয়ে দিতে পারে।

যেমন রাত্রের অন্ধকারে ধুনির মিটমিটে আলোয় ছন্দ, তাল ইত্যাদি বজায় রেখে মাদল বাজিয়ে ভূমিয়া বাইগারা নাচগান করে। কিন্তু বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় উচ্চ শব্দর প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে, তাই তারা জোড় কাঠিতে কাড়া নাকাড়া বাজায় শব্দর মাত্রা বাড়াবার জন্য। আবার শিকার করতে এরা দলবদ্ধ হয়ে যায় এবং সকলের প্রচণ্ড চিৎকার, কাড়া-নাকাড়া মাদল ইত্যাদির শব্দ এক সঙ্গে করে অরণ্যের শান্ত পরিবেশকে কলরব দূষণে ভরিয়ে দেয়। বন্য জন্তুরা "হাঁকার" ভয় পেয়ে গোপন আশ্রয় ছেড়ে কলরব দূষণের বাইরে যাবার জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটতে থাকে।

কিভাবে এবং কোন কোন বাদ্য যন্ত্রর শব্দ দিয়ে মানুষের মনে ভয়, ঘৃণা, করুণা, ঈর্ষা ইত্যাদি প্রক্ষোভ (emotion), কামজ আবেগ, আক্রমণপ্রবণতা প্রভৃতিকে সৃষ্টি করা যায়, তা সভ্য সমাজের লোকেরা ভালভাবে জানে। এই কারণেই চলচ্চিত্র, নাটক ইত্যাদিতে আবহসঙ্গীত ব্যবহার করা হয়।

যেমন, "পথের পাঁচালী"তে দুর্গার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর হরিহর যখন শোকে আর্তনাদ করে, তখন দর্শকদের মনে করুণ রস সৃষ্টি করার জন্য সত্যজিৎ রায় আবহ সঙ্গীত হিসেবে শুধুমাত্র "তারসানাই"এর শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আবার কলরব দূষণ মানুষের মনে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে এটা সকলেরই জানা; তাহলেও কোন ধরনের কলরব দূষণ, কখন, কি ভাবে আবহ শব্দ হিসেবে ব্যবহার করে দর্শকদের মনেও যন্ত্রণাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তা অনেকে জানে না। যারা জানে, তারা হয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক। যেমন, "প্রতিদ্বন্দ্বী" ছবিতে উঁচু বাড়ীর ছাদের উপর নায়িকা যখন নায়ককে বলে যে, তার বাবা মাসীমাকে বিয়ে করছে, তখন নায়িকার মনের যে ঘৃণা প্রকাশ হয়, সেই ঘৃণা দর্শকদের মনেও সৃষ্টি করার জন্য, সত্যজিৎ রায় ময়দানে অসংখ্য মাইকে নেতার বক্তৃতা প্রচারের জন্য কলরব দূষণকে আবহশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

কলরব দূষণকে মানুষ যেমন ঘৃণা করে, তেমনি তাতে যন্ত্রণাও অনুভব করে।

নগর, শহর, শহরতলী ইত্যাদির তুলনায় পল্লীগ্রামের পরিবেশে শব্দের মাত্রা অনেক কম। স্বাভাবিক কারণেই এখানকার গৃহের পরিবেশের শব্দের মাত্রা কম। নির্ধারিত দৈনিক কাজের সময় পল্লীবাসীরা থেমে থেমে গুনগুন করে গান করে। ফলে পরিবেশের শব্দমাত্রার হেরফের হয়। দেখা গিয়েছে যে, পরিবেশে অনিয়মিত শব্দমাত্রার অদলবদল পল্লীবাসীদের কার্য-ক্ষমতাকে বাড়ায়। এবং তাদের মনের প্রফুল্লতাকেও বজায় রাখতে সাহায্য করে।

গুনগুন করে গান করা এবং / বা সুর ভাঁজার অভ্যাস শহর ও শিক্ষিত সমাজের লোকেদের মধ্যে প্রায় উঠে গিয়েছে। তার বদলে এসেছে টেপ রেকর্ডার, লঙপ্লেয়ার ইত্যাদি, যা বাজিয়ে গৃহের পরিবেশে শব্দর মাত্রাকে স্বাভাবিকের থেকে বাড়ান হয়।

কলরব দূষণ হিস্টেরিক শ্রবণ দুর্বল (loss of hearing) ঘটাতে পারে। বিশেষ কিছু শব্দ এরা শোনে না, কিন্তু অন্যান্য শব্দের পূর্ণ অনুভূতি এদের থাকে। যথার্থ শ্রবণ দুর্বলদের সমস্ত শব্দর অনুভূতি কম থাকে অথবা সম্পূর্ণ শোনে না।

হিস্টেরিক ব্যাধি হল ঘাত (trauma), যা হল মানসিক অথবা প্রক্ষোভ ঘটিত চাপ, অথবা দৈহিক আঘাতের ফলে মনস্তাত্ত্বিক বা আচরণগত পীড়া, কলরব শুধু শরীরকে আঘাত করে না, প্রক্ষোভ এবং / বা মনকেও আঘাত করে। যার ফলে শহর, নগর, শহরতলী ইত্যাদির বাসিন্দাদের মধ্যে হিস্টেরিক ব্যাধি, মানসিক রোগ ইত্যাদির সংখ্যা বেশি।

আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এণ্ড ওয়েলফেয়ার (Department of Health and Welfare) গবেষণা করে দেখেছে যে, আমেরিকার সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা দু'শতাংশ মানসিক রোগে আক্রান্ত, কিন্তু ঘনীভূত ভাবে বসবাসকারী সভ্য জনগণের মধ্যে (concentrated urban populations) মোটামুটি হিসেবে শতকরা দশ জন মানসিক রোগে আক্রান্ত। এই পার্থক্যের অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হয় কলরব দূষণ, যা সভ্য সমাজের পরিবেশকে অহরহ দূষিত করছে। ভারতবর্ষের মানসিক রোগের সঠিক পরিসংখ্যা এখনও জানা নেই।

পরিবেশ যখন ভীষণভাবে ভারাক্রান্ত হয়, তখন উত্তেজনার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লোকে কিছু নির্দিষ্ট উদ্দীপকের (Stimulus) প্রতি মনোযোগ দেয়। যেমন, রেলগাড়ী যখন প্রচণ্ডভাবে পরিবেশকে কলরবে দূষিত করে চলে, তখন প্রায়ই রেলযাত্রীরা কলরবের দূষিত প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বই পড়ে, বা পাশের লোকের সঙ্গে গল্প করে, কিংবা তাস খেলে, অথবা ঘুমায়, নতুবা মনে মনে চিন্তায় বিভোর হয়।

যাদের শ্রবণ সম্বন্ধীয় প্রণালী (auditory system) উচ্চমানের, তাদের অনেকে দৃশ্য উদ্দীপককে (visual stimuli) রূপান্তরিত করে পরিচিত কোন শব্দর মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। যেমন—হিন্দী চলচ্চিত্র "জংলী"র নায়কের অবিন্যস্ত আচার আচরণকে প্রকাশ করার জন্য নায়কের মুখে গানের সময় সঙ্গীত পরিচালক গানের মাঝে "ইয়া-হু" প্রচণ্ড চিৎকার যা কলরব দূষণের পর্যায়ে পড়ে, তা করেছিলেন। তবু গানটি অসম্ভব জন-

প্রিয় হয়েছিল। কারণ, পরিচিত শ্রেণীর প্রচণ্ড ও অদ্ভুত উদ্দীপকের মিশ্রণ করালে পরিবেশের ভার অনেক সময় কমে।

কিছু "চিত্তভ্রংশী বাতুল" (Schizophrenics) মানসিক রোগীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ধরনের সরল আচরণ করে নিজেদের বাধ্যতামূলকভাবে কাজে ব্যস্ত রাখতে দেখা যায়। এর কারণ হল যে, শারীরিক গঠন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিক্রিয়ার জন্য এই সমস্ত রোগী অসহ্য উচ্চমানের উত্তেজনা অনুভব করে এবং অত্যন্ত পরিচিত, চরম সংগঠনরীতি, এবং ভীষণ বিরক্তিকর কাজের মধ্য দিয়ে তারা উত্তেজনার মাত্রাকে কমাবার পন্থা আবিষ্কার করে। এতে বাধা দিলেই তারা ক্ষিপ্ত হয়; কারণ অন্যের সুবিধা অসুবিধার বিষয় বোঝবার ক্ষমতা এদের থাকে না।

যেমন—কলকাতার একজন কিশোর চিত্তভ্রংশী বাতুল দিনে একটা করে রেকর্ড কেনে এবং সেই রেকর্ড অবিচ্ছিন্নভাবে দিন-রাত বাজায়। পর দিন সকালেই তার চাই নতুন রেকর্ড। রেকর্ড কেনার টাকা না পেলেই সে মারধোর করে; জিনিষপত্র ইত্যাদি ভাঙ্গে।

তাছাড়াও ধারাবাহিকভাবে গৃহের পরিবেশ দূষিত হলে, পরিবারের অন্যান্যদের কারো মানসিক ভারসাম্য হারাবার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। ধারাবাহিকভাবে গৃহের পরিবেশ কলরবে দূষিত হওয়ার জন্য ঐ কিশোরটির পিতা-মাতার মানসিক ভারসাম্যর কিছুটা অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

রেকর্ড-প্লেয়ার, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদি অতিরিক্ত বাজিয়ে যে সমস্ত গৃহে পরিবেশকে কলরবে দূষিত করা হয়, সেই সমস্ত গৃহের শিশুদের ব্যক্তিত্বের ক্ষতি হতে পারে।

যেমন বেসরকারী অফিসের কভেটেড অফিসার শ্রীমিত্র অফিসের দেওয়া বাড়ি পাওয়ার পর স্ত্রী ও চার মাসের কন্যা সবিতাকে নিয়ে ভবানীপুরের যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি স্থান নিউ আলিপুরের বাড়িতে চলে যান। গৃহের নিত্যকর্ম করবার সময় এবং অন্যান্য সময়ও গৃহের পরিবেশকে সুমধুর রাখা, এই যুক্তিতে এঁরা মধ্যম স্তরে ধারাবাহিকভাবে টেপ রেকর্ডার চালাতেন। সবিতার যখন ন'মাস বয়স তখন মিত্র পরিবার লক্ষ্য করেন যে, সবিতা ভীষণভাবে মাঝের আঙ্গুল দুটি চোষে, ঐ আঙ্গুল দুটি যথেষ্ট সরু এবং দাঁতের আঘাতে আঙ্গুল থেকে রক্ত বার হয়, সবিতা যন্ত্রণায় কাঁদে তবু তার আঙ্গুল চোষাকে বন্ধ করা যায় না। শিশু বিশেষজ্ঞ মনোচিকিৎসক (Psychiatrist) ইত্যাদিদের পরামর্শ মত ঔষধাদি দিয়ে ও নানাভাবে আট মাস চলেও সবিতার আঙ্গুল চোষাকে বন্ধ করতে না পারায় মিত্র দম্পতি লেখকের কাছে আসেন। নিউ আলিপুরের গৃহের পরিবেশ এবং সবিতার আঙ্গুল চোষবার খুঁটিনাটি বিষয় কয়েকদিন পরীক্ষা করার পর টেপ-রেকর্ডার ও রেকর্ড-প্লেয়ার গৃহ থেকে সরিয়ে ভবানীপুরের বাড়িতে রাখা হয়। দেখা যায়, মাত্র তিন দিনের মধ্যেই সবিতার আঙ্গুল চোষা বন্ধ হয়ে যায়। কোন প্রকারের ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। শুধু মাত্র কলরব দূষণ বন্ধ করার জন্যই বাদ্যযন্ত্র দুটিকে সরান হয়নি; ঐ যন্ত্র দুটির সঙ্গে সবিতার এমনই একটা নাস্তিবাচক সাপেক্ষ (negative condition) স্থাপিত হয়েছিল যে, কোন একটাকে নিস্তব্ধ অবস্থায় দেখলেও সে আঙ্গুল চুষতো। সবিতার বয়স এখন আট বছর। এখনও সে ঐ বাদ্য যন্ত্র দুটিকে তেমন সহ্য করতে পারে না। বলে, "ও দুট ষাঁড়ের মত গাঁক গাঁক করে শব্দ করে।" শৈশবের স্মৃতি অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান (unconscious mind) সঞ্চিত থাকে এবং "সু" বা "কু" ফল সারা জীবন ধরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে শিশুদের লেখাপড়ার উপর কলরব দূষণের কি প্রভাব, তা জানার জন্য গ্লাস ও সিঙ্গার আমেরিকায় যানবাহন ও জনবহুল স্থানের শিশুদের উপর গবেষণায় করে দেখেছেন যে, বত্রিশ তলা বাড়ির নীচের তলার শিশু বাসিন্দাদের তুলনায় তলা যত উপরে হয়, শিশু বাসিন্দাদের পরীক্ষার ফলও তত ভাল হয়। এই গবেষণায় আরো দেখা গিয়েছে যে, এই বাড়িতে যে সমস্ত শিশু চার বছরের বেশি আছে তাদের তুলনায় চার বছরের কম শিশু বাসিন্দাদের পড়ার ফল ভাল। যা প্রমাণ করছে যে কলরব দূষণের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী (long-term) ও অন্তর্দর্শী (subtle)।

পল্লীগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান (social intercourse) বেশি; নগর, শহর ইত্যাদি বাসিন্দাদের মধ্যে তা যথেষ্ট কম। আমেরিকার গবেষণায় প্রমাণিত যে, কলরব দূষণের মধ্যে যারা থাকে তাদের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান কম হয়। নাগরিকদের যৌথ অধিকার বা ভোগ-বোধের (community sense) অভাবও বেশি।

কলকাতায় স্কুল, কলেজ, অফিস ইত্যাদিতে যে সমস্ত মহিলারা চাকুরী করেন অথবা অন্যান্য কারণে গৃহের বাহিরে ধারাবাহিক কলরবের মধ্যে বেশি থাকেন, তাদের একটা বড় অংশ কামশীতল (frigid) হয়। এই সমস্ত মহিলাদের অধিকাংশই বলেছেন যে, সারাদিন চিৎকারের মধ্যে থেকে এবং / বা চিৎকার করে তাঁরা অত্যন্ত ক্লান্ত থাকেন, তারপর তাঁদের আর কিছু ভাল লাগে না। অর্থাৎ কলরব দূষণ তাদের উত্তেজনাকে বাড়ায়, ফলে আক্রমের (aggression) মাত্রা এদের মধ্যে বাড়ে। আক্রম নারীদের কামাবেগকে হ্রাস করে, কিন্তু তা পুরুষের কামাবেগকে বাড়ায়। কলরব দূষণ পুরুষের আক্রমের মাত্রাকেও বাড়ায়।

নারীর কামশীতলতা দাম্পত্য জীবনের অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য ক্রিয়া সম্পাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বনিবনার অভাব দেখা দেয়। কিন্তু কেন এটা হয়, তার সঠিক কারণ দম্পতিরা বুঝতে পারে না। বনিবনার অভাবের জন্যই নগর, শহর ইত্যাদির শিক্ষিত সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়ছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হল কলরব দূষণ।

কলরবের ভিতর থাকতে যারা অভ্যস্ত হয়, তাদের কলরব থেকে দূরে সরালে মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাই এদের অনেকে কল-কারখানা, অফিস, আদালত, কলেজ, স্কুল ইত্যাদি কলরবমুখর স্থান থেকে ফিরে গৃহের পরিবেশের কিছুটা কলরবে ভারাক্রান্ত করার জন্য টেপরেকর্ডার, রেকর্ড-প্লেয়ার বা রেডিও, টিভি ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে চালান। এই অভ্যাস হল মাতালের খোয়ারি ভাঙার মত।

একই কারণে সবিতার বাবা মা, ভবানীপুরের কলরব মুখর স্থান থেকে যখন কিছুটা নিরিবিলি নিউ আলিপুরের বাড়িতে যান, তখন গৃহের পরিবেশকে সুমধুর শব্দে ভরে রাখার যুক্তিতে

অহরহ টেপ-রেকর্ডার বা রেকর্ড-প্লেয়ার চালাতেন। কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারানোর জন্য এটা করতেন।

শান্ত ও দূষণ মুক্ত পরিবেশে বসবাস করার অধিকার হল মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। মানুষের এই অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং নাগরিকদের নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর উৎপাদনক্ষম (productive) ইত্যাদির অধিকার দেওয়া এবং রুচিজ্ঞানসম্পন্ন বিষয়ক (aesthetically) ও সংস্কৃতি বিষয়ক (culturally) সুখকর পরিবেশ যাতে সংকুচিত না হয়, তা রক্ষার জন্য আমেরিকা "দি নয়েজ কন্ট্রোল অ্যাক্ট অব 1972" (The Noise Control Act of 1972) চালু করেছে।

কানাডা সরকারের নিয়ম অনুসারে রেডিও, টিভি, টেপরেকর্ডার ইত্যাদির শব্দ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে পাশের বাড়ি, ফ্ল্যাট বা এপার্টমেন্টের বাসিন্দাদের কোন অসুবিধা না হয়। গৃহ-পালিত কুকুরও যাতে চিৎকার করে কারো অসুবিধা না করে তার ব্যবস্থাও কুকুরের প্রভুকে করতে হবে। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে পুলিশ বা কর্পোরেশনের কর্মী প্রথমে গৃহকর্তাকে সতর্ক করে দেবে। তাতেও যদি গৃহকর্তা সাবধান না হয়, তাহলে সরকারের দেওয়া ক্ষমতা অনুসারে পুলিশ এবং / বা কর্পোরেশনের কর্মীরা শব্দ সৃষ্টির বস্তু বা জন্তুকে বাজেয়াপ্ত করতে পারে, কিম্বা জরিমানা করতে পারে অথবা দুই শাস্তিই এক সঙ্গে দিতে পারে। শহরের মধ্য দিয়ে এবং শহর ও শহরতলীর মধ্যে যে সমস্ত ট্রেন চলাচল করে তার ইঞ্জিনে বাঁশী বাজে না, ঘণ্টা বাজে। কলকাতার ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ীতে যে রকম ঘণ্টা বাজে, প্রায় সেই রকম।

জাপান ও হল্যাণ্ড বিমানবন্দরে বিমানের শব্দ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খাজনা বসিয়েছে। নেদারল্যাণ্ডে রাজপথের যানবাহনের শব্দ নিয়ন্ত্রণ করে কলরব দূষণ কমাবার জন্য "কলরব খাজনা" বসিয়েছে।

গাড়ীর শব্দ কমাবার জন্য বৃটেনের ইঞ্জিনিয়ররা আচ্ছাদন করা এয়ার কমপ্রেসার (muffled air compressor) আবিষ্কার করেছেন। যার ব্যবহারে পঁচিশ ফুট দূরের শব্দকে ছিআশি ডেসিবেল থেকে কমিয়ে উনসত্তর ডেসিবেলে আনা সম্ভব হয়েছে।

সাবমেরিন প্রায় নিঃশব্দে চলে। আমেরিকার সামরিক বাহিনী এমন এক ধরনের বিমান আবিষ্কার করেছে, যা প্রায় নিঃশব্দে চলে। অর্থাৎ চেষ্টা করলে কলরব দূষণকে কিছুটা কমান যায়।

ভারতবর্ষের মোটর গাড়ীর কারখানা বৃটেনে আবিষ্কৃত এয়ার কম্প্রেসার বা ঐ ধরনের অন্য কোন যন্ত্র আবিষ্কার করে গাড়ীতে লাগিয়ে কলকাতার কলরব দূষণকে কমাতে সাহায্য করতে পারে। শহর ও শহরতলীর মধ্যে যে সমস্ত ট্রেন যাতায়াত করে তাতে পিলে চমকানো বাঁশীর বদলে ঘণ্টা ব্যবহার করে কলরব দূষণকে কমাতে রেল দপ্তর সাহায্য করতে পারে। চক্ররেল প্রায় কলকাতার মধ্য দিয়েই চলাচল করবে, তাতেও যাতে ঘণ্টা ব্যবহার করা হয়, তার ব্যবস্থা রেল দপ্তরে এখন থেকে নেওয়া যেতে পারে।

মাইকের সাহায্যে যানবাহন ও জনবহুল স্থানে বক্তৃতা দেওয়া, প্রচার করা কিম্বা জনমত তৈরীর ব্যবস্থা বন্ধ করে পরিবেশকে কলরব দূষণ থেকে শুধু যথেষ্ট মুক্ত করা যাবে তা নয়, মানুষের শরীর ও মনের ক্ষতির পরিমাণকেও কমান যাবে।

হিন্দুদের কোন দেবতা বা দেবীর পূজার সময় কোন বাদ্যযন্ত্র বাজান যাবে এবং যাবে না, তা হিন্দু শাস্ত্রে দেওয়া আছে। যেমন দুর্গা পূজায় কোন রকম বাঁশী বাজান নিষেধ। কিন্তু ইদানীং যথেচ্ছভাবে মাইক, ব্যাণ্ড ইত্যাদিতে বিবিধ বাঁশী বাজান হয়। দেব ও দেবীর জন্য নির্দিষ্ট বাদ্যযন্ত্র এবং সেই সমস্ত বাদ্য-যন্ত্রর সংখ্যার সীমা নির্ধারিত করে যদি কোন আইন চালু করা হয়, তাহলে তা কোন মতেই হিন্দু ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না। শনি, মনসা, শীতলা ইত্যাদি দেব ও দেবীর পূজার সময় এই নিয়মকে প্রবলভাবে মানা হয়। কারণ, এই সমস্ত দেব ও দেবীর সম্বন্ধে মানুষের মনে কিছুটা ভয় আছে। কিন্তু যে সমস্ত দেব ও দেবীর সম্বন্ধে ভয় কম থাকে, সেখানেই পূজার নিয়ম না মেনে বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশকে কলরব দূষণে ভরিয়ে দেওয়া হয়। বাদ্যযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কলরব দূষণকে যথেষ্ট কমান যায়।

জল, বায়ু, মৃত্তিকা ইত্যাদি দূষণের মত কলরব দূষণও হল সভ্য নাগরিকদের সমস্যা। এই কারনেই আমেরিকা, বৃটেন, জাপান, হল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড ও অন্যান্য উন্নত দেশ, যতটা সম্ভব, সভ্য নাগরিকদের মৌলিক অধিকার—শান্ত, নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর, রুচিজ্ঞানসম্পন্ন ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ইত্যাদি সুখকর পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে এবং / বা নিচ্ছে ; প্রয়োজন বোধে আইনও চালু করছে। ভারতবর্ষের সভ্য নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা সকলে মিলে করলে ক্ষতি কি ?

শিল্পজাত দূষণ

দিলীপ বসু

দূষণ আধুনিক সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। বিজ্ঞানী ওডামের কথায়, "আমাদের পরিবেশের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের যে পরিবর্তনের ফলে জীব ও উদ্ভিদ জগতের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাকেই দূষণ বলা হয়।" সভ্যতার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প, যানবাহন ও জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তনের ফলে দূষণের উদ্ভব। পরিবেশ দূষণের যে সমস্ত কারণগুলো আছে তার মধ্যে শিল্পায়নই হ'ল সর্বপ্রধান। শিল্পবিপ্লবের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছিল অবশ্যই। কিন্তু সেই সঙ্গেই মানব সমাজের ধ্বংসের বীজও প্রোথিত হয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সাথে সাথে সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করছে। এ সমস্যা শুধু শহর বা শিল্পাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়—এ সমস্যা থেকে গ্রামাঞ্চলেরও অব্যাহতি নেই। এ সমস্যা শুধুমাত্র শিল্পোন্নত দেশের সমস্যাই নয়—এ সমস্যা থেকে জনবিরল গ্রীনল্যাণ্ডও মুক্ত নয়।

শিল্পসংস্থাগুলি থেকে উদ্ভূত দূষণকে আমরা সাধারণভাবে চারটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করতে পারি ঃ

(ক) বায়ুদূষণ

(খ) জলদূষণ

(গ) শব্দদূষণ

এবং (ঘ) তাপদূষণ।

[তবে এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে অন্যান্য ভাবেও বায়ুদূষণ, জলদূষণ, শব্দদূষণ ও তাপদূষণ হয়ে থাকে। কিন্তু সেগুলি এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। কেবলমাত্র শিল্পজাত বিভিন্ন দূষণ নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধ সীমায়িত।]

বায়ুদূষণ ঃ

স্বাভাবিক শুষ্ক বাতাসে আয়তনগত অনুপাতে নাইট্রোজেন 78%, অক্সিজেন 21%, কার্বন-ডাই-অক্সাইড 0·03%, অন্যান্য গ্যাস 0·07% পরিমাণে থাকে। এই অবস্থার পরিবর্তন হলে অর্থাৎ অক্সিজেনের পরিমাণ যদি কমে যায়, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যদি বেড়ে যায়, এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস যেমন কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন, মিথেন ইত্যাদি যদি বাতাসে উপস্থিত থাকে, তাহলে আমরা তাকে দূষিত বাতাস বলে থাকি। উপরোক্ত গ্যাসীয় পদার্থসমূহ ছাড়া বাতাসে ভাসমান অতিক্ষুদ্র বস্তুকণাসমূহও বায়ুদূষণের কারণ হতে পারে। বাতাসে যত দূষক পদার্থ থাকে তার শতকরা 30 থেকে 45 ভাগ হ'ল এই ভাসমান কণিকাসমূহ। এদের পরিমাপ সাধারণতঃ 5 মাইক্রনের (1 মাইক্রন হ'ল 1 মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ) কম হয়ে থাকে। কার্বনব্ল্যাক (গ্রাফাইট), সিমেন্ট, সুতা, পাট ইত্যাদি শিল্পসংস্থাসমূহে অথবা তাদের প্রতিবেশে বস্তুকণা দূষণ পরিলক্ষিত হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এতে আছে সিলিকন, কার্বন, ক্যালসিয়াম, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, সীসা, জিঙ্ক, কপার, তুলাতন্তু, পাটতন্তু ইত্যাদি। এই সমস্ত পদার্থ শুধুমাত্র প্রশ্বাসের সাথে মানুষের ফুসফুসে প্রবেশ করে নানা ধরনের জটিল রোগের সৃষ্টি করে তাই নয়, জীবজগত ও উদ্ভিদ জগতের অন্য অংশের উপরেও এর ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়।

রাসায়নিক, বিদ্যুৎ ও ধাতু ইত্যাদি বৃহৎ শিল্পে জ্বালানী হিসাবে কয়লা ব্যবহৃত হয়। কয়লা হ'ল বায়ুদূষণের একক প্রধানতম উপকরণ। কয়লার গঠনের ওপর নির্ভর করে দহনের ফলে কি কি গ্যাস উৎপন্ন হবে। কয়লার মধ্যে সিংহভাগ থাকে কার্বন কিন্তু সালফার এবং অন্যান্য মৌলও অল্প পরিমাণে থাকে। কার্বনকে বাতাসে দহন করলে পরিপূর্ণ দহনের (complete combustion) ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড বিষাক্ত গ্যাস নয়। কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমান বৃদ্ধি হলে বাতাসের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। কার্বনের দহন যদি কোন কারণে অপরিপূর্ণ থাকে (incomplete combustion), কার্বন ডাই-অক্সাইড না হয়ে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস কিন্তু ক্ষতিকারক এবং মারাত্মকও হতে পারে।

সালফার সাধারণতঃ কয়লার মধ্যে সালফাইড ও সালফেট যৌগ হিসাবে থাকে। সালফার বায়ুদূষণের আর একটি প্রধান উপকরণ। ভারতীয় জ্বালানী কয়লায় 2-3% পর্যন্ত সালফার থাকে। দহনের ফলে সালফার ডাই-অক্সাইড ও সালফার ট্রাই-অক্সাইড উৎপাদিত হয়। সালফারের উভয় অক্সাইড অতি তীব্র বায়ুদূষক। ভারতের জাতীয় পরিবেশ প্রযুক্তি গবেষণা সংস্থার

(NEERI) এক সমীক্ষায় আমাদের দেশে সালফার অক্সাইডের বিভিন্ন উৎসের একটা চিত্র আমরা পাই

উৎস	সালফার অক্সাইড (মিলিয়ন পাউণ্ড)
(১) কয়লার দহন	3040·00
(২) তামা শিল্প	20·58
(৩) দস্তা শিল্প	41·42
(৪) সালফিউরিক এসিড উৎপাদন	98·21
(৫) মণ্ড ও কাগজ শিল্প	8·12

বোম্বাই, কলকাতা, আমেদাবাদ, কানপুর, দুর্গাপুর, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ, পুণা, বাঙ্গালোর ইত্যাদি শিল্পশহরগুলিতে বাতাসে সালফার অক্সাইডের পরিমাণ মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ভয়াবহ ভাবে বেড়ে গেছে।

কয়লার দহন ছাড়াও বিভিন্ন ধাতুশিল্প ও রাসায়নিক শিল্পে নির্গত অবাঞ্ছিত গ্যাসসমূহও দূষণে সহায়তা করে। এই সমস্ত গ্যাসের মধ্যে নাইট্রাস অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন-সালফাইড, কার্বন ডাই-সালফাইড ইত্যাদি গ্যাস আছে। শিল্পাঞ্চলে উৎপন্ন এই সমস্ত দূষিত গ্যাস বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সুইডেনের গ্রামাঞ্চলের বাতাসের ওপর এক গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে শিল্পসমৃদ্ধ ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর রূঢ় (ruhr) উপত্যকা থেকে দূষকসমূহ বায়ুবাহিত হয়ে সুইডেনের গ্রামাঞ্চলের আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হ্যানোভারে অবস্থিত কোল্ড রিজিয়ন্স রিসার্চ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লেবরেটারির এক রিপোর্টে জানা যায় যে গ্রীনল্যাণ্ডে 1950 এর দশকে জমা বরফের স্তরে 1850 এর দশকে জমা বরফের স্তর অপেক্ষা 10 গুণ বেশী সীসা, 5 গুণ বেশী সালফেট ইত্যাদি পাওয়া গেছে। গবেষকেরা বলেছেন যে এই ধরনের পরিবর্তনের জন্য দায়ী উত্তর গোলার্ধের শিল্পায়ন। লীডস্, ম্যাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল, ব্রাডফোর্ড হ'ল মধ্য ইংলণ্ডের প্রধান শিল্পাঞ্চল। এই শহরগুলির অধিকাংশ পুরানো বাড়ীর রং কালো। এটা বায়ুদূষণের ফল। তাজমহলের সৌন্দর্য সংরক্ষণে এই সমস্যাই দেখা দিয়েছে। মথুরায় অবস্থিত রিফাইনারি ও সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি থেকে উদ্ভূত দূষণই এর কারণ।

বায়ুদূষণের আর একটি ভয়াবহ ফল হ'ল অম্লবৃষ্টিপাত। বায়ুতে উপস্থিত কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড বৃষ্টির জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় যথাক্রমে কার্বলিক অ্যাসিড, সালফিউরাস অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী করে। ফলে বৃষ্টির জলের অম্লতা বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিক বায়বীয় কার্বন ডাই-অক্সাইডের জন্য বৃষ্টির জলের নিম্নতম pH এর মান 5·6 মত হয়ে থাকে। এই pH হ'ল কোনও তরলের অম্লত্ব অথবা ক্ষারত্বের মাপক। পাতিত (distilled) জলের pH মান 7। pH এর মান 7 থেকে যত বেশী হবে ক্ষারত্বের তীব্রতা তত বৃদ্ধি পাবে এবং pH এর মান 7 থেকে যত কম হবে অম্লত্বের তীব্রতা তত বেশী হবে। অম্লবর্ষণ আজ এক আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইয়োরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৃষ্টির জলের অম্লতা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই তা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেছে এবং গত দুই দশকের মধ্যে এই অম্লতার মান সঙ্কটজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কোন কোন অঞ্চলে এই সময়ের মধ্যে বৃষ্টির জলে অম্লত্বের পরিমান 200 থেকে 250 গুণ বেড়েছে। 1911 সালে মধ্য ইংলণ্ডের লীডস্ শহরে প্রথম অম্লবর্ষণের খোঁজ পাওয়া যায়। তবে 1964 সালে উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টির জলে pH এর মান মাত্র 2·1 ধরা পড়ে। এটাই আজ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ অম্লবৃষ্টি। 1974 এ নরওয়েতে 2·4 pH মানের বৃষ্টিপাত হয়। অম্লবর্ষণের ওপর ভারতবর্ষে কোনও ব্যাপক সমীক্ষা হয়নি।

মথুরার তৈলশোধনাগারের প্রভাবে তাজমহলের সৌন্দর্যের ওপর যে প্রতিক্রিয়া হবে সে আলোচনা আমরা অনেক শুনেছি। রাজঘাট আর ইন্দ্রপ্রস্থ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষণের ফলে দিল্লীর লালকেল্লার লালপাথরের রং কালো হয়ে যাচ্ছে। দিল্লী শিল্পাঞ্চলের জন্য লালকেল্লা, জাম্মামসজিদ ও কুতুবমিনার, কলকাতার শিল্পাঞ্চলের জন্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মত শিল্পকীর্তি আজ বিপদের সম্মুখীন। শিল্পাঞ্চল থেকে দূরে অবস্থিত হলেও কোনারকের সূর্যমন্দির, বিজাপুরের গোলগম্বুজ অথবা অজন্তা-ইলোরা কেউই বায়ুদূষণের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত নয়। অম্লবৃষ্টির কুপ্রভাব শুধুমাত্র পুরাকীর্তির ওপরেই নয়, জলাশয়ের জল এবং ক্ষেত-খামারের মাটিতেও অম্লতার পরিবর্তন ঘটায়। ফলে মাটিতে ও জলে বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজনীয় ব্যাক্টিরিয়ার স্বল্পতা লক্ষিত হয়। নরওয়ের এক সমীক্ষায় দেখা যায় সেখানে 960টি লেকের মধ্যে 690টি লেক হয় মৎসহীন অথবা মৎস্যবিরল। 1950 থেকে 1970 এই কুড়ি বছরে দক্ষিণ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতিক অরণ্যের যথেষ্ট সঙ্কোচন পরিলক্ষিত হয়েছে। নরওয়েতে বিভিন্ন প্রজাতির পাখীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এ সমস্তই পরিবেশে অম্লতা বৃদ্ধির ফল। উপরে আলোচিত বায়ুদূষক গ্যাসগুলি ছাড়াও কোনও কোনও শিল্পে কার্বন ডাই-সালফাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যামোনিয়ার মত অতি বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়ে আবহাওয়া দূষিত করে। বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ পি. এস. দুবের মতে মধ্যপ্রদেশের নাগদা এবং কেরালার মাভুরের গোয়ালিয়র রেয়নের চিমনী ও কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড ও কার্বন ডাই-সালফাইডের মত গ্যাস আবহাওয়ায় নিক্ষেপ করে।

বায়ুদূষণের প্রাথমিক কারণগুলিকে যদি আমরা চিহ্নিত করতে পারি তাহলে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সুবিধা হবে। উদাহরণ হিসাবে আমরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রজাতদূষণ আলোচনা করতে পারি। কয়লার দহনের অবশেষ (Product of combustion) চিমনী দিয়ে নির্গত হয়। একে বলা হয় ফ্লু-গ্যাস। এই ফ্লু-গ্যাস তাপবিদ্যুৎ শিল্পের প্রধান বায়ুদূষক। দেখা যাক এর মধ্যে কি কি থাকতে পারে। এতে থাকে কিছু ছাই ও অদাহিত কয়লার কণা এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস। কার্বন ডাই-অক্সাইড,

অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বায়ুদূষক নয়। যদিও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে বেশী হলে পরিবেশের তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কার্বন মনোক্সাইড অতিমাত্রায় বিষাক্ত দূষক। দহনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অপরিমিত সরবরাহের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিবর্তে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। সুতরাং চুল্লীতে অক্সিজেন অথবা বাতাসের যোগান বৃদ্ধি করে কার্বন মনোক্সাইডের উৎপাদন বন্ধ করা যায়। সালফার ডাই-অক্সাইড আর একটি দূষক। কয়লার মধ্যে সালফারের উপস্থিতি এর কারণ। কয়লার মধ্যে 0·5 থেকে 3·0 শতাংশ পর্যন্ত সালফার থাকতে পারে। এখন এই সালফার থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কি? একটা উপায় হতে পারে বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহারের আগে ধৌতাগারে (washary) কয়লার ধৌতিকরণ। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বর্তমান স্তরে এই উপায়কে এখনও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য বলা চলে না। অন্য উপায় হ'ল কম সালফারযুক্ত কয়লার ব্যবহার। সৌভাগ্যক্রমে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য আমাদের দেশে বর্তমানে যে কয়লা পাওয়া যায় তাতে সালফারের গড় পরিমাণ মোটামুটিভাবে 0·5% মত। কয়লা অথবা ছাই-এর সূক্ষ্মকণা ধরে রাখার জন্য ইলেকট্রোস্টাটিক অথবা আলট্রাসনিক ডাস্ট কালেক্টর ব্যবহার করা যেতে পারে।

জল দূষণ ঃ

নদী, পুকুর অথবা অন্য জলাশয়ের জলে এ্যালগি, প্রটোজোয়া ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাইক্রো-অর্গানিজম থাকে। এরা জৈব এবং অজৈব পদার্থের উপর জীবন ধারণ করে। ফলে জলের মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন প্রকারের দূষিত পদার্থ ও রোগজীবাণু থেকে জল দূষণমুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক উপায়ে জলশোধন বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যদি কোনও কারণে জলের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং অন্যান্য দূষিত রাসায়নিকের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে এই মাইক্রো-অর্গানিজমগুলিরও মৃত্যু ঘটে এবং প্রাকৃতিক শোধন প্রক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা এই অবস্থাকে যে সূচক এর সাহায্যে ব্যক্ত করেন তাকে বলে বায়োলজিকাল অক্সিজেন ডিমাণ্ড (BOD)। এটাই জলদূষণের পরিমাণ। বিশুদ্ধ জলের BOD লিটার প্রতি 3 মিঃ গ্রাঃ অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত নয়।

pH এর মানকেও অনেক সময় জলদূষণের পরিমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই পরিমাণ থেকে জলের অম্লত্ব অথবা ক্ষারত্ব বুঝতে পারা যায়।

বায়ুদূষণের মত জলদূষণও শিল্পবিকাশের একটা কুফল। শিল্পকারখানার ধোয়ানী ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ অধিকাংশ সময়ে নিকটবর্তী নদী অথবা জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে শুধু মানুষই নয় সমস্ত রকম জলচর প্রাণী, কীটপতঙ্গ, পশুপাখী এমনকি গাছপালা এবং কৃষিজ পণ্যও বিপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলের জন্য দামোদর এবং শ্রীরামপুর থেকে বজবজ পর্যন্ত গঙ্গার জলের বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে ঐ অঞ্চলের নদীর জলের BOD এবং pH এর মান বিপদসীমার অনেক ওপরে। উভয় অঞ্চলের জলের নমুনা পরীক্ষা করলে তার ভেতরে যে সমস্ত পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে লোহা, পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি ধাতু, বিভিন্ন ধরনের তেল ও গ্রীজ, জৈব ও অজৈব অ্যাসিড, কস্টিক সোডা, ফেনল, লিগনিন, মারক্যাপট্যান, অ্যামোনিয়া, বিভিন্ন সালফেট ও সালফাইট ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকারক রোগজীবাণু ও বীজাণু। এই জল ব্যবহৃত হয় মানুষ ও জীবজন্তুর খাদ্য ও পানীয় হিসাবে। আবার এই জলই ব্যবহৃত হয় কৃষিকার্যে। 1979-এর এক সমীক্ষায় মধ্যপ্রদেশের নাগদায় অবস্থিত গোয়ালিয়র রেয়ন শিল্পসংস্থার নির্গত পদার্থে চম্বলনদীর দূষণের একটা চিত্র পাওয়া যায়।

নাগদার কাছে চম্বল নদীতে দূষণের চিত্র

(1968 সালের সমীক্ষা—কারখানার পত্তন 1954)

	কারখানার 2 কিঃ মিঃ উজানে	কারখানার নিম্নস্রোতে 0·2 কিঃমিঃ	2 কিঃমিঃ	5 কিঃমিঃ	20 কিঃমি
পি. এইচ—	7·6	3·5	4·0	50	6·6
অম্লতা—	0·0	315	370	360	215
জিঙ্ক— মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	0·0	9·4	8·9	8·2	3·0
সালফেট মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	24	1537	1444	1420	1010
ভাসমান পদার্থ— মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	7·6	236	220	200	112
ক্লোরাইড— মিঃ গ্রাঃ/লিঃ	64	253	235	231	140

1979 সালের আর এক সমীক্ষায় চম্বলের জলের দূষণ নিম্নরূপ

	মিঃ গ্রাঃ/লিঃ
পি. এইচ—	6·5
ভাসমান প্রদার্থ—	368
বি. ও. ডি—	272
ক্লোরাইড—	442
সালফেট—	900
সালফাইড—	9
ম্যাগনেসিয়াম—	50
সোডিয়াম—	753
জিঙ্ক—	9·55
পারদ—	0·20

সূত্র: "দি গ্যাস চেম্বার অন দি চম্বল"—ভি.টি. পদ্মনাভন (V.T. Padmanabhan)

পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম, তামা ইত্যাদি ধাতু বিশেষ মাত্রায় জীবদেহে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পারদ দূষণতো আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। কয়েক ধরনের ব্যাক্টিরিয়ায়

সহায়তায় পারদ, মিথাইল-মার্কারী নামে এক অতি বিষাক্ত যৌগ তৈরী করে। এই যৌগ মাছ ও জলজ উদ্ভিদে খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ স্তরে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এই মাছ খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের ফলে মারাত্মক বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। 1953 সালে জাপানের মিনামাতা শহর ও তার আশেপাশের অঞ্চলে বহু মানুষ ও জীবজন্তু এক অদ্ভুত রোগে মারা যেতে থাকে। দীর্ঘদিন যাবত এর কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। 1959 সালে ঐ রোগের আসল কারণ ধরা পড়ে। পারদ হ'ল এই কারণ। মিনামাতা শহরের উপকণ্ঠে চিসো কেমিকাল কোম্পানী (Chisso Chemical Co.) তার কারখানার পারদ মিশ্রিত ধোয়ানী মিনামাতা উপসাগরে ফেলতো। তারপরে মাছের মাধ্যমে মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে এই রোগের সঞ্চার। 1974 সাল পর্যন্ত কিন্তু জাপান সরকার ঐ শিল্পসংস্থার বিরুদ্ধে কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। এই সময়ের মধ্যে ঐ অঞ্চলের প্রায় 10,000 মানুষ মিনামাতা রোগাক্রান্ত হয়। 1973 সালে ক্যানাডার হাডসন বে অঞ্চলে রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই রোগের খবর পাওয়া যায়। আমেরিকা, পাকিস্তান ও ইরাকেও মিনামাতা রোগ দেখা গেছে।

শব্দ দূষণ ঃ

যদিও জল ও বাতাসকে দূষিত করাকেই আমরা সাধারণভাবে পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকি; অনিয়ন্ত্রিত শব্দও পরিবেশকে সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক জীবন যাত্রার পক্ষে অনুপযুক্ত করে তোলে। দীর্ঘ সময় তীব্র শব্দ পরিমণ্ডলে অবস্থানের ফলে মানুষের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শ্রবণশক্তি হ্রাস, অবসাদ, মাথাধরা, কর্মদক্ষতা হ্রাস, হৃদরোগ এবং এমনকি মস্তিষ্ক বিকৃতিও অসম্ভব নয়। শিল্পসংস্থাগুলিতে শব্দদূষণ একটা অতি জটিল সমস্যা। অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশে আইনের সাহায্যে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চলছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অকুপেশনাল সেফটি এণ্ড হেল্থ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (OSHA), কর্মীদের কর্মক্ষেত্রের শব্দ পরিমণ্ডলের মান নির্ধারণের জন্য কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশ নথিভুক্ত করেছেন। যেমন 90 ডেসিবেলের শব্দক্ষেত্রে (sound field) 8 ঘণ্টার বেশী কাজ করানো যাবে না, শব্দক্ষেত্রের তীব্রতা যদি 95 ডেসিবেল হয় তবে কাজের সময় দৈনিক 4 ঘণ্টার বেশী হবে না ইত্যাদি।

কল-কারখানায় কিছু যন্ত্রপাতি আছে যারা উচ্চমাত্রায় শব্দ সৃষ্টি করে। কাঠ চেরাই, শিট মেটালের কাজ, ড্রিলিং, মিলিং, ফরজিং ইত্যাদি যান্ত্রিক পদ্ধতি অতিমাত্রায় শব্দ উৎপাদন করে। এছাড়া রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্পে, স্পিনিং মিল, পাওয়ার লুম, ফার্নেস, কম্প্রেসার, পাম্প, বেল্ট ড্রাইভ, কণ্ট্রোল ভাল্ব, পাইলিং ইত্যাদিও যথেষ্ট শব্দ সৃষ্টি করে।

তীব্র শব্দ থেকে কর্মীকে রক্ষা করার জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। প্রথমতঃ উচ্চমাত্রার শব্দ পরিমণ্ডলে যারা কাজ করে তাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে রক্ষা করার জন্য কোনও রক্ষাকারী ঢাকনা (ear-protector) ব্যবহার করা যেতে পারে। অথবা শব্দের উৎপত্তি স্থলে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে কমমাত্রায় শব্দ উৎপন্ন হয়। এই দ্বিতীয় উপায়ে কম্প্রেসার, মোটর, পাম্প, পাইপিং, কণ্ট্রোল ভাল্ব ইত্যাদির শব্দ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বোম্বাইস্থিত সংস্থা সোসাইটি ফর ক্লিন এনভারনমেণ্ট (Soclean) দিল্লীর ন্যাশনাল ফিজিকাল লেবরেটারির (NPL) এক সমীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে জানিয়েছে যে কলকাতা, বোম্বাই ও দিল্লী শব্দ দূষণে পৃথিবীর প্রধানতম শহরগুলির মধ্যে অন্যতম। Soclean এর মতে বোম্বাই শহরে উৎসবের দিন নয় এমন দিনেও শব্দ স্তরের (sound level) মান 70 ডেসিবেলের বেশী। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মান অনুযায়ী শব্দস্তর 45 ডেসিবেল হওয়া উচিত।

তাপ দূষণ ঃ

অধিকাংশ শিল্পসংস্থায় কোনও না কোনও স্তরে তাপশক্তিকে ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ শিল্প, ধাতু শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ইত্যাদি বৃহৎ শিল্পের ব্যবহৃত তাপ শক্তির একটা বড় অংশ অব্যবহৃত থেকে যায়। এই বিরাট পরিমাণ তাপ পরিবেশকে প্রভাবিত করে। পারিপার্শ্বিক জল ও বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। গাছপালা, জলজপ্রাণী, অন্যান্য জীবজন্তু এবং মানুষের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফল হ'ল ঐ অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন হ্রাস, বনাঞ্চলের লোপ এবং অনাবৃষ্টির আশঙ্কা। উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে গত দুই দশকে কেবলমাত্র বৃহৎশিল্প স্থাপনের ফলে বাঙ্গালোর ও রাঁচীর মত শহরের গড় তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাপদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে শিল্পে ব্যবহৃত তাপশক্তির উৎসকে আরও কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা দরকার। উদ্বৃত্ত তাপশক্তিকে পুনর্ব্যবহার (waste heat utilization) এর উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। ফারনেসসমূহের তাপ নিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে হবে। কারখানার ধোয়ানী জল নদীতে ফেলার আগে ঐ জলের তাপমাত্রা নদীর জলের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় নামিয়ে আনতে হবে। এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করলে তাপদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

উপসংহার ঃ

দূষণ থেকে বর্তমান শিল্পনির্ভর সমাজকে পরিপূর্ণ ভাবে মুক্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা যদি এর সর্বনাশা কুফলগুলি সম্পর্কে সচেতন হই তাহলে দূষণের সূত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে পারবো। 1972 সালের জুন মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় সুইডেনের স্টকহোল্‌ম শহরে 113টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিশ্বপরিবেশ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পৃথিবীর দেশে দেশে বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। পরিবেশের সুস্থতা ও ভারসাম্য রক্ষা করা এবং দূষণ থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার অঙ্গীকার নিয়ে ঘোষিত হচ্ছে নতুন নতুন আইন ও পরিকল্পনা। এটা অবশ্যই আশার কথা। কিন্তু শুধু আইন করলেই চলবে না। সেই আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা সেটা দেখার দায়িত্ব নিতে হবে সাধারণ মানুষকে। আর এই দায়িত্ব পালন

করার উপযুক্ত সচেতন করে শিক্ষিত করে তুলতে হলে চাই একটা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন। এই আন্দোলনের চাপে বাধ্য করতে হবে শিল্পপতি ও শিল্পপরিচালকদের, সেই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যার ফলে শিল্পদূষণ সীমিত হবে। সরকার পরিচালিত শিল্পসংস্থাগুলিকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

শিল্পসংস্থাগুলি যেভাবে পরিবেশকে দূষিত করছে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অনেক পিছিয়ে আছি। এই আন্দোলন স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেরালার মাভুর অথবা মধ্যপ্রদেশের নাগদা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এ সমস্যা আজ জাতীয় সমস্যা, এ সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যা।

1974 সালে আমাদের দেশে জলদূষণ নিরোধ আইন (Water Pollution Act—1974) কার্যকরী হয়েছে। এই নিয়মে প্রতিটি রাজ্যে ওয়াটার পলিউশন বোর্ড তৈরী হয়। কিন্তু ওয়াটার পলিউশন এ্যাক্ট-এ বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা থাকায়, রাজ্য বোর্ডগুলি কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে না। 1981 সালে বায়ুদূষণ নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন [The Air (Prevention and Control of Pollution) Act—1981] পাশ করা হয়। কিন্তু এই আইনেও ঐ একই ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা রয়ে গেছে। এই ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা দূর করার জন্য ব্যাপক জনমত গড়ে তোলা দরকার। এই আইন ভঙ্গকারীদের জন্য কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আর তাতেই আগামী দিনে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি গ্রথিত হবে।

প্রথম শারীরবৃত্তিয় ছবি

লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির নাম আমরা সকলেই শুনেছি। একাধারে চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক হিসেবে তিনি সুপরিচিত। তিনিই প্রথম মানবশরীরের রহস্য চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। এজন্যে তিনি শবদেহের উপর ব্যবচ্ছেদ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তাই তাঁর আঁকা মানবদেহের প্রতিটি ছবি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। তাঁর আঁকা হৃৎপিণ্ডের ছবি থেকে প্রথম জানতে পারা যায় হৃৎযন্ত্রের মধ্যেকার ভালূভ বা কপাটিকার অস্তিত্ব। মানুষের মাথার মধ্যে যে কতকগুলি গহ্বর থাকে তিনিই প্রথম তাঁর আঁকা মস্তিষ্কের ছবিতে ইঙ্গিত দেন।

প্রদীপ কুমার দাস।

[*Source* : Milestones in Medical Breakthroughs ; East India Pharmaceuticals Works Limited, Calcutta-70001]

পশ্চিম বাংলার শিল্পায়ন ও পরিবেশ দূষণ

সঙ্কর্ষণ রায়

দেশের প্রতিটি মানুষ—আপনি, আমি প্রত্যেকেই আমাদের অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে দেশের পরিবেশকে তিলে তিলে বিষাক্ত করে তুলছি। বিশেষ করে দেশের হিত বা শিল্পোন্নয়নের কথা যারা চিন্তা বা পরিকল্পনা করছি এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হচ্ছি, তারাই এই অপরাধে বিশেষভাবে অপরাধী, কারণ শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে দেশের পরিবেশকে দূষিত ক'রে তোলার পরোক্ষ ব্যবস্থা তারাই করে যাচ্ছে। তাদের রকমসকম দেখে মনে হয় যেন পরিবেশকে নষ্ট না করে দেশের উন্নয়নমূলক কোন পরিকল্পনা গ্রহণই যেন সম্ভব নয়। ঐ কথার যথার্থতা বিবেচনা করে দেখা যাক!

পশ্চিম বাংলার প্রধান খনিজ সম্পদ কয়লা-ভিত্তিক শিল্প স্থাপন। কয়লাকে উপকরণ করে দু'টি বড় বড় শিল্প গ'ড়ে তোলা যেতে পারে। একটি নিম্ন-তাপ অঙ্গারীকরণ প্রকল্প (Low Temperature Carbonisation Plant)। এই প্রকল্পে ধাতব আধারে কাঁচা কয়লা পুড়িয়ে জ্বালানী অঙ্গার বা নরম অঙ্গারের (soft coke) সঙ্গে অঙ্গার ও হাইড্রোজেন যুক্ত বিবিধ যৌগিক পদার্থ আহরণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কয়লা থেকে পেট্রোলিয়াম উৎপাদনও সম্ভব। নিম্ন-তাপ অঙ্গারীকরণের ফলে উৎপন্ন বায়বীয় ও তরল হাইড্রোজেন ও কার্বনযুক্ত যৌগিক পদার্থগুলোকে সংশ্লেষণের (synthesis) সাহায্যে পেট্রোলিয়ামে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। কয়লা-ভিত্তিক দ্বিতীয় প্রকল্প হল উচ্চ-তাপ অঙ্গারীকরণ কারখানা (High Temperature Carbonisation Plant)। উচ্চ-তাপ অঙ্গারীকরণের ফলে ধাতু নিষ্কাশনের উপযোগী শক্ত অঙ্গার (hard coke) ছাড়া বিভিন্ন হাইড্রোজেন ও কার্বনযুক্ত যৌগ পদার্থ আহরণ করা হয়। উভয় প্রকল্প কয়লা থেকে অঙ্গার এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ আহরণ করলেও কিছু বায়বীয় পদার্থ বাতাসে ছেড়ে দেয়। ফলে বাতাসের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর (carbon di-oxide) পরিমাণ বেড়ে যায়। পশ্চিম বাংলায় কয়লার অপরিমেয় ভাণ্ডারের দরুন অনেকগুলো অঙ্গারীকরণ প্রকল্প গড়ে তোলা সম্ভব, কয়লা থেকে খনিজ তেল আহরণও সম্ভব। এই কয়লা-ভিত্তিক শিল্প-প্রকল্পগুলি পশ্চিম বাংলার বায়ুকে কতখানি বিষিয়ে তুলবে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। খনিজ-ভিত্তিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু শিল্প-সমৃদ্ধির চেয়েও মূল্যবান পরিবেশের বিশুদ্ধতা রক্ষা। শিল্প-প্রকল্পের পরিকল্পনা করতে গিয়ে পরিবেশ বিশুদ্ধতা বজায় রাখার কথাও ভাবতে হবে।



কয়লাখনির চারপাশে ভূমি অবক্ষয়

কয়লা-ভিত্তিক শিল্প-প্রকল্পের পর মৃৎ-শিল্পের সম্ভাবনার কথা লিখেছি। পশ্চিম বাংলায় চিনা-মাটির বিপুল ভাণ্ডার অনেকগুলি মৃৎ-শিল্প-প্রকল্প প্রকল্পের জন্মদাতা হতে পারে। মৃৎ-শিল্প-প্রকল্প কয়লা-ভিত্তিক শিল্প-প্রকল্পের মত পরিবেশকে দূষিত না করলেও আবহাওয়াকে কিছুটা বিষাক্ত ক'রে তুলতে পারে, কারণ মৃৎপাত্রকে আগুন দিয়ে ঝলসে নেবার সময় দহনক্রিয়ার ফলে কার্বন ডায়োক্সাইড বাতাসে মুক্তি পেতে পারে।

যে কোন কল-কারখানার বিশেষত্ব হল চিমনীর মাধ্যমে দূষিত বায়বীয় পদার্থ নিষ্কাশন। কাঁচামাল থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ ক'রে অপ্রয়োজনীয় বায়বীয় পদার্থ বের ক'রে দেয় চিমনী—তা যে কোনও কারখানার অপরিহার্য অঙ্গ। প্রস্তাবিত সিমেন্ট কারখানা বা চুনভাটিতে যে চিমনী থাকবে, তার মধ্য দিয়ে নিষ্কাশিত হবে কয়লা ও চুনাপাথরের দহনক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন

ডায়োক্সাইড ও কার্বন মনক্সাইড—সিমেন্ট বা চুনের উৎপাদনের সম-অনুপাতে তারা বায়ুকে দূষিত করবে।

সিমেন্টের কারখানা বা চুনভাটির চেয়ে অনেক বেশি পরিবেশ দূষণ করে ধাতু-নিষ্কাশনের কারখানার মাধ্যমে। পশ্চিম বাংলায় মাঝারি থেকে ছোট আকারের তামা ও সীসা-দস্তার কারখানার প্রস্তাব আমি দিয়েছি। প্রকল্পের আয়তন যাই হোক, আকর থেকে তামা, সীসা-দস্তা নিষ্কাশনের সঙ্গে সঙ্গে আকরের মধ্যে বন্দী গন্ধক মুক্তি পায় সালফার ডায়োক্সাইড (Sulpher dioxide) রূপে—পরিবেশকে তা দূষিত ও বিষাক্ত ক'রে তোলে। আকরিক লোহা থেকে লোহা নিষ্কাশনে অবশ্য সালফার ডায়োক্সাইডের উৎপাদন ঘটে না, কারণ আকরিক লোহার মধ্যে গন্ধক নেই। গন্ধক থেকে কোন দূষণ না ঘটলেও আকরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অক্সিজেন অঙ্গারের সহযোগে বিষাক্ত কার্বন ডায়োক্সাইড এবং কার্বন মনক্সাইড গ্যাস উৎপাদন করে।



পাহাড়ী নদী ধারাপথে পাথরে ক্ষয়

এর পর সার-শিল্পের কথা বলা যেতে পারে। এ্যাপেটাইট (apatite)-এর মাঝারি আকারের ভাণ্ডার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর এবং বর্ধমান জেলায় আছে। ফসফেটের শতকরা পরিমাণ এবং সঞ্চয়ের পরিমাপে এ্যাপেটাইটকে ভিত্তি ক'রে খুব সারবান বা বড়ো আকারের সার-শিল্প গড়ে তোলা যাবে না, কিন্তু মাঝারি বা ছোট আকারের সারের কারখানা প্রতিষ্ঠা অবশ্যই সম্ভব। এই সব কারখানায় যে ফসফেটযুক্ত সার উৎপাদিত করবে, তা বন্ধ্যা মাটিকে যতই সুফলা করুক, আবহাওয়াকে স্বল্পাধিক দূষিত করবেই।

এ ছাড়া খনিজ-ভিত্তিক যে সব শিল্প-সম্ভাবনা পশ্চিম বাংলায় রয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইমারতি পাথর প্রকল্প, অভ্র, ট্যালকম পাউডার, কাঁচ, রঙ ও লবণ-শিল্প। কুটির বা ক্ষুদ্র-শিল্পের আওতায় আসে এরা, অতএব পরিবেশকে সামান্যই কলুষিত করবে। এদের সম্বন্ধে গুরুতরভাবে চিন্তার কারণ না থাকলেও পরিবেশের ওপরে এদের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন এবং সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পরিবেশকে মলিন ও বিকৃত ক'রে তুলে যে সব শিল্প-প্রকল্প পশ্চিম বাংলার মানুষদের দৈনন্দিন অস্তিত্বকে অস্বাস্থ্যকর ক'রে তুলবে, তাদের বর্জন করা বাঞ্ছনীয় কি না। অর্থাৎ পরিবেশকে বাঁচাবার জন্য শিল্প-প্রকল্পগুলিকে বিসর্জন দেওয়া উচিত কি না?

এ প্রশ্নের উত্তর, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য শিল্প-প্রকল্পগুলো অপরিহার্য, তাদের বাদ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অর্থাৎ পরিবেশের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য কোন শিল্প-প্রকল্পকে বর্জন করা জনস্বার্থ বিরোধী। বিশ্বময় অর্থনৈতিক বিকাশের গতি-প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে শিল্প-প্রকল্পগুলো ক্রমশঃ অধিক থেকে অধিকতর গতি সঞ্চার করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জন-স্বাস্থ্যের চেয়ে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

তবে কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পায়ন মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণকে ছাপিয়ে যাবে? তা কখনই হ'তে পারে না, কারণ "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" অতএব, শিল্প-প্রকল্পগুলোকে বাদ না দিয়েও পরিবেশকে কি ভাবে বিশুদ্ধ রাখা যায় তার কথা চিন্তা করতে হবে।

প্রস্তাবিত শিল্প-প্রকল্পগুলি কি ভাবে পশ্চিম বাংলার পরিবেশকে দূষিত করবে তার কথা আগেই লিখেছি। কয়লা, ধাতুর আকর এবং অন্যান্য খনিজ-ভিত্তিক কারখানাগুলির চিমনীর ধোঁয়া দিয়ে নিম্নলিখিত বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে আসবে ঃ

(১) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে সৃষ্টি হওয়া রকমারি বিষাক্ত গ্যাস।

(২) সালফার ডায়োক্সাইড।

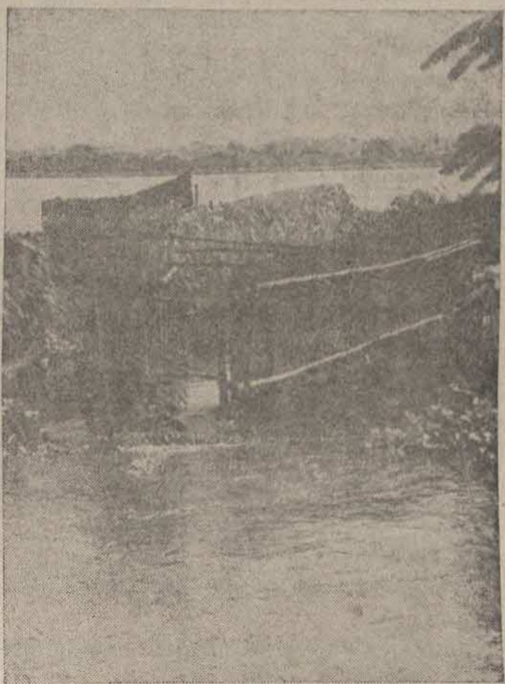
বাতাসে মিশে গিয়ে তারা বাতাসকে বিষাক্ত ক'রে তুলবে। অতএব বাতাসে মেশার আগে তাদের বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই সব গ্যাস এবং রাসায়নিক দ্রব্যের সংযোগে রকমারি রাসায়নিক যৌগ উৎপাদন করা যায়। ধাতু-নিষ্কাশনী কারখানা থেকে উদ্গত সালফার ডায়োক্সাইড দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে সালফিউরিক এ্যাসিড।

অর্থাৎ "যাহারা বিষাইছে বায়ু" তাদের বাতাসে মিশতে না দিয়ে মানুষের কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রস্তাবিত শিল্প-প্রকল্পগুলি থেকে নির্গত মৃত্যু-গরল থেকে প্রস্তুত করা যেতে পারে অমৃত। এমনি করে পশ্চিম বাংলায় গড়ে তোলা যাবে এমন সব শিল্প-প্রকল্প, যারা পরিবেশকে দূষিত বা লাঞ্ছিত করবে না।

ময়লা জলের পুনর্ব্যবহার ও কলকাতার পূর্ব-দক্ষিণ উপকণ্ঠের মহান ঐতিহ্য

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পে বহুমূল্য গালভরা প্রযুক্তির বদলে সাধারণ মানুষের ভূমিকার কথা হালফিলে সর্বাধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। সাধারণ মানুষের ভূমিকা বলতে তাঁদের চেতনা, আন্দোলন বা ঐতিহ্য এসবই বোঝায়। আন্দোলনের প্রশ্নে চিপকো নিশ্চয়ই আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নজির। তেমনি আমার মতে ঐতিহ্যের দিক দিয়ে একটি সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন স্থাপন করেছেন কলকাতার লবণ হ্রদ এলাকার মেছো ভেড়ীর মানুষ। একই সাথে এতগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিশোধনের এমন ঐতিহ্যময় পদ্ধতি নিঃসন্দেহে বিরল। বাস্তবিক প্রধানমন্ত্রীর স্বদেশী প্রযুক্তির যে আওয়াজ উঠেছে, তার একটি উৎকৃষ্ট নমুনা আমরা নিশ্চয়ই চিহ্নিত করতে পেরেছি



ময়লা জল ভেড়ীতে ঢুকছে

কলকাতার এই পূবের উপকণ্ঠে। পঞ্চাশ বছরের উপর চলে আসছে ময়লা জলে মাছ চাষের এই ট্র্যাডিশন। ময়লা জলে যেমন মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক পদার্থ থাকে তেমনি আবার ময়লা জল প্রাণীজগতের নানান গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিকর পদার্থেও ভরপুর। ময়লা জলের এই ক্ষতিকারক অংশটির সমস্যাই প্রযুক্তিবিদদের ব্যস্ত রেখেছে এযাবৎ। সুখের বিষয় হল পরিবেশ সংরক্ষণ, ইকোলাই এসব নানান আওয়াজের চাপে পড়ে ময়লা জলের পুষ্টিকর অংশকে ব্যবহার করতে পারাই চিহ্নিত হয়েছে ময়লা জল নিয়ে গবেষণার সর্বাধুনিক ধারা হিসেবে। ময়লা জলে মাছের চাষ ঠিক এই কারণেই আজকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি এই মাছ চাষ নিয়ে। যদি মাছ চাষের পুকুরগুলিকে পরিশোধনাগার হিসেবে ধরা হয়—তবে তারা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একই ধরনের ফলাফল পৃথিবীর নানান জায়গায় গবেষণা-গারেও পরীক্ষামূলক মাছ চাষের পুকুরেও পাওয়া গেছে। তাই প্রশ্ন যদি ময়লা জল পরিশোধনের হয়, ময়লা জলে মাছ চাষের পুকুর তবে একটি সার্থক সম্ভাবনা। উপরন্তু যে এলাকা নিয়ে মাছ চাষ হবে তাতে যদি ধান চাষ হত তবে অর্থকরী দিক দিয়ে তিন ভাগের এক ভাগ লাভ ঘরে তুলেই সন্তুষ্ট থাকতে হত।

এই সব পুকুরে মাছ বাড়েও খুব ভাল। মাছ অস্বাস্থ্যকর—এমন কোনও প্রমাণ কেউ দিতে পারেননি। তবু বাতিকগ্রস্ত লোকের অভাব নেই। ময়লা জলে মাছ চাষে তাঁদের প্রচুর আপত্তি।

সবচেয়ে বেশী শোরগোল ভারী ধাতু বা heavy metal নিয়ে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৎস্য দপ্তরের অনুদানে গবেষণা চালু হয়েছে ভেড়ীর জলে heavy metal-এর হিসেব নিয়ে। প্রাথমিক পর্যায় heavy metal-এর যা হিসেব পাওয়া গেছে তা সমালোচকদের একটু অসুবিধায় ফেলবে সন্দেহ নেই। এ ছাড়া BOD বা জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা এই মাছের ভেড়ী মারফৎ 150·200 থেকে কমে 65·25 এ দাঁড়ায়। আমরা কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়ার কাজ করেও চমৎকার ফল পেয়েছি। শতকরা 19 ভাগের বেশী কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়ার মৃত্যু ঘটেছে এ মাছের ভেড়ীতে।

এমন মনে হবার কোনও কারণ নেই যে ময়লা জলে মাছ চাষের সঠিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে। ময়লা জলে মাছ চাষের মূল বুনিয়াদ দাঁড়িয়ে আছে সরাসরি প্রকৃতির নিয়মের উপর। ঠিক যে ধরনের অজস্র নিয়মের কল্যাণেই মানুষ পৃথিবীর বুকের

উপর বেঁচে আছে। মানুষের যা পরিত্যাগ—মাছের তা খাদ্য। এ নিয়মটি প্রকৃতির রাজ্যের—আমার আপনার প্রতিভা সঞ্জাত কোনও বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক নয়।

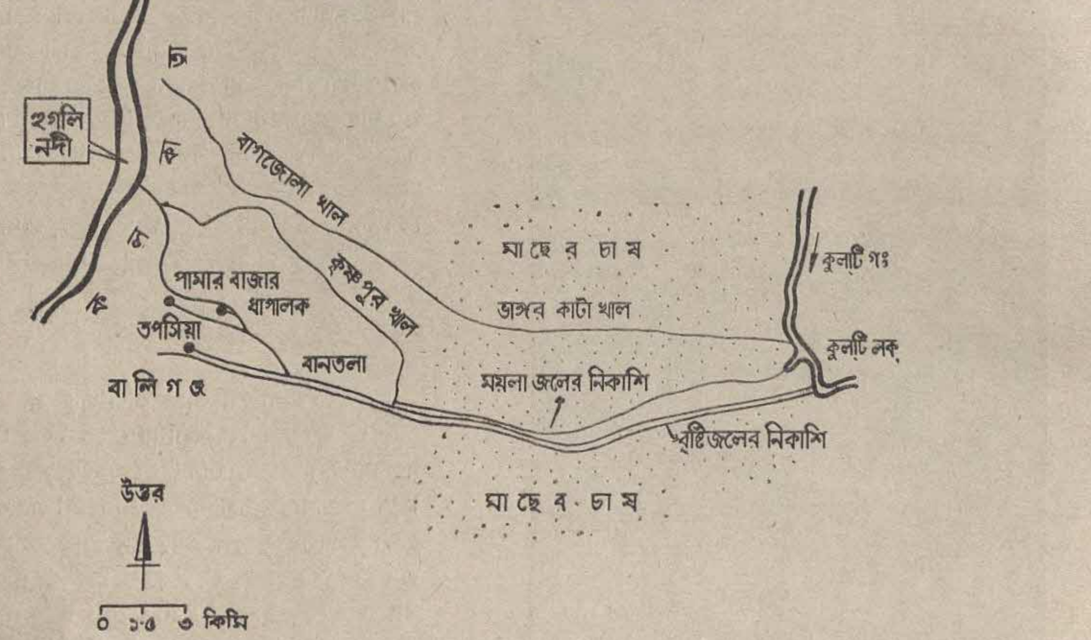
ময়লা জলে মাছ চাষের সমস্যা মূলতঃ দু প্রকার। এক হল, যা আগেও বলেছি, heavy metal সংক্রান্ত, আরেকটি হল হেপাটাইটিস রোগের সম্ভাবনা। প্রথম সমস্যা নিয়ে সর্বাধুনিক গবেষণার ফলশ্রুতি আশাব্যঞ্জক। তা ছাড়া এ বিপদ থেকে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা আধুনিকতম গবেষণা স্বীকৃত। যাঁরা একবার পূর্বকলকাতার এই মাছের ভেড়ীগুলি দেখেছেন তাঁরা জানেন কী বিপুল কচুরী-পানার রাজ্য পেরিয়ে ওই ময়লা জলকে পৌঁছতে হয় মাছের ভেড়ীতে।

উপরন্তু প্রত্যেক ভেড়ীর চারদিকে ফুট দশেকের একটি কচুরি-পানার চাষ বাঁচিয়ে রাখা হয়—দিনের বেলায় মাছের ছাতা হিসাবেও বটে আবার পাড়ের মাটি যাতে খসে না পড়ে তার

এক লিটার ময়লা জলে ভারী ধাতুর পরিমাণ (মিঃ গ্রামে)

ক্রমিক	ধাতু	ভেড়ীতে ঢোকার মুখের জলে	ভেড়ী থেকে বেরনোর মুখের জলে
1	আর্সেনিক	0·06 এর কম	0·06 এর কম
2	ক্যাডমিয়াম	0·06 এর কম	0·06 এর কম
3	তামা	0·410	0·0222
4	ক্রোমিয়াম	0·0137	0·0080
5	লোহা	15139	6·3321
6	নিকেল	0·018	0·018
7	সিসে	0·06 এর কম	0·06 এর কম
8	পারদ	0·04 এর কম	0·04 এর কম
9	দস্তা	18946	0·1981

কলকাতার ময়লা জলের মাছের চাষ



মুক্তি পাবার অন্ততঃ দুটি পরিষ্কার পথ আছে। কলকারখানা থেকে বেরনো জলেই heavy metal থাকে। তাই যে heavy metal এর পরিমাণ ময়লা জলে বিপজ্জনক সীমার কাছে আছে সেই অনুযায়ী কল-কারখানার উৎসে পরিশোধন বা তার আলাদা যাবার পথ করা কঠিন কাজ নয়। এ ছাড়াও একটি মুস্কিল-আসান আছে—কচুরিপানা। কচুরিপানার heavy metal জন্যেও। নেহাৎ যদি ওকালতির পারিশ্রমিকে নজর না থাকে তবে heavy metal যে কলকাতার ময়লা জলে মাছ চাষে বিপদ হয়ে দাঁড়ানোর কথা নয় তা বোঝা উচিত।

অপর সমস্যা হেপাটাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাব। কলকাতার ময়লা জলের মাছ খেয়ে এমন কোনও মহামারি বা সামান্য সংখ্যক লোক মারা গেছে বলে কোনও প্রমাণ নেই, তবু এই

ব্যাপারে গবেষণা চালানো হচ্ছে—যদি রোগের সম্ভাবনা থাকে তার প্রতিকারও আছে। সব মিলিয়ে শেষ কথাটা হল ময়লা



ময়লা জল—কচুরীপানার প্রাচুর্য

জলে মাছ চাষে সমস্যা আছে তবে তার সমাধানও আছে।

জল সরবরাহ বাড়লে ময়লা জলও বাড়ে। ময়লা জল পরিবেশকে নষ্ট করে। এই সমস্যার মোকাবিলা করতে ময়লা জলে মাছ চাষ একটা পদ্ধতি। এই পদ্ধতির ফলে প্রথমতঃ আমরা ময়লা জল পরিশোধন করতে পারছি। এই পরিশোধনের মান যে কোনও উৎকৃষ্ট পরিশোধনাগারের সাথে অবশ্যই সমকক্ষ। উল্টে এতে খরচ খুবই কম বা বলা যেতে পারে এতে খরচ তো নেইই বরং মাছ বেচে যথেষ্ট লাভ আছে। নিছক এই গুণাগুণের জন্যই পদ্ধতিটির বিরাট গুরুত্ব আছে। এর পর মাছের প্রশ্ন। অভিযোগ, মাছ খারাপ হতে পারে। মানুষ তো শুধু মাছ খেয়েই বাঁচে না, আরও অনেক কিছুই সে গ্রহণ করে। বাদবাকীরা কি সব নির্মল, বিশুদ্ধ, আগমার্ক? খারাপ যত ওই মাছই? তা নয় নিশ্চয়; কম বেশী সবই খারাপ এবং তার ফলে যে রোগভোগ বাড়ছে তা সারাতে যে ঔষধপত্র তার অবস্থা আরও খারাপ। আমরা যা গ্রহণ করি তার অধিকাংশই কম বেশী খারাপ। আমাদের বেছে নিতে হবে অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক বস্তুতালিকা। ময়লা জলের মাছ নিয়ে কোন তুলনামূলক বিপদের উপর গবেষণা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যদি বিচারে বসতেই হয় তবে সেই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতেই বসতে হবে। অথচ বিচার অনেকেই সেরে ফেলেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিবেশ বিজ্ঞান আর হস্তরেখা বিচারে সামান্য তফাৎ আছে। এই তফাৎটা বজায় রাখাই বিজ্ঞান তথা মানবসমাজের পক্ষে মঙ্গলের।

দুশ্চিন্তা মাছের উপযুক্ততা নিয়ে নয়। দুশ্চিন্তা এই অসাধারণ ঐতিহ্যের টিকে থাকা নিয়ে। আজ একদিকে শহর বেড়ে আসছে অন্য দিকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হস্তক্ষেপের অভাব। দুয়ে মিলে আজ ভারতবর্ষের এই অন্যতম পরিবেশ ভারসাম্য বজায় রাখার একান্ত অনুকরণীয় পদ্ধতিটির নাভিশ্বাস ঠেলে তুলেছে।

ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ

আজকাল হৃৎরোগের কথা হামেশাই শোনা যাচ্ছে, রোগ ধরাটা অবশ্য খুব সুবিধে হচ্ছে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম যন্ত্রের জন্যে। এটা আবিষ্কার করেন ডুচ্ শরীরবিদ ইয়ানথোবেন। 1903 সালে এরপরে বৃটিশ ডাক্তার থমাস লুইস ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফের সাহায্যে কি করে রোগ ধরতে হয় সে পথ বাতলে দেন।

প্রদীপ কুমার দাস।

[*Source* : ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০০৭১]

কলকাতা শহরে পরিবেশদূষণ ও তার প্রতিকার

কণিকা সরকার

প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার একটা নিজস্ব নিয়ম আছে। মানুষ যতদিন প্রকৃতির কোলে লালিত হয়েছে ততদিন এইসব নিয়ে তার মাথা না ঘামালেও চলেছে। কিন্তু সে যখন সভ্য হতে শুরু করলো, তখন তার সভ্যতা তাকে এইসব বিষয়ে সচেতন হতে শেখালো। সে যেমন একদিকে শিল্পবিপ্লবের জন্ম দিয়ে জগৎকে শিল্পজাত নানান সম্ভারে সমৃদ্ধ করলো, তেমনি কল-কারখানার চুল্লির ধোঁয়া, পেট্রোলিয়ামের পোড়া তেলের কার্বন, আণবিক শক্তির ভয়ঙ্কর রেডিও-এ্যাকটিভিটির সঙ্গেও পরিচিত হলো। শুধু পরিচিতিই নয় সন্ত্রস্ত হল মানুষ।

আজ এই সন্ত্রাস পৃথিবীর সমস্ত নগর, মহানগরগুলোকে গ্রাস করেছে। আমাদের কলকাতারও তার থেকে মুক্তি নেই। ট্র্যাফিকের পোড়া মবিল আর কলকারখানা থেকে নির্গত কার্বন ডায়োক্সাইড, গাড়ীর কার্বন মনোক্সাইড, এই হলো প্রধান শত্রু কলকাতার পরিবেশের। এখন প্রশ্ন হল পরিবেশ কি? পরিবেশ কাকে বলে? পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি পরিধি বা পরি-বেষ্টন, যে পরিমণ্ডলে আমরা বাস করি। অর্থাৎ আকাশ, বাতাস, জল, সূর্য, মাটি, গাছপালা এইসব।

এর মধ্যে বাতাস বা হাওয়া কিংবা বায়ু যে নামেই তাকে ডাকি না কেন এই জিনিসটি আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অপরিহার্য। অর্থাৎ সোজা কথায় হাওয়া না হলে বাঁচা যায় না। এই বায়ু যদি দূষিত হয় তাহলে তা আমাদের শ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে গিয়ে মারাত্মক ক্ষতি ঘটায়। পৃথিবীর বহু দেশে (আমেরিকা, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ) এই রকম ক্ষতিকর দুর্ঘটনা এমন কি অসংখ্য মৃত্যুর নজির আছে। এইসব ঘটনা দূষিত পরিবেশ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলেছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পরিবেশ যে সব কারণে দূষিত হচ্ছে তার প্রতিকারের জন্য আইন তৈরী হয়েছে।

কলকাতা শহরকেও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সজাগ হতে হয়েছে। পরিবেশ দূষণ বিলও পাশ হয়ে গেছে অনেকদিন হল। পরিবেশ দূষণ দু'রকমের—প্রধানত বায়ু ও জল দূষণ। সি এম ডি এ 1972 সালে কলকাতার বায়ু দূষণ সম্পর্কিত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে (সংক্ষেপে নিরী) অনুরোধ জানায় কলকাতা বলতে কলকাতা ও হাওড়া এই দুই জমজ শহরের জন্যে। এই দুই জমজ শহরের জন্য ছটি জায়গাতে (স্যাম্পলিং স্টেশন) পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এবং উনিশটি জায়গায় (স্টেশনে) বাতাসে সালফার ও ধূলিকণার পরিমাণ (সালফেশন রেট ও ডাস্টফল রেট) পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। 1979-80 সালে এই দুই শহরের বায়ুর গুণাগুণ (কোয়ালিটি) বিচার হয়। বিচারের ফলাফল কলকাতাবাসীর পক্ষে শঙ্কাজনক। কারণ বাতাসে ঝুলন্ত বা ভেসে বেড়ানো (সাসপেণ্ডেড পারটিকুলেট) কণাসমূহের হিসেব হল 100 থেকে 1071 UGM^3 (মাইক্রো-গ্রাম্‌স পার কিউবিক মিটার)। যেখানে সাধারণভাবে (এ্যাভা-রেজ) হওয়ার কথা 423 UGM^3-এর বেশী নয়। এখানকার বাতাসে সালফার ডায়োক্সাইডের পরিমাণ 37 UG/M^3 থেকে বেড়ে 50 UG/M^3 দাঁড়িয়েছে। বাতাসে নাইট্রোজেন ডায়োক্সাইডের পরিমাণও বেশ বেশীর দিকে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে নিম্নমানের কয়লা ও অত্যধিক ডিজেলের ব্যবহারই এর কারণ। নিরীর এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে এই শহরের বায়ু বছরে বছরে ক্রমশই খারাপ থেকে খারাপ হয়ে চলেছে।

আমাদের মা ঠাকুমাদের মুখে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, "অমুকের অসুখটা আর সারছে না। ওর বোধ হয় হাওয়া বদল দরকার।" এই জল-হাওয়া বদল কথাটা এখন কলকাতার লোকে-দের কাছে প্রায়ই জরুরী হয়ে পড়ছে। কারণ কলকাতার বর্তমান দূষিত হাওয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে গিয়ে সমূহ ক্ষতি করছে মানুষের। মানুষ হাওয়া থেকে অক্সিজেনের সাহায্যে শরীরের দূষিত রক্তকে শোধিত করে থাকে। এই প্রক্রিয়া আমাদের অজান্তেই শরীরের মধ্যে প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে হয়ে থাকে। বায়ু দূষিত হবার মানে হাওয়াতে অক্সিজেনের পরিমাণের চেয়ে অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত গ্যাস ও বস্তুকণার প্রাধান্য। যা মনুষ্য শরীরের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে থাকে। গত এক দশকে কলকাতা শহরে যে হাঁপানি বা শ্বাসজনিত রোগের প্রাধান্য দেখা দিয়েছে তার কারণ অনেকটাই এই বায়ু দূষণ। এমন কি আজকের শহর-গুলিতে শিশুরাও এর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। এছাড়া জল-দূষণের ফলে জলবাহিত রোগের অত্যাধিক্য তো আছেই। যেসব এ্যামিবা জীবাণু জল থেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে শরীরকে রুগ্ন করে, সেসব রোগ আজ কলকাতা ও অন্যান্য শহরের নিত্য ঘটনা হয়ে উঠেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বায়ু দূষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় কি করে? অর্থাৎ এর প্রতিকার কি?

বায়ু দূষণের প্রতিকারের কথা বলতে গেলে শহরের পরিকল্পনা

বিষয়ে আমাদের জানতে হবে। একটা বাড়ি তৈরীর সময় যেমন 'ক্রশ ভেন্টিলেশনের' ওপর নজর দিতে হয়, তেমনি একটা শহরের প্ল্যান আঁকবার সময়ও অনেক বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়। কিন্তু এই কলকাতা শহর যাঁরা গড়েছিলেন সেই সাহেবরা শুধু নিজেদের কথাই ভেবেছিলেন তখন। মাত্র হাজার দশেক লোকের থাকার



মত ব্যবস্থা আর কি। এদিকে দেশবিভাগের পর লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এই শহরে আশ্রয় নিয়েছেন রাতারাতি। সেইসব দুর্দিনে পশ্চিম বঙ্গের তহবিলে এত পয়সা ছিল না যে সেইসব লাখ লাখ মানুষের পুনর্বাসনের জন্য নতুন নতুন আধুনিক স্থাপত্যের সুযোগ সুবিধেওয়ালা উপনগর গড়ে তুলবে তৎক্ষণাৎ। ফলে সমস্ত শহরটা কোন রকম পরিকল্পনা ছাড়াই উত্তরে দক্ষিণে ছিরিছাঁদহীন ভাবে বেড়ে উঠলো। শুধু তাই নয়। অন্যান্য রাজ্য থেকেও অসংখ্য মানুষ এ শহরে জীবিকার সন্ধানে এসে উঠতেন। কিন্তু এত লোকের বসবাসের কোন ব্যবস্থাই ছিল না সেদিন।

বহু মানুষ এক জায়গায় ঘন হয়ে বসবাস করলে তাদের জ্বালানীর ধোঁয়া, ট্রাফিকের পোড়া মবিল ইত্যাদি বায়ুকে দূষিত করে। তাই সি এম ডি এ কলকাতা শহরের ঘন বসতকে ভেঙ্গে দেবার জন্য নতুন নতুন উপনগরী তৈরী করতে সচেষ্ট। এই উপনগরীগুলি শহরের বাইরে নিজস্ব অফিস, কাছারি, পোস্ট-অফিস, ফায়ারব্রিগেড, স্কুল-কলেজ নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি "ইউনিট" হবে। যাতে সাধারণভাবে সেখানকার মানুষজনকে নিত্যদিন কলকাতার অফিস পাড়ায় আসবার জন্য ট্রাফিকের ভীড় না বাড়াতে হয়। অন্যদিকে খোলামেলা এলাকায় শুদ্ধ বায়ু সেবন করে মানুষের শরীরও ভাল থাকবে। তাছাড়া এইসব বসত এলাকায় আইন করে কলকারখানা স্থাপনও নিষিদ্ধ থাকবে।

এই কাজ আরম্ভ হয়েছে। সল্টলেক বা বিধাননগর এমনিই একটি উপনগরী আগে থেকেই গড়ে উঠেছে। বৈষ্ণবঘাটা ও পাটুলিতে এরকম আর একটা উপনগরী গড়ে উঠেছে। কসবার পিছনে ইস্টার্ণ মেট্রোপলিটান বাইপাসের দু'পাশেও উপনগরীর জমি তৈরীর কাজ চলছে। হাওড়ার কোনাতেও মাটি ভরাট করা হচ্ছে একই উদ্দেশ্যে। ভীড়-জমাট, জ্যাম জমাট, অফিস-জমাট কলকাতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম পদক্ষেপের কাজ এখন সুদৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলেছে। ফলে কলকাতার শ্বাসরুদ্ধ অবস্থাটাও একটু যেন আশার আলোর হদিশ পাবে শীঘ্রই।

এরপর আসছে বৃক্ষরোপণ। আমরা জানি যে গাছ কার্বন ডায়োক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন ত্যাগ করে। তাই বায়ু-মণ্ডলের দূষণ কমানোর জন্য গাছ লাগানো জরুরী। গাছের গুণাগুণ জানতে হলে ডঃ দাসের মূল্যায়নটি আমাদের পড়া উচিত।

একটি পঞ্চাশ বছরের গাছের মূল্য কত ?

		টাকা
যে পরিমাণ অক্সিজেন তৈরী করে তার মূল্য	—	2,50,000/-
জৈব প্রোটিন তৈরী করে	—	20,000/-
জমির ক্ষয়রোধ ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি	—	2,50,000/-
হাওয়ার আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ও জলের চক্র অব্যাহত রাখা	—	3,00,000/-
পাখি, কাঠবিড়াল, পোকামাকড় ও চারাগাছকে আশ্রয় দেয়	—	2,50,000/-
বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ	—	5,00,000/-
		টাকা ঃ 15,70,000/-

(ইণ্ডিয়ান বায়োলজিস্ট ভলিউম 11 নং 1-2,1979)
(স্পেশাল এডিটোরিয়াল কোলাম)

ঠিক এই কারণেই বৃক্ষরোপণকে শুধু একটা উৎসবই নয়, একটা আন্দোলনে পরিণত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সুখের বিষয় কলকাতাবাসী গাছের ব্যাপারে ক্রমশঃ আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এটা খুবই আশার কথা।

পরিবেশ দূষণের এক এবং অব্যর্থ অস্ত্র হলো 'রিসাইক্লিং' বা ব্যবহৃত ময়লা জিনিসকে শোধন করে কিংবা যেমনকার তেমন অবস্থাতেই তার উপযোগ তৈরী করা। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সভ্যতার প্রতিক্রিয়া এক ভয়াবহ দৈত্যের আকারে মানব সভ্যতাকে গ্রাস করতে আসছে। অথচ বিজ্ঞানকে মানুষ মানুষের কাজেই

ব্যবহার করবার জন্য আবিষ্কার করেছে ও করবে। তাই বিজ্ঞানই আবার 'পলিউশনের সলিউশন' হিসাবে এই রিসাইক্লিং বা চক্রবৎ উপযোগী প্রক্রিয়ার আবিষ্কার করছে। একমাত্র এই পথেই পরিবেশ দূষণকে বাগে আনা যায়। কলকারখানার ধোঁয়া, গ্যাস এসব মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই এগুলোকে আকাশে ছুঁড়ে না দিয়ে, গরম ধোঁয়ার সাহায্যে সুইমিং পুলের জল গরম করা বিদেশে আখছাড়ই হচ্ছে। বাড়তি গ্যাস থেকে ন্যাপথলিন, আলকাতরা তৈরী হয়। আমাদের দেশেও অবশ্য এসব হচ্ছে অনেকদিন হল। তবে চিমনীর ধোঁয়ার উত্তাপ ব্যবহার করে ও তার কার্বন বাইরে ভূমণ্ডলে ছড়িয়ে না ফেলে কাজে লাগানোর দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। তবে জ্বালানীর জন্য এক রকমের নতুন চুলো তৈরী হয়েছে যাতে তাপ বেশী হলেও ধোঁয়া খুবই কম।

এ বিষয়ে গোবরগ্যাসের কথা উঠতে পারে। গোবর গ্যাসের ব্যবহার জ্বালানী হিসেবে খুবই ভাল। তাছাড়া এই গ্যাস দিয়ে ছোটখাটো মেশিনও চালানো যেতে পারে। কোথাও কোথাও গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উদাহরণের মত এরকম ব্যবহারের কথা জানা গেলেও আমাদের দেশের গোসম্পদের অনুপাতে সে-রকম কোন প্রচেষ্টা নেই বললেই চলে। সৌরশক্তির ব্যবহার তো অজানাই রয়ে গেছে এ পর্যন্ত। আমাদের দেশে এই ধরনের সাধারণ বিজ্ঞানের প্রযুক্তির অভাব মনকে পীড়িত করে তোলে।

এরপর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা থেকে যায় শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে। কলকাতার মানুষ যেমন বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে সচেতন হবেন, ঠিক তেমনি কলকাতার শিল্পপতিদেরও সজাগ হতে হবে কলকারখানার প্রতিক্রিয়া রোধ করতে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে তাঁদের বিদেশের বিজ্ঞানসম্মত পন্থাগুলির অনুসরণ করতে হবে বৈকি।

প্রকৃতির রিসাইক্লিং-এর কথা বলে লেখা শেষ করবো। আমাদের শরীর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম দিয়ে তৈরী। মানুষ যখন মারা যায় তখন তার শরীর আবার সেই পঞ্চভূতেই মিশে যায়। প্রকৃতির এই আশ্চর্য ভারসাম্য রক্ষার পথটি আমাদের আবিষ্কার করতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে। সেই পথেই বিজ্ঞানের প্রতিক্রিয়ারূপী 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'কে বশে আনতে হবে আমাদের। না আনলে ত্রাণ নেই।*

---

* সি.এম.ডি.এর পক্ষে কণিকা সরকার কর্তৃক লিখিত।

ভাসমান ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি জীবাণু বাতাসে ভেসে বেড়ায়। একজনের মুখের হাঁচি, কাশি, থুথু থেকে ছিটকে পড়ে বাতাসে। বাতাসে ভেসে ঢুকে পড়ে অন্যজনের শরীরে। ব্যাকটেরিয়ার বাতাসে ভেসে বেড়ানোর খবর প্রথম দেন ফরাসী রসায়নবিদ লুই পাস্তুর যিনি এর আগে জলাতংকের টীকা আবিষ্কার করেন।

প্রদীপ কুমার দাস।

[*Source* : Milestones in Medical Breakthroughs ; East India Pharmaceuticals Works Limited, Calcutta-700001,]

মহাকাশ-এ দূষণ ও তার প্রতিক্রিয়া

অমিতাভ রায়

মহাকাশযান অথবা কৃত্রিম উপগ্রহ ইদানীং উল্লেখযোগ্য উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারছে না। বিষয়টির মধ্যে তেমন কোন নূতনত্বর স্বাদ বোধ হয় আর পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিয়ে মহাকাশ পরিক্রমারও যান-উপগ্রহর ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে আধুনিক সমাজ-সভ্যতার প্রায় সমস্ত অংশের বিপুল সংখ্যক মানুষ যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। জ্ঞান-অজ্ঞতার পরিমাণে নিশ্চয়ই তারতম্য আছে। কিন্তু বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্বন্ধে জনমানসে একটা ওপর-ওপর ভাসা-ভাসা ধারণা সর্বত্র বর্তমান। আর প্রথম মহাকাশ পরিক্রমা প্রবর্তনের ছাব্বিশ বছর বাদেও এহেন ধারণা সৃষ্টি না হলে তা বোধ হয় এক চরম ব্যর্থতা বলে স্বীকৃত হতো।

তবে এখন বোধ হয় সেই সময় উপস্থিত, যখন মহাকাশ সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা-ভাবনাগুলি আরও সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নত, উন্নয়নশীলগুলির দৌলতে যে ভাবে মহাকাশ পরিক্রমারত যান-উপগ্রহর সংখ্যা বাড়ছে তার ফলে নিত্য নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। পর্যাপ্ত অগ্রগতি-উন্নতির তুলনায় সমস্যাদি নিশ্চয়ই অনেক কম কিন্তু তার ফলাফল যথেষ্ট মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। আর সেই বিষময় ফলাফলে আক্রান্ত হতে পারে পৃথিবীর যে কোন অধিবাসী। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ বিধ্বস্ত হতে পারে। আর আজ যখন সর্বত্র আমাদের প্রিয়তম এই গ্রহটির স্বাস্থ্যর সুরক্ষার তাগিদে সবাই ব্যস্ত তখন এ হেন বিষয়টি নিশ্চিতভাবে চিন্তার বিষয়। অতএব পরিবেশ দূষণ ও প্রকৃতির ভারসাম্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে কথাবার্তার সুযোগে এই বিশেষ বিষয়ে দু-চারটে কথা বলে নেওয়া যাক।

মহাকাশ পরিক্রমাকারী যান বা কৃত্রিম উপগ্রহগুলি দুই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছে। একটি মহাকাশ-বিজ্ঞান তথা মহাকাশ চর্চার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। অন্যটির ফলাফলে একদিকে যেমন বহু মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণী এবং প্রকৃতি আক্রান্ত হতে পারে অন্যদিকে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবও উল্লেখযোগ্য রকমের গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিক হিসেবে দেখা গেছে বিভিন্ন আকারের প্রায় 4800 বস্তু মহাকাশে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে মাত্র 1000টি হল বিভিন্ন উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপিত উপগ্রহ। বাদবাকী 3800-র মধ্যে নানা রকম বস্তু রয়েছে। যেমন—মৃত অর্থাৎ ব্যবহারের অনুপযোগী উপগ্রহ, উপগ্রহ বহনকারী রকেটের অংশ, অব্যবহারযোগ্য মহাকাশযান, ভেঙে যাওয়া মহাকাশযান কিংবা উপগ্রহর অংশ প্রভৃতি। এই সব অনিয়ন্ত্রণাধীন 3800 বস্তু মহাকাশ চর্চার ক্ষেত্রে সাংঘাতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কারণগুলি পর্যায়ক্রমে এই রকম—

1. যেহেতু এই বস্তুগুলি নিয়ন্ত্রণাধীন নয় সুতরাং এগুলির গতিবিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি সম্ভব নয়। ফলে নতুন মহাকাশ উৎক্ষেপণের সময় কিঞ্চিৎ অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে কয়েকটি কাল্পনিক কক্ষপথে মহাকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে স্থাপন করা হয়। এই কক্ষপথগুলি নির্দিষ্ট। এবং কোথায় কোন্ উপগ্রহটি সংস্থাপিত হবে তার স্থানাংক অনেক আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা হয়। মহাকাশ বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থানাংক নির্বাচনের কাজটি করে থাকে। এই সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী 1988 পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ যে সব মহাকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করবে তাদের স্থানাংক ইতিমধ্যেই স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। পূর্বনির্ধারিত স্থানাঙ্কে কোন উপগ্রহ পৌঁছাবার পূর্ব মুহূর্তে সেখানে যদি কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত উপগ্রহ বা রকেটের টুকরো হাজির হয় তা হলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী।

2. মহাকাশে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নতুন কৃত্রিম উপগ্রহ সংস্থাপনের স্থান সংকুলান হয়ে পড়েছে। অতএব মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এ প্রসঙ্গেও যথেষ্ট চিন্তিত।

3. মহাকাশের ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুগুলির যে কোনটি যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় পতিত হতে পারে। আর যেহেতু এগুলি সম্পূর্ণভাবে অনিয়ন্ত্রণাধীন অতএব এ হেন পতন যে-কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটাতে সক্ষম। দুর্ঘটনার ফলাফল পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া এ-জাতীয় দুই বা ততোধিক বস্তু হঠাৎ করে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে সম্মিলিত হলেও একটি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটবে। মহাকাশ চর্চার ক্ষেত্রে এ-হেন দুর্ঘটনার ফলাফল হবে অত্যন্ত মারাত্মক।

মহাকাশের এই সব আবর্জনা পরিষ্কারের তেমন কোন পরিকল্পনা এখনও পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি। সাধারণতঃ প্রতি 11 বছর পর যখন সূর্যকেন্দ্রের ঝড় প্রবল আকার ধারণ করে, তার প্রভাবে এই সব অবাঞ্ছনীয় আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আশা করা হয়। কিন্তু মধ্যবর্তী এগারো বছরে কি ভাবে এই আবর্জনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সে বিষয়ে

তেমন কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। অর্থাৎ মনুষ্যসৃষ্ট এই জাতীয় আবর্জনা নিষ্কাশনের দায়িত্ব এখনও প্রকৃতির হাতেই রয়েছে। বর্তমানে সূর্যকেন্দ্র শান্ত। পরবর্তীকালে সূর্যকেন্দ্রর ঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধির আগে পর্যন্ত মহাকাশে ধ্বংসপ্রাপ্ত অনিয়ন্ত্রণাধীন বস্তুর সংখ্যা 7000-এ দাঁড়াবে বলে বিশেষজ্ঞ মহল ধারণা করেছেন।

মহাকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠে পতিত বিকল মহাকাশযান, কৃত্রিম উপগ্রহ বা রকেট প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশ দূষিত করতে সক্ষম। আবার কখনও কখনও নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী মহাকাশযান, কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সময় দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।

1970-এ মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপোলো-13 মহাকাশে বিকল হয়ে গেলে তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। ফিরে আসার সময় অ্যাপোলো-13 থেকে একটি নিউক্লিয়ার শক্তিচালিত জেনারেটর প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ে যায়। আজও এই জেনারেটরটি উদ্ধার করা হয়নি। এই নিউক্লিয়ার শক্তিচালিত জেনারেটরটির জন্য জ্বালানী হিসেবে প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছিল। প্লুটোনিয়াম-এর তেজষ্ক্রিয় গুণাবলী সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং মহাকাশে বিকল হয়ে যাওয়া মহাকাশ-যানটি প্রশান্ত মহাসাগরে তেজষ্ক্রিয়তা জনিত দূষণ সৃষ্টি করেছে।

1964-তে অন্য একটি মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশের কক্ষপথে নিজেকে সংস্থাপিত করতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতি এই কৃত্রিম উপগ্রহটি ভারত মহাসাগরে ভেঙে পড়ে। পৃথিবীতে নেমে আসার সময় এই কৃত্রিম উপগ্রহটি থেকে প্রচুর পরিমাণে টক্সিক প্লুটোনিয়াম নির্গত হয়। টক্সিক প্লুটোনিয়াম তেজষ্ক্রিয় পদার্থ। এবং এই ক্ষেত্রে তেজষ্ক্রিয়তা আবহমণ্ডলকে প্রভাবান্বিত করে।

1978-এ সোভিয়েত-এর কৃত্রিম উপগ্রহ কস্‌মস্‌-954 মহাকাশে ভেঙে যায়। ভাঙার পূর্ব মুহূর্তে উপগ্রহটি কানাডার উপরে অবস্থিত ছিল। এবং ভূপৃষ্ঠে পড়বার সময় এই উপগ্রহটি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ তেজষ্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়েছিল।

এ-রকম অজস্র দুর্ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করা যায় মহাকাশ চর্চার ক্রমাগত অগ্রগতি একই সঙ্গে পৃথিবীতে দূষণ বাড়িয়ে তুলছে এবং মহাকাশকে আবর্জনার স্তূপ করে ফেলছে।

তা হলে কি মহাকাশ চর্চা বন্ধ করে দিতে হবে? মহাকাশ অভিযান স্তব্ধ করে দিতে হবে? না। সে কথা কেউ বলছে না। মাথা ব্যথা করলে মাথা কেটে ফেলার পরামর্শ কোন ডাক্তার দেয় না, তেমনি পৃথিবীর সমস্ত দেশের অগ্রণী বিজ্ঞানীরা, মহাকাশ চর্চা কেন্দ্রগুলি এবং মহাকাশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে, যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পরই যেন মহাকাশযান ও কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়। তাঁদের আরও অভিমত যে কোন উপগ্রহ উৎক্ষেপণের আগে আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মতি-সুপারিশ যেন গ্রহণ করা হয়।

স্বাভাবিক কারণেই সবচেয়ে বেশী চাপ ভূ-সমলয় কক্ষ বা Geo-stationary orbit-এর উপর পড়েছে। ভূ-সমলয় কক্ষের চাহিদা এত বেশী হবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান। ভূ-সমলয় কক্ষে অবস্থিত কৃত্রিম উপগ্রহ [যা সংক্ষেপে 'ভূ-সমলয় উপগ্রহ' নামে পরিচিত] পৃথিবীর যে কোন স্থানের সাপেক্ষে স্থির থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি [অর্থাৎ নিজের অক্ষকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর ঘূর্ণন] এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে কৃত্রিম উপগ্রহটির ঘূর্ণণের গতি সুসামঞ্জস্যতা লাভ করলে অর্থাৎ পৃথিবীর আহ্নিক গতি যদি উপগ্রহটির কক্ষ পরিক্রমার গতির সঙ্গে synchronized হয় তা হলেই উল্লিখিত স্থিরতা আনা যায়। বিষুবরেখার সমান্তরাল, পৃথিবী থেকে 36 হাজার কিলোমিটার দূরে কাল্পনিক কক্ষপথে কোন উপগ্রহকে স্থাপন করলেই এ হেন সুসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এই কক্ষপথকেই ভূ-সমলয় বা Geo-stationary কক্ষ বলে। এই কক্ষের কোন নির্দিষ্ট স্থানাঙ্কে স্থাপিত যে কোন উপগ্রহ সর্বদা পৃথিবীর যে কোন জায়গার দিকে মুখোমুখী থেকে নিশ্চলভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে পারে। সুতরাং, ভূ-সমলয় কক্ষর এত চাহিদা।

বর্তমানে ভূ-সমলয় কক্ষে অন্ততঃ 50টি কৃত্রিম উপগ্রহ রয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে এই কক্ষে আরও 50টি কৃত্রিম উপগ্রহ সংস্থাপিত হবে। তবে আশার কথা মহাকাশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুমতি এবং ঐ সংস্থা কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া কোন দেশই ভূ-সমলয় কক্ষে উপগ্রহ সংস্থাপন করতে পারে না। এতে অন্ততঃ ভূ-সমলয় কক্ষে বিভিন্ন উপগ্রহের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির আশঙ্কা অন্তর্হিত হয়েছে। তবে ভূ-সমলয় কক্ষও মহাকাশে অবস্থিত অনিয়ন্ত্রিত বস্তুমুক্ত নয়। ভারতের নতুন কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট-1বি এ জাতীয় কোন বস্তুকণা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুতরাং মহাকাশের আবর্জনা যে কোন মুহূর্তে মহাসংকট সৃষ্টি করতে পারে।

অর্থাৎ এ-কথা আজ পরিষ্কার যে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত বিভিন্ন মহাকাশ যান, কৃত্রিম উপগ্রহ, প্রভৃতির সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সাবধানতা না নেওয়ায় এবং বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা মহাকাশে পৌঁছানোর পর ব্যর্থ হওয়ার ফলেই বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটছে। যার অব্যবহিত ফল,—মহাকাশ আবর্জনা স্তূপের আধারে পরিণত হচ্ছে; পৃথিবীর পরিবেশ প্রত্যক্ষভাবে দূষিত হচ্ছে। এমনকি তেজষ্ক্রিয় দূষণের প্রতিক্রিয়ায়ও পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পৃথিবীর পরিবেশ প্রত্যক্ষভাবে দূষিত হচ্ছে। এর সঙ্গে সাম্প্রতিক সংযোজন হল মহাকাশযানের মাধ্যমে কিছু ক্ষতিকর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদন। সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিমান ও মহাকাশ সংক্রান্ত প্রখ্যাত পত্রিকায় বলা হয়েছে: 'শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 5 মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা বিশিষ্ট, এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ যন্ত্র সমন্বিত মহাকাশযান উৎক্ষেপন করবে যার থেকে 4 মিটার ব্যাসবিশিষ্ট লেজার রশ্মি ছোঁড়া যায়। এহেন বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীতে কি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা পরীক্ষা করে জানতে গেলেও পরিবেশ যথেষ্ট দূষিত হবে,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সুতরাং পরিবেশ দূষণ করতে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য অন্যান্য সমস্ত কিছুর মত মহাকাশের ক্ষেত্রে সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

পরিবেশ দূষণ ঃ সমস্যা ও প্রতিকার*

অরুণকুমার শর্মা

অনুবাদ—অনীশ দেব

আমাদের এই গ্রহের জল, মাটি ও বাতাসে প্রকৃতি পরম যত্নে লালন করছে অসংখ্য রকমের প্রাণ ও প্রাণীকে। লক্ষ লক্ষ বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিলো এইসব প্রাণ ও প্রাণীর—তাদের মধ্যে মানুষও আছে। প্রাণের বিবর্তনের সেই আদিকাল থেকেই প্রকৃতি ও পরিবেশে এক সাম্য বজায় ছিলো। বিভিন্ন প্রাণীর জন্ম-মৃত্যু, জীবনযাত্রা, অসুখ-বিসুখ, নিজেদের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, ইত্যাদির সঙ্গে ভূমিকম্প, বজ্রপাত, নানান ক্ষয়-ক্ষতি, প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা যুক্ত হয়ে জীবিত ও মৃত প্রাণীদের মধ্যে এক অদ্ভূত ভারসাম্য বজায় রেখেছে চিরকাল। এই ভারসাম্য সঠিক রাখতে এক এবং একমাত্র ভূমিকা ছিলো পরিবেশ ও প্রকৃতির। বিবর্তনের অন্যতম অবদান হলেও মানুষ নিজেই গড়ে তুলেছে নিজের পরিবেশ। মানুষের তৈরি এই পরিবেশ মানুষেরই সভ্যতার বিবর্তনের ফসল। সন্দেহ নেই, সভ্যতার বিবর্তন অনেক দিক থেকে ছাড়িয়ে গেছে মানুষের শারীরিক বিবর্তনকে। মানুষের নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রতিভা, পরিশ্রম, দক্ষতা তাকে রক্ষা করেছে নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে। একই সঙ্গে সে পেয়েছে সৃজনশীল চিন্তার অবাধ স্বাধীনতা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন পদ্ধতি এবং বহু রকমের যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানুষ নিজের প্রয়োজন ও পছন্দ মতো পরিবেশ তৈরি করে নিয়েছে। একদিকে বনজঙ্গল যেমন পরিষ্কার হয়েছে তেমনি অন্যদিকে তৈরি হয়েছে গো-চারণের উপযোগী তৃণভূমি, চাষবাস ও কৃষিকাজ বেড়ে উঠেছে বিপুল হারে, নিষ্কাশন ব্যবস্থা হয়েছে উন্নত, সোজা কথায় প্রাকৃতিক পৃথিবীর ফলনের ছাঁদ-ছন্দই আমূল বদলে গেছে।

মানুষের তৈরি পৃথিবীকে ঘিরেই পরিবেশ-সংক্রান্ত যতো আলোচনা, যতো বিতর্ক। মানুষের জীবন যাতে আরো সুখের হয়, আরো উন্নত হয়, এবং জাতীয় স্বার্থ যাতে নিরাপদ থাকে সে-দিকেই শিল্পবিপ্লবের আসল লক্ষ্য। দারিদ্র্য ও ক্ষুধাকে চিরনির্বাসন দিতেই ঘুরেছে সবুজ-বিপ্লবের চাকা। উন্নত বেতার যোগাযোগ এবং যানবাহন ব্যবস্থা চেষ্টা করছে মানুষের জীবন আরো সুখের করে তুলতে। এ-সমস্তই সভ্যতার অগ্রগতির ফলাফল। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে বিরাট পা ফেলে যে সভ্যতা এগিয়ে চলেছে তার কতকগুলো ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন আবর্জনা মানুষ ছড়িয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর পরিবেশে। শুধু মানুষের পক্ষেই নয়, পৃথিবীর গোটা জীবজগতের পক্ষেই এই সব দূষিত আবর্জনা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এইভাবে দূষিত পরিবেশ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। সুতরাং পরিবেশ দূষণের জন্য মূলতঃ দায়ী মানুষ ও তার প্রযুক্তি। যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির এ-এক অনিবার্য কুফল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের এই উপমহাদেশে পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা। জনসংখ্যা গত কয়েক দশক ধরে যে ভয়ংকর হারে বেড়ে চলেছে তাতে প্রাকৃতিক সম্পদ—জল, মাটি ও বাতাসের ওপর চাহিদার চাপ পড়েছে প্রচণ্ড। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগৎ। ফলে পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য টলে গেছে সংকটজনকভাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম পরিণতি জঙ্গল সাফাই—ফলে প্রাকৃতিক সম্ভারের ওপরে সরাসরি এসে পড়েছে অমানুষিক চাপ। এছাড়া রয়েছে ক্রমবর্ধমান হারে শক্তি উৎপাদনের চাহিদা। শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে নির্গত হয় এমন কিছু রাসায়নিক যা মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশকে করে তোলে দূষিত। ভারতের প্রতিটি প্রধান শহর এবং শিল্পকেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিকর রাসায়নিক বাতাস দূষিত করে রেখেছে। নোংরা জল ও খাদ্যশস্য দিনের পর দিন ব্যবহার করে মানুষের স্বাস্থ্য আক্রান্ত হচ্ছে। অতএব পরিবেশ দূষণে এদের অবদানও কম নয়। কথায় বলে, 'যিনি ভোরে ওঠেন ভগবান তাঁর সহায়'। এই আপ্তবাক্যটি আমাদের শহুরে জীবনে পুরোপুরি সত্যি। কারণ খুব ভোরে ছাড়া শহরে বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়ার কোন উপায় নেই।

বিভিন্ন মহলে পরিবেশের সাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে অনেকে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন। একই কারণে বন-সংরক্ষণের চেষ্টাও হচ্ছে। কিন্তু নিয়মিতভাবে মাটির ক্ষয়, প্রবল বন্যা, এবং খনিজসম্পদের সন্ধানে খোঁড়াখুঁড়ি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই চেষ্টার মুখে। শেষ পর্যন্ত যে জমিটুকু পড়ে থাকে তা রুক্ষ নিষ্ফলা, আর তার সঙ্গে থাকে খনিজ আবর্জনা। ফলে বনসম্পদ সমৃদ্ধ হবার উপায় মোটেই থাকে না।

বিশেষ করে গ্রামবাসীরা নিত্য দরকারী জ্বালানী হিসেবে গাছপালা ব্যবহার করে। এতেও লুপ্ত হয় বনসম্পদ। বিকল্প কোন জ্বালানীর ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বন-সংরক্ষণের চেষ্টা শুধুমাত্র চেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে।

* * *

যেসব বিভিন্ন অপদ্রব্য আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে

* ১৯৮১ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পঠিত সভাপতির ইংরেজী ভাষণের ভাবানুবাদ।

তাদের মোটামুটিভাবে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। প্রাকৃতিক দূষকের মধ্যে সীসে, পারদ, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড সবচেয়ে বেশী পরিচিত। এর মধ্যে কয়েকটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িতঃ মল, মূত্র ও শরীরের পচন থেকে তাদের উৎপত্তি। সুতরাং মানুষ এবং পালিত পশুর সংখ্যা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের দূষকেরা নিয়মিত হারে বেড়ে উঠতে থাকে। এছাড়া এর সঙ্গে জোট বাঁধে অজৈব দূষকেরা—বিভিন্ন জ্বালানীর দহনের ফলে যাদের জন্ম।

প্রাকৃতিক ছাড়াও রয়েছে কৃত্রিম দূষকের সমস্যা। শিল্প ও প্রযুক্তির শাখায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠছে এজাতীয় দূষকের পরিমাণ। কৃত্রিম দূষকের মধ্যে রয়েছে নানান কীটনাশক, গুঁড়ো সাবান, ওষুধপত্র ও প্রসাধন দ্রব্য, এমনকি প্লাস্টিকও। এসব যৌগের বেশ কয়েকটি আমাদের পরিবেশে দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকে। রোদ, জল, হাওয়া কিংবা জীবাণু এদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। একটা ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের বোতলের আয়ু মিশরের পিরামিড বা মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সভ্যতার চেয়েও ঢের বেশি হতে পারে। এ ধরনের যৌগ নিয়েই পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের বেশি মাথা ব্যথা। যেহেতু বিবর্তনের শুরু থেকে কিছুদিন আগে পর্যন্তও পৃথিবীতে এ ধরনের যৌগের কোন অস্তিত্ব ছিলো না, সেহেতু এজাতীয় দূষকের বিরুদ্ধে আমাদের শরীরে কোন প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠেনি। অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও সেই একই কথা।

দূষকের শ্রেণীবিভাগের পর আলোচনা করা যেতে পারে দূষণের বিভিন্ন প্রকার ও পদ্ধতি নিয়ে। প্রথমে ধরা যাক সমুদ্রের কথা।

সমুদ্র-দূষণের মূল কারণ বিভিন্ন শহরের নির্গম-নালী বেয়ে আসা দূষিত তরল ও আবর্জনা। সমুদ্রতীরে অবস্থিত শহরগুলোই এর জন্য পুরোপুরি দায়ী। এছাড়া পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্তনও সমুদ্র-দূষণে গৌণ ভূমিকা নেয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপদ্বীপ ও উপকূল অঞ্চলে সমুদ্র-দূষণের পরিমাণ নিয়মিত মাপা দরকার, এবং প্রয়োজনে সে-সব অঞ্চলে দূষণ বিরোধী বিধিনিষেধও কার্যকরী করা যেতে পারে। এই অঞ্চলগুলি হলো বিশাখাপত্তনম, ত্রিবান্দ্রম, কোচিন, গোয়া এবং বোম্বে।

সমুদ্র-দূষণের প্রধান প্রধান উপাদানগুলি হলো ভারী ধাতু, হ্যালোজেন নিষিক্ত হাইড্রোকার্বন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, পেট্রোলিয়াম, কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা এবং সর্বোপরি আবর্জনা। জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার ও দহন থেকে সমুদ্র তীরবর্তী আবহাওয়া দূষিত হয় এবং অনিবার্যভাবে সেই দূষণ আংশিক ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্রে।

সমুদ্র-দূষণের পরিমাণ কমিয়ে আনতে গোয়ার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওসানোগ্রাফি উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত সমস্ত কলকারখানাকে বিধিবদ্ধ নির্দেশ দিয়েছে যে ডুবো পাইপ ব্যবহার করে সমস্ত আবর্জনা ফেলতে হবে সমুদ্রের একটা নির্দিষ্ট গভীরতার নীচে। সুতরাং সমুদ্র-সংক্রান্ত পরিবেশ দূষণের সমস্ত সমস্যাগুলোই মনোযোগের সঙ্গে খতিয়ে দেখা দরকার। যদি পরিকল্পনাহীন পথে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয় তাহলে সমুদ্র-দূষণ মাত্রাহীন বেড়ে উঠবে এবং জল ও স্থলের জীবনযাত্রা হয়ে উঠবে আরও সংকটজনক।

নদ-নদী, পুকুর, খাল-বিল ইত্যাদির দূষণের জন্যও নালা-নর্দমা, ঘর-বাড়ির আবর্জনা ইত্যাদি দায়ী, এবং এই দূষণ থেকেই দূষিত হয় মাটি তারপর পানীয় জল। সুতরাং দূষিত জলকে পানযোগ্য করে তুলতে হলে উপযুক্ত পরিস্রাবন প্রয়োজন। কিন্তু পরিস্রাবনের ফলে পানীয় জল বিস্বাদ হয়ে যায়।

অতিরিক্ত সারজাতীয় আবর্জনায় দূষিত হয়ে কাশ্মীরের ডাল হ্রদে প্রচুর গাছপালা, জলজ উদ্ভিদ অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠেছে। ফলে কোন কোন জায়গায় জল সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এইভাবেই যদি চলতে থাকে তাহলে একদিন ডাল হ্রদ মনিপুরের লোক্‌তাক হ্রদের মতো পরিণত হবে কিংবদন্তীতে। যেসব হ্রদে অজৈব আবর্জনা দূষকের ভূমিকা নেয়—যেমন কলকারখানার নিকাশী রাসায়নিক—সেখানে জল হয়ে পড়ে দূষিত, দুর্গন্ধযুক্ত এবং ঘোলাটে।

আমাদের 'পবিত্র' গঙ্গা নদী পৃথিবীর দূষিত নদ-নদীর অন্যতম। যে-ধরনের কলকারখানার আবর্জনা আমাদের দেশের নদ-নদীকে দূষিত করে সেগুলো মোটামুটিভাবে কাপড়-কল, কাগজের মিল, চিনি-কল, ভেষজ তেল তৈরির কারখানা, কয়লা ধোলাই-কল, চামড়া পাকা করার কারখানা ইত্যাদি। গঙ্গার তীরে অবস্থিত দুটি অঞ্চল—কলকাতা ও হাওড়ায় পরিবেশ দূষণ এমন বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে যে এ-দুটি অঞ্চলের বাসিন্দারা কিভাবে এখনও টিকে আছেন ভাবতে অবাক লাগে। কলকাতায় অবস্থিত ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর উপকেন্দ্র একটি সমীক্ষার ভিত্তিতে জানায় হুগলী নদীর দুই তীরে 140 বর্গ কি.মি. বসতি অঞ্চলের পুরোটাই পরিবেশ দূষণের তরফ থেকে ভয়ংকর বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঠিক একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিহারের কয়লাখনি অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া দামোদর নদী। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল থেকে নিয়মিতভাবে যেসব দূষক দামোদরের জলে এসে মেশে সেগুলি হলো, ক্ষার, অ্যামোনিয়া, সায়ানাইড, ন্যাপথালিন, ফিনল ও আরো বহুরকম রাসায়নিক। দূষণের কবলে ঠিক একইভাবে আক্রান্ত সোন নদী, উত্তরপ্রদেশের গোমতী, দিল্লীর যমুনা, তুঙ্গভদ্রা, গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা ও মাইসোরের ভদ্রাবতী।

* * *

জল-দূষণের পর বায়ু-দূষণের প্রসঙ্গ। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম সম্ভার বায়ু। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ছাড়াও গাড়ি চালাতে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, কৃষিকাজে, রান্নাবান্না ও সবরকম উৎপাদন শিল্পে বায়ু অপরিহার্য। বরং বলা যায়, অন্যান্য কাজের তুলনায় শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজেই সবচেয়ে কম পরিমাণ বায়ু ব্যবহার করা হয়।

মানুষের তৈরি কিছু ক্ষতিকর বস্তু যখন আবহাওয়ায় মিশে গিয়ে প্রাণীজগতের শরীর ও জীবনযাত্রাকে সংক্রামিত করে তখন তাকে বলা যেত পারে বায়ু-দূষণ। বায়ু-দূষক তিন রকমের হতে পারেঃ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। কঠিন কণার মধ্যে ঝুলজাতীয় কার্বন-কণা থেকে শুরু করে ভারী ধাতু, জটিল জৈব

যৌগ, এমনকি নিউক্লীয় আবর্জনাও রয়েছে। কিছু কিছু সরাসরি উৎপন্ন হয় মানুষের কার্যকলাপ থেকে, অন্যান্যগুলি সূর্যের আলো এবং তাপে তৈরি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে—যেমন আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা।

মানুষের কার্যকলাপের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো জীবাশ্ম জ্বালানী—অর্থাৎ, তেল, কয়লা ইত্যাদি পুড়িয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া। এতে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ নিয়ত বেড়ে যাচ্ছে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ধর্ম হলো পৃথিবীপৃষ্ঠের অবলোহিত বিকিরণ শোষণ করা। কার্বন-ডাই-অক্সাইড অতিরিক্ত পরিমাণে না থাকলে এই বিকিরণ চলে যেতো মহাশূন্যে। কিন্তু শোষণের ফলে আমাদের আবহাওয়ার তাপমাত্রা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

মানুষের কার্যকলাপে আরও কিছু কিছু রাসায়নিক তৈরি হয় যাদের অবলোহিত বিকিরণ শোষণের ক্ষমতা আছে। এগুলি হলো ক্লোরোফ্লুরোমিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে আমরা যে দূষণের মুখোমুখি হয়ে পড়ি তার নাম তাপ-দূষণ।

পৃথিবীর বিভিন্ন শহরের ওপরে ঝাপসা ঘেরাটোপের মতো যে ধোঁয়াশা লক্ষ্য করা যায় তা মূলতঃ কুয়াশা এবং কয়লা ও তেল দহনের ফলে নির্গত গ্যাসের মিশ্রণ। এজাতীয় দূষকের ক্ষতিকারক ক্ষমতা মারাত্মক। বিশেষ করে যাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট আছে তাঁদের পক্ষে এ ধরনের দূষক প্রাণঘাতী পর্যন্ত হয়ে উঠতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী ব্রংকাইটিস এবং ফুসফুস-ক্যান্সার এজাতীয় দূষণেরই ফলাফল। এই দুটি রোগ বেশি দেখা যায় শহর ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চল এলাকায়, যেখানে কয়লা ও তেল প্রচুরভাবে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ধাতু, পাথর ও অন্যান্য বস্তুর ওপরেও এই দূষণের প্রভাব তুচ্ছ নয়। এর সব থেকে বড় উদাহরণ হলো ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ তাজমহলের ক্ষয়-ক্ষতি।

বিভিন্ন যানবাহনের নির্গম নল দিয়ে যে ধোঁয়া বেরিয়ে আসে তা সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এসে তৈরি করে আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা। অক্সাইড ও হাইড্রোকার্বনের বিক্রিয়ায় তৈরি হয় আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশার কয়েকটি বায়ুদূষক, এদের অন্যতম উদাহরণ হলো, ওজোন গ্যাস ও পারক্সিঅ্যাসিটাল নাইট্রেট। এ-দুটি উপাদানই তরিতরকারি ও শস্যের ক্ষতি করে। এছাড়া ওজোন ফুসফুসকেও কম-বেশি আক্রমণ করে থাকে।

প্রায়ই দাবী করা হয় যে পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পশহরগুলির চেয়ে আমাদের দেশে দূষণের সমস্যা কম। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে যতো যানবাহন চলে, এবং প্রতি একক বর্গক্ষেত্রে যে পরিমাণ গ্যাস তাদের ইঞ্জিন থেকে নির্গত হয়, তা অনেক উন্নত দেশের সঙ্গেই তুলনীয়।

আরও এক ধরনের বায়ুদূষক আমাদের আবহাওয়ায় ছড়িয়ে আছে। সেগুলো হলো হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো বীজাণু। বিভিন্ন অ্যালার্জিজনিত রোগে এই ধরনের বীজাণুই প্রধান ভূমিকা নেয়। আজকাল অ্যালার্জি-আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা মোটেই উপেক্ষা করার মতো নয়।

আমাদের দেশের প্রধান শহরগুলো বায়ু দূষণের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। শুধুমাত্র জ্বালানী খরচের ভিত্তিতে দিল্লীতে প্রতিদিন 65·5 ঘন কি.মি. বায়ু দরকার, কলকাতায় দরকার হয় 86·0 ঘন কি.মি. আর বম্বের বেলায় তার পরিমাণ 81·5 ঘন কি.মি। এক টন খনিজ আকরিকের দহন সুসম্পন্ন করতে প্রায় 12 টন বাতাস প্রয়োজন। যদি শহরগুলোর একটি কাল্পনিক ছাদের কথা ভাবা যায়, এবং এই ছাদটির উচ্চতা যদি গড়ে 1000 ফুট ধরা হয়, তাহলে দিল্লী, কলকাতা ও বম্বের দূষিত অঞ্চলের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে 80, 105 ও 100 বর্গমাইল। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে জলবায়ু যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। বায়ু দূষণের প্রভাব সবচেয়ে ক্ষতিকর শিশুদের ওপর। এই প্রভাবের সরাসরি কুফল প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের সাধারণ স্বাস্থ্যের বিপজ্জনক অবনতি। এছাড়া দূষণের ফলে শিশুদের বৃদ্ধির হারও কমে আসে।

বায়ুদূষণের ভয়াবহ বিপদ উপলব্ধি করে উন্নত দেশগুলির অনেকেই এই সমস্যার সমাধানে জরুরী ব্যবস্থা নিয়েছে। বাতাসে দূষিত গ্যাস ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে তারা বিভিন্ন বিধিনিষেধ জারী করেছে যা অমান্য করলে কঠিন দণ্ড পেতে হয়। তাছাড়া কোন বিশেষ অঞ্চলে বাতাসের বিশুদ্ধতা ও চরিত্র নির্ণয় করে কি পরিমাণ দূষক তাতে অনুমোদন করা চলতে পারে এ-নিয়ে বিভিন্ন গবেষণায় যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

এটা খুবই আনন্দের কথা, যে-ক'টি মুষ্টিমেয় দেশে দূষণ-বিরোধী আইনকানুন জারী হয়েছে তার মধ্যে ভারত অন্যতম। কলকাতায় প্রথম এ-ধরনের আইন জারী হয় 1905 সালে, তারপর 1912 সালে বম্বেতে, 1958-য় কানপুরে, এবং তারও পরে গুজরাট ও দিল্লীতে। এই আইনগুলো যে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন তা বলা যায় না, এবং এগুলির লক্ষ্য প্রধানত কলকারখানা।

উল্লেখিত ত্রুটি ছাড়াও এই আইনগুলো তেমনভাবে বলবৎ করা হয় না এবং আইনভঙ্গের শাস্তিও তেমন কঠিন নয়। শিল্পঅঞ্চল ও মানুষের বাসস্থান একসঙ্গে মিলে মিশে গেছে এমন উদাহরণ আমাদের দেশে সুপ্রচুর। ফলে কলকারখানা থেকে নির্গত দূষিত গ্যাস প্রভৃতি স্থানীয় অধিবাসীদের দূষণে আক্রান্ত করে। খুবই দুঃখের কথা, সুপরিকল্পিত শহর দিল্লীর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বেশ কয়েক টন সালফার ডাই-অক্সাইড ও ঝুল প্রতিদিন উগরে দেয় শহরের বাতাসে। কি অদ্ভুত পরিহাস, বায়ুদূষণের অন্যতম উৎস এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি যে-সব সংস্থার কাছাকাছি অবস্থিত সেগুলি হলো : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জাতীয় বিজ্ঞান অকাদেমী, বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান কমিশন, ভারতীয় চিকিৎসক সংঘ ইত্যাদি। এটাই বোধহয় পরিবেশ দূষণের প্রতি আমাদের উদাসীনতার চরম নজীর।

বায়ুকে দূষিত করে যেসব পদার্থ তাদের নিয়ন্ত্রণ বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। কারণ দূষিত বায়ুকে সংগ্রহ করে রাসায়নিক পদ্ধতিতে তাকে বিশুদ্ধ করে পরিবেশে ছড়িয়ে দেওয়া ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভব নয়। তবু তিনটি বিভিন্ন পথে এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব :

(1) কলকারখানার দহন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্গত দূষকের পরিমাণ হ্রাস করা।

(2) দূষকগুলিকে আরও বড় এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া যাতে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় দূষণের প্রভাব ঘনীভূত না হয়। অবশ্য এতে কলকারখানার দূরবর্তী অঞ্চলগুলি গুরুতরভাবে আক্রান্ত হতে পারে।

(3) দহনে উৎপন্ন গ্যাসে অতিরিক্ত কোন পদার্থ মিশিয়ে দেওয়া যাতে নির্গত হবার আগে কোন কোন দূষক অপসারিত হতে পারে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির জরুরী প্রয়োগ প্রয়োজন।

বায়ুদূষণে গাছপালা শাকসব্জী ইত্যাদি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষতঃ সালফার অক্সাইড, ওজোন, পারক্সিলঅ্যাসিটেট নাইট্রেট, নাইট্রোজেন অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, ইথিলিন, পারদ ও আরও কয়েকটি ভারী ধাতু উদ্ভিদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। দীর্ঘকাল বায়ুদূষণে আক্রান্ত হয়ে বিবর্তনের ফলে এমন এক শ্রেণীর উদ্ভিদের জন্ম হয়েছে যারা সহজাতভাবে দূষণ প্রতিরোধ করতে পারে। এ থেকে কোন কোন শ্রেণীর উদ্ভিদের দূষিত আবহাওয়া সহ্য করার ক্ষমতা কতোটুকু, তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভারী ধাতুজনিত দূষণ সহ্য করতে পারে এমন শ্রেণীর উদ্ভিদের সংখ্যা কম নয়। দূষণের পরিমাপ নির্ধারণ করতে এ-জাতীয় উদ্ভিদকে বেশ ভালোরকম কাজে লাগানো যায়। এছাড়া দূষণ-প্রতিরোধী উদ্ভিদ দূষকের সঙ্গে মিশে তার দূষণ ক্ষমতাকে অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে। সুতরাং শহর ও গ্রামাঞ্চলে বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনা কার্যকরী করার সময়ে দূষণ প্রতিরোধী উদ্ভিদের ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী।

* * *

পরিবেশ দূষণের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হলো শব্দ-দূষণ। যে-সব শব্দ শ্রোতার মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাকেই বলা হয় অপস্বর বা নয়েজ। বিভিন্ন শিল্পে শক্তির রূপান্তর ঘটানোর সময় অপস্বর এক বাড়তি ফসল হিসেবে উৎপন্ন হয়। শব্দদূষণের পরিভাষায় প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত অপস্বর মাত্রা মাপা হয় ডেসিবেল এককে। কোনরকম বাধানিষেধ না থাকায় পশ্চিমের দেশগুলির তুলনায় ভারতীয় শহরগুলিতে অপস্বরের মাত্রা অনেক বেশি। কলকাতা, বম্বে এবং দিল্লী পৃথিবীর সর্বাধিক অপস্বরপ্রধান শহরগুলির অন্যতম। এই শহরগুলিতে বারো বছর আগে অপস্বর-মাত্রা ছিলো 90 ডেসিবেল। বিমানবন্দর এবং রেল স্টেশনগুলিই হলো সবচেয়ে শব্দময় এলাকা।

শব্দের 20 থেকে 40 ডেসিবেল পর্যন্ত মাত্রাকে ধরা হয় স্বাভাবিক, এবং 120 ডেসিবেল মাত্রায় পৌঁছলে তার পরিণাম হতে পারে ভয়াবহ। শব্দদূষণে যেসব দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তা হলো, শ্রবণক্ষমতার বিলোপ, মানসিক বিপর্যয়, রক্তচাপ, নিদ্রা-রোগ, হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি এবং স্নায়বিক অস্থিরতা। উন্নত দেশগুলির বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই অপস্বর-এলাকা হলো বিমানবন্দর ও তার আশেপাশের অঞ্চল।

শব্দদূষণ সমস্যার তিনটে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে : উৎস, বিস্তার ও শ্রোতা। উৎস আমাদের খুব পরিচিত এবং এটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন যানবাহন, জেট ইঞ্জিন ইত্যাদি হলো কয়েকটি প্রধান উৎস। শব্দের বিস্তার নির্ভর করে একাধিক জিনিসের ওপর—যেমন, আবহাওয়া, বাতাসের গতিবেগ, তাপমাত্রার পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বাধা ইত্যাদি। দূরত্ব অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের ডেসিবেল-মাত্রা কমতে থাকে। আর শ্রোতাদের ওপর শব্দদূষণের কুপ্রভাব কমাতে প্রধান উপায় হলো শব্দদূষিত পরিবেশে কান আক্রান্ত হবার মতো খোলাখুলি অবস্থায় না রাখা। এর প্রতিরোধে তুলো কিংবা শব্দনিরোধী কক্ষের ব্যবহার প্রস্তাব করা যেতে পারে। স্নায়বিক অস্থিরতা যুক্ত জীবনযাপন করতে গেলে শ্রবণক্ষমতা অটুট রাখা একান্ত জরুরী।

* * *

আয়নকারী বিকিরণ শক্তির এক ক্ষমতাশালী উৎস। সায়ানাইড বা অন্যান্য বিকারকের তুলনায় এর তাপশক্তি দশ কোটিগুণ তীব্র। তেজষ্ক্রিয় দূষণের বিপদ সবচেয়ে বেশি নিহিত পারমাণবিক যুদ্ধ এবং পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। 1945 সালে হিরোশিমা ও নাগাসাকির মর্মান্তিক ঘটনার পর পরমাণু-যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা অনেক বেড়েছে। 1963 সালে একটি মার্কিন নিউক্লীয় সাবমেরিন অতলান্তিক সাগরে হারিয়ে যায়। তখন তা থেকে প্রচুর পরিমাণে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে। সুতরাং বিশ্বযুদ্ধে যদি পারমাণবিক ব্যবহার নাও করা হয় তা সত্ত্বেও সমুদ্রের তেজষ্ক্রিয়-দূষণ মানবজাতির পক্ষে এক অবিচল বিপদ সংকেত।

নিউক্লীয় জ্বালানী উৎপাদন কেন্দ্রের আবর্জনা প্রায় 600 বছর তার ক্ষতিকারক ক্ষমতা নিয়ে টিকে থাকতে পারে। প্লুটোনিয়ামের অর্ধ আয়ু 24,360 বছর, এবং তার ক্ষতি করার ক্ষমতা এই অর্ধ আয়ুর কয়েকগুণ সময় পর্যন্ত বজায় থাকতে পারে। এ থেকেই তেজষ্ক্রিয়-দূষণ সমস্যার ভয়াবহতা অনুমান করা যেতে পারে।

পরমাণু চুল্লীর আবর্জনা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় প্রযুক্তিবিদ্যার সাম্প্রতিক অগ্রগতি এমন সব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে যার ফলে নিউক্লীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিবেশে কোন তেজষ্ক্রিয়তা থাকবে না। এই পদ্ধতিতে আর্থিক খরচও কম। বিভিন্ন নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ বর্তমানে পরমাণু চুল্লীকে যথাসম্ভব নিরাপদ করে তুলেছে, তবে অবশ্যই আর্থিক খরচের বিনিময়ে।

* * *

পরিবেশ-দূষণ সমস্যা নিয়ে সকল দেশই যে বেশ চিন্তিত তার প্রমাণ গত 1972 সালে স্টকহোম-এ 'মানুষের পরিবেশ' নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশন। আরও বহু সংস্থা পরিবেশ-দূষণের মোকাবিলা করতে সার্বিকভাবে কাজ শুরু করেছে। প্রতি বছর পালিত হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস।

সুইডেন, জাপান, সিঙ্গাপুর, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানী ও অন্যান্য বহু দেশে জাতীয় স্তরে গঠিত হয়েছে পরিবেশ সংস্থা—পরিবেশ-সংরক্ষণের চেষ্টায় যারা সতত নিরত।

বৃটেন-এ টেম্স্ নদীর জল শোধনের কাজ শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগে, এবং স্যামন মাছ আবার দেখা দিয়েছে টেম্স্-এর জলে। জার্মানীতে পরিবেশ-সংরক্ষণ নীতি অনেক জোরদার হয়েছে। দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে সিঙ্গাপুর সক্রিয়ভাবে যথেষ্ট এগিয়ে গেছে দূষিত পরিবেশের মোকাবিলায়। জাপানও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জোরালো আইনকানুন বলবৎ করেছে।

1948-এ গঠিত ভারতীয় সংবিধানের 48A নং ধারায় পরিবেশদূষণ প্রতিরোধের শর্ত আরোপ করা রয়েছে। এছাড়া 1948 সালেই স্থাপিত হয় 'ভারতীয় মান প্রতিষ্ঠান'। এই

প্রতিষ্ঠান সমস্তরকম কলকারখানা, এমনকি খনিরও সর্ববিষয়ের ভারতীর মান বেঁধে দেয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিশোধনের জন্য ভারতে একাধিক আইন জারি করা হয়।

ভারতে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে গঠিত 'বন্যপ্রাণী পর্ষদ'-এর মূল লক্ষ্য হলো প্রকৃতি ও পরিবেশকে সংরক্ষণ করে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের উপযোগী পারিপার্শ্বিক তৈরি করা। এছাড়া পরিবেশ-সংরক্ষণের আনুষঙ্গিক সমস্যার প্রতিকারে একযোগে কাজে নেমেছে ভারতের বহু রাজ্যের বহু সংস্থা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হলো 'পরিবেশ-সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও সমন্বয়সাধনমূলক জাতীয়' সমিতি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনের ঠিক পরেই 1972 সালে মূলতঃ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে এই সংস্থা গঠিত হয়।

এতো সব দেখেশুনে কি বিশ্বাস হতে মন চায় যে ভারতবর্ষেরই প্রধান প্রধান শহর ও নদীগুলি পরিবেশ দূষণের চরম নজীর। অথচ এই ভারতেই কলকারখানাজাত দূষণের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিলো 1905 সালে, ভারতীয় সংবিধানে রয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে প্রণীত বিধিনিষেধ। এতো সত্ত্বেও কেন আমাদের দেশে পরিবেশ-দূষণের এই ভয়াবহ রূপ তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করা তেমন কঠিন নয় :

(1) নিঃসন্দেহে মাত্রাতিরিক্ত হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধি পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনার পক্ষে এক প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(2) পরিবেশ-সমস্যা সম্পর্কে শুধু যে দেশের অশিক্ষিত নাগরিকরাই সচেতন নন তা নয়, শিক্ষিত জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশও এ বিষয়ে উদাসীন।

(3) পরিবেশ-দূষণ নিয়ন্ত্রণে যে-সব বিধিনিষেধ বর্তমান সেগুলি অনুসরণ করার ব্যাপারে সর্বজনীন গাফিলতি।

(4) ভারতের প্রায় সব শিল্পপতি দূষণ সমস্যার প্রধান হোতা। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে তাঁদের মূল লক্ষ্য শুধুই অধিক মুনাফা; ফলে পরিবেশ-সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোন আইন বা নীতি তাঁরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না।

মূলতঃ এই চারটি কারণেই পরিবেশ দূষণ আমাদের দেশে এক বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

* * *

প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব রাখা যেতে পারে। নিম্নলিখিত সুপারিশ বা প্রস্তাবগুলি কার্যকরী হলে আবার হয়তো বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য, বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাবে পান করার জন্য, খাদ্য আর দূষিত হবে না, চিকিৎসায় আরোগ্যের জন্য পাওয়া যাবে উপযোগী ওষুধ, সকলের জন্য পাওয়া যাবে স্বাস্থ্যকর আবাস—সব মিলিয়ে তৈরি হবে সমৃদ্ধি ও উন্নতির উপযোগী অনুকূল পরিবেশ :

(1) অবিলম্বে বায়ুদূষণ ও জলদূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনপ্রণয়ন এবং তা বলবৎ করা উচিত।

(2) কৃষিকাজের বিভিন্ন রাসায়নিক যথা কীটনাশক, সার ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট মান বেঁধে দিতে হবে। একই সঙ্গে অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত রাসায়নিকের মান সময়ে সময়ে নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত।

(3) শিল্প আইন (1976), ওষুধ নিয়ন্ত্রণ আইন (1955), ভেজাল খাদ্য সংক্রান্ত আইন (1976) ও কীটনাশক আইনকে কঠিনভাবে মেনে চলতে সকলকে বাধ্য করতে হবে। প্রসঙ্গত, কিছু কিছু নতুন রাসায়নিক প্রবর্তনের ফলে উপরোক্ত আইনগুলির সামান্য রদবদল প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রয়োজন আইনভঙ্গকারীদের কঠিন শাস্তি ও কঠোর কারাদণ্ডের ব্যবস্থাও করতে হবে।

(4) পরিবেশ-সংরক্ষণকে সংবিধানের অন্তর্গত করতে হবে।

(5) শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে যুগ্মভাবে বায়ুদূষণ ও জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের গবেষণার উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

(6) শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিটি স্কুল ও কলেজে 'পরিবেশ-শিক্ষা' বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(7) শহর ও গ্রামের জনসাধারণকে পরিবেশদূষণ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে প্রতিটি বিজ্ঞান সংগঠন, শিক্ষা-সদন, জাতীয় সমিতি প্রভৃতিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

(8) বনবিভাগ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে আবহাওয়া-উপযোগী বৃক্ষরোপণে নিয়মিত মনোযোগ দিতে হবে। গাছ কেটে জঙ্গলের ক্ষতি করা আইনজারি করে নিষিদ্ধ করতে হবে।

(9) প্রত্যেক রাজ্যে সক্রিয় 'বন্য প্রাণী পর্ষদ' 'পরিবেশ-বিভাগ' গঠন করতে হবে। এই দুটি বিভাগ পরিবেশ ও প্রকৃতির স্বার্থরক্ষায় রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে।

(10) খনি বা সমজাতীয় শিল্পে ব্যবহৃত জমিকে পুনরুদ্ধার করে সজীব অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে। এবং এই দায়িত্ব বর্তাবে সম্পূর্ণভাবে শিল্পমালিকদের ওপর।

(11) উদ্ভিদের নিরাপত্তাকালে যে কোন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে রাজ্যস্তরে উৎসাহ দিতে হবে।

(12) কৃষিকাজে কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব-নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

(13) বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণের স্বার্থে লুপ্তপ্রায় প্রজাতি-গুলির তালিকার নিয়মিত সংস্করণ প্রয়োজন।

(14) কৃষিক্ষেত্র অথবা জনবসতির কাছাকাছি ইটখোলা আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে।

(15) প্রতিটি রাজ্যে দূষিত ও বুজে যাওয়া নদী-খাল-বিল পরিষ্কার করে সেগুলো সজীব রাখতে হবে।

(16) যে-সব শক্তির উৎস পরিবেশ-বিপর্যয় ঘটায় না, সে-জাতীয় উৎসের প্রসার ঘটাতে হবে।

(17) সমুদ্র-সম্পদ সংরক্ষণ এবং সমুদ্রকে দূষণ-বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে উপযুক্ত দায়িত্বশীল বিভাগ গঠন করতে হবে।

(18) উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত কলকারখানার আবর্জনাবাহী সমস্ত নির্গম-নল সমুদ্রের তলদেশ থেকে 17-20 মিটার উচ্চতার মধ্যে তাদের আবর্জনা নিক্ষেপ করবে।

(19) আবহাওয়ার পূর্বাভাস, কৃষিকাজ ও বাতাসে ভাসমান কণার নিখুঁত হদিস পেতে উপগ্রহ ও মহাকাশ-বিজ্ঞানের চর্চা আরও ব্যাপক করা প্রয়োজন। এর ফলে পরিবেশ ও প্রকৃতির সূক্ষ্মতম পরিবর্তনের জন্যেও মানুষ আগে-ভাগে তৈরি থাকতে থাকে।

(20) জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে প্রতিটি ধাপে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

(21) শহর ও গ্রামাঞ্চলের পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তরে বাস্তু-বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিজ্ঞানীদের যুক্ত থাকা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে পরিবেশবিজ্ঞান বা বাস্তুবিজ্ঞান চর্চা আমাদের বিলাস নয়, আমাদের পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নও নয়, স্রেফ জীবনধারণের জন্য এই চর্চা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন।

আশা করা যায় উল্লেখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করলে আমরা নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে পরিবেশ দূষণের অশুভ আক্রমণের আরও সুষ্ঠু মোকাবিলা করতে পারি। দূষিত পরিবেশে প্রতিভার বিকাশ ঘটে না, উদ্ভাবনী দক্ষতা ক্ষয়ে আসে এবং নিত্যনতুন আবিষ্কার হয়ে পড়ে সুদূর পরাহত। দূষণের ফলে আমাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা নষ্ট হয়, জীবনের মূল্যবোধ কমে আসে এবং আমাদের শরীর ও মনে অপবস্তু জন্ম নেয়। দূষণের ফলে কোন বিজ্ঞানসাধক তার মৌল দর্শনের অনুগত থাকতে পারে না। কারণ মানবজীবনের দুর্দশা ও যন্ত্রণা দূর করতেই সে উন্নত করে তোলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে, নিয়ত অনুসন্ধান করে চলে সত্যের। পরিবেশ-দূষণকে দূর করতে পারলে শুধু যে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থারই উন্নতি হবে তা নয়, এর মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের সার্বিক জীবন তথা অস্তিত্বের মূলমন্ত্র। সুতরাং এই সমস্যাটির যতোখানি মনোযোগ ও গুরুত্ব পাওয়া উচিত ঠিক ততোখানিই সে আমাদের কাছে দাবী করে।*

---

* এই অনুবাদের কাজে পরিভাষাসংক্রান্ত সহযোগিতা পেয়েছি শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রণীত 'পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা' ও সংসদ অভিধান থেকে। আর সামান্য কিছু পরিভাষা প্রয়োজনের তাগিদে নিজেকেই তৈরী করে নিতে হয়েছে॥ অনুবাদক

রাজ্য সরকার-এর 'পরিবেশ বিভাগ'-এর কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান

—পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'পরিবেশ বিভাগ, মূলতঃ দুটি বিষয়ের উপর কাজ ক'রছে ; এর একটি হ'ল জলদূষণ এবং অপরটি বায়ুদূষণ।

জলদূষণ :

1974 সালের 'জলদূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ' আইনের বলে ঐ বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে 'পশ্চিমবঙ্গ জলদূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ' গঠিত হয়। পর্ষদের কার্যাবলী চারভাগে বিভক্ত— (১) অনুমোদন, (২) দূষণ পর্যবেক্ষণ, (৩) কর আরোপ এবং (৪) বিশ্লেষণ ও গবেষণা।

(১) **অনুমোদন**—বিভিন্ন সংস্থায় জলদূষণ রোধের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে কিনা সেই হিসাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত আইন অনুযায়ী মোট 644টি সংস্থা আবেদন জমা দিয়েছে, যার মধ্যে 575টি সংস্থার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। আরও 783টি সংস্থায় অনুসন্ধান চালানো হয়েছে।

অনুমোদনের পরেও সংস্থাগুলিতে নিয়মাবলী ঠিকমত পালন করা হচ্ছে কিনা খোঁজ খবর নেওয়াও এই বিভাগের কাজ। 1981 সালের পর থেকে এ পর্যন্ত এইরূপ 220টি সংস্থায় খোঁজ-খবর নেওয়া হয়েছে এবং 6টি সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।

(২) **দূষণ পর্যবেক্ষণ**—গঙ্গার তীর বরাবর 9টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রগুলি থেকে পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে গঙ্গার জলে জীবজন্তুর দেহাবশেষ জনিত দূষণের মাত্রা মোটামুটিভাবে 'জাতীয় মান নির্দেশক প্রতিষ্ঠান' (ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডারডাইজেশন্ ইনস্টিটিউশন—ISI) এর নির্ধারিত 'মান' এবং 'পরিশোধনের পরে সর্বসাধারণের ব্যবহার যোগ্য' মানের মধ্যেই আছে। তবে মলমূত্র ও কারখানা নিঃসৃত আবর্জনা জনিত দূষণের মাত্রা খুবই বেশী বলে ধরা পড়েছে।

এজন্য শর্তাধীন অনুমোদন দেবার সময় বিভিন্ন কল-কারখানায় আবর্জনাযুক্ত জল শোধনের সরঞ্জাম বসাতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত 31টি সংস্থা যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। ইতিমধ্যে প্রধান প্রধান প্রায় 250 রকম দূষণের একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী ধাপে ধাপে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে।

(৩) **কর**—1977 সালের জলদূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ কর আইন অনুযায়ী তরল আবর্জনা নির্গতকারী কলকারখানা ও অন্যান্য সংস্থার উপর বিশেষ কর ধার্য্য করা হয়েছে। সংস্থাগুলির ব্যবহার্য জলের পরিমাণের আনুপাতিক হারে এই কর ধার্য্য হয়। নিয়মানুযায়ী করের সমস্ত টাকা ভারত সরকারের তহবিলে জমা পড়ে। এইভাবে জমা পড়া করের একটা অংশ 'রাজ্য পর্ষদ'কে তার খরচ চালানোর জন্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এ পর্যন্ত মোট 50টি সংস্থার উপর আরোপিত প্রায় 15.97 লক্ষ টাকা করের মধ্যে আনুমানিক 5.39 লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে।

কর আদায় সাপেক্ষে পর্ষদের ব্যয়ভার রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা খাতের ব্যয় বরাদ্দ থেকে ভরতুকী দিয়ে চালানো হয়। পূর্ববর্তী তিন বৎসরে যথা 1980-81 সালে 7 লক্ষ টাকা ; 81-82 সালে 10 লক্ষ টাকা এবং 82-83 সালে 8.5 লক্ষ টাকা ভরতুকি দেওয়া হয়েছে।

(৪) **গবেষণা**—কলকারখানা এবং শহর নিঃসৃত আবর্জনা দ্বারা জল দূষণের সমস্যাবলী সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও গবেষণার জন্য রাজ্য পর্ষদ বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। আনুমানিক 22 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 8টি বিশেষ পরিকল্পনা ভারত সরকারের 'পরিবেশ বিভাগ'-এর অনুমোদন এবং আর্থিক সহায়তার জন্য পাঠান হয়েছে।

বায়ুদূষণ :

1905 সালের 'বঙ্গীয় ধোঁয়াদূষণ আইন' (বেঙ্গল স্মোক নুইসেন্সেস অ্যাক্ট-1905—Bengal Smoke Nuisances Act—1905)-এর বলে 'পশ্চিমবঙ্গ ধোঁয়া দূষণ কমিশন' গঠিত হয়। কমিশনের কাজ বিভিন্ন সংস্থা থেকে নির্গত ধোঁয়ায় বাতাস দূষণের পরিমাপ এবং তদনুযায়ী যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।

এই আইন অনুযায়ী 1982-83 সালে 120টি সংস্থার নক্সার অনুমোদন দেওয়া হয়। আরও 200টি সংস্থাকে নক্সা দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনুমোদন দেওয়ার জন্য ফি বাবদ 46.66 হাজার টাকা আদায় হয়েছে।

বাতাসে ধোঁয়ার পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য 74টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণের ফলে 1000টি সংস্থা আইন ভাঙার দায়ে দোষী বলে জানা যায় ; সংস্থাগুলিকে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে গবেষণার কাজও বেশ এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের

শিল্পাঞ্চল, বড় বড় শহর এবং জেলাগুলিতে ইতিমধ্যেই কয়েকটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। সমীক্ষার ফলাফল নথিভুক্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ চলছে।

1981 সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় সরকার 'বায়ুদূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন' নামে একটি আইন চালু করেছে। এর ফলে 'বঙ্গীয় ধোঁয়াদূষণ আইন' কার্যতঃ বাতিল হয়ে গেছে। অবশ্য পুরাতন আইনের যে ধারাগুলি নতুন আইনের পরিপন্থী নয় সেগুলি চালু থাকবে। নতুন আইনের প্রয়োগের দায়িত্ব রাজ্য জলদূষণ ও নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকেই দেওয়া হয়েছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় কতটা পরিমাণ ধোঁয়া নির্গত করা যেতে পারে তার অনুমোদিত মাত্রা কেন্দ্রীয় পর্ষদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা হবে।

দূষণ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও পরিবেশ বিভাগ দৃষ্টি দিয়েছে

কলকাতা শহরে বাণিজ্যিক মোটরযানগুলি ধোঁয়া এবং শব্দ দূষণের অন্যতম উৎস। অতিরিক্ত কালো ধোঁয়া এবং শব্দ উৎপাদনকারী 'এয়ার হর্ন' এর ব্যবহার বন্ধ করার জন্য পুলিশ ও যানবাহন বিভাগকে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বহুসংখ্যক যানবাহনকে উপরোক্ত ত্রুটিগুলি ঠিক না করা পর্যন্ত চলাচল করার বৈধ ছাড়পত্র প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা তাদের প্রায় 40/50টি গাড়ীতে বিশেষ ধরনের সরঞ্জাম লাগিয়ে ভাল ফল পেয়েছে বলে দাবী করেছে।

সি. এম. ডি. এ. কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কলকাতা শহরের বিভিন্ন স্থানে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য শৌচাগার নির্মাণের একটি বিশেষ পরিকল্পনা তৈরী করা হচ্ছে।

ধোঁয়াহীন কয়লা উৎপাদনকারী ছোট ছোট সংস্থাগুলিকে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগের সহযোগিতায় আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। 'ডানকুনি কয়লা প্রকল্পে' ধোঁয়াহীন জ্বালানী তৈরী করার ব্যাপারে 'কোক ইণ্ডিয়া'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। প্রকল্পটি রূপায়িত হ'লে কলকাতা শহরে প্রায় 2 কোটি ঘনফুট জ্বালানী গ্যাস সরবরাহ করা যাবে। পরিবেশ দপ্তর এ বিষয়ে সম্ভাব্য সমস্ত রকমের সাহায্যের জন্য শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এবং সি. এম. ডি. এ. কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

উদ্ভিদ উদ্যান (বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর)

উদ্যানটি পরিচ্ছন্ন এবং মনোরম অবস্থায় রাখা আছে। গত দশ বছর যাবৎ উদ্যানের লতাপাতা সংগ্রহশালায় নতুন কোন সংযোজন হয় নি বললেই চলে। উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্র এবং গবেষকদের পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার জন্যই এই উদ্যানের সৃষ্টি। লতাপাতার সংগ্রহশালার উন্নয়ন ভেষজ সংগ্রহের উন্নয়ন এবং বাগানে বিজ্ঞান সংক্রান্ত কার্যকলাপ বহুদিন পড়ে আছে। অতি সত্বর উদ্ভিদ সমীক্ষা বিভাগের সাহায্যে কী কী করা প্রয়োজন তা স্থির করা হবে। রাজ্য পরিবেশ বিভাগ শিবপুরে অবস্থিত 'ভারতীয় উদ্ভিদ সমীক্ষালয়', এর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র হিসাবে কাজ করছে।

পশু উদ্যান (জ্যুলজিক্যাল গার্ডেন, আলিপুর বা চিড়িয়াখানা)

আলিপুর পশু উদ্যান—'বঙ্গীয় উদ্যান আইনে'র ধারা বলে একটি 'পরিচালক সমিতি' ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পশু উদ্যানগুলির অন্যতম এই উদ্যানটির দেখাশুনা করেন। বর্তমানে এই উদ্যানে আছে :—

স্তন্যপায়ী জন্তু— 290
পাখী—1796 (স্বাধীন এবং অন্য দেশ থেকে উড়ে আসা পাখী বাদে)
সরীসৃপ— 112
মাছ—1600

1972 সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন চালু হওয়ার ফলে উদ্যান কর্তৃপক্ষের অন্যান্য দেশ থেকে নতুন জীবজন্তু আনা বা কিছু কিছু জনপ্রিয় জীবজন্তু মারা গেলে তার বদলি আনা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া ভারতের অন্যান্য পশুশালায়ও বিলি করার মত যথেষ্ট সংখ্যক জন্তু নাই।

রাজ্য সরকার পশু উদ্যানের জন্য 1980-81 সালে 9.9 লক্ষ টাকা, 81-82 সালে 13.92 লক্ষ টাকা এবং 82-83 সালে 10.04 লক্ষ টাকা অনুদান হিসাবে মঞ্জুর করেছে। এ ছাড়াও উদ্যানের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উক্ত বৎসরগুলিতে যথাক্রমে 12 লক্ষ টাকা, 5.04 লক্ষ টাকা এবং 10 লক্ষ টাকা সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান উদ্যানে জায়গা অকুলান হওয়ায় 'পরিবেশ বিভাগ' শহরের কাছাকাছি নতুন পশু উদ্যান করার উপযুক্ত জায়গার সন্ধান করছে। মোটামুটিভাবে তিনটি জায়গা বাছা হয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞকে উক্ত জায়গাগুলি পরিদর্শন করে সবদিক থেকে উপযুক্ত জায়গা কোনটি তা জানাতে বলা হয়েছে।

হিমালয়ান জ্যুলজিকাল পার্ক

দার্জিলিং-এ অবস্থিত 'পদ্মজা নাইডু পশু উদ্যান'টি পরিচালনার ভার একটি 'সমিতির' উপর, যার কার্যকরী সমিতির সভাপতি রাজ্যের মুখ্যসচিব। উদ্যানটি পরিচালনার খরচ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যৌথভাবে দিয়ে থাকে। স্বাভাবিক কাজকর্ম ছাড়াও এই উদ্যানে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির জীবজন্তুর সংরক্ষণের জন্য বিশেষ গবেষণা চালান হচ্ছে। 1981-82 সালে এ রকম সাতটি গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে মাত্র একটির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া গেছে। এটা মনে রাখতে হবে যে, শুধু পশুশালা নয়, উদ্যানটির একটি প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদের বংশ বিস্তার এবং হিমালয় সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চল ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রাণীকূলের সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ও প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া।

এই উদ্যানটি এবং হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট,—লেক্-এর প্রাকৃতিক জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। এই দুটি প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং হিমালয় অঞ্চল সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণার একটি উৎকৃষ্ট স্থান হিসাবে গণ্য হতে পারে।

'পরিবেশ বিভাগ' বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদির জন্য অর্থের যোগানের ব্যবস্থা, রাজ্যের দুটি পশু উদ্যানের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান ও অন্যান্য কাজের মধ্যে যোগসূত্রের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করবে।

লেখক পরিচিতি

ডঃ রুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি.এইচ্.ডি., সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক, অজৈব রসায়নে জটিল যৌগের বিক্রিয়া কৌশল ও পদ্ধতির উপর বর্তমানে গবেষণারত। পর্ষদ প্রকাশিত 'আমাদের বিজ্ঞান জগৎ' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক।

শ্রীরবীন চক্রবর্তী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগে কর্মরত। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী" পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, গণবিজ্ঞান আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী।

ডঃ দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী

ডঃ দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, এম্.এস্.সি., বি.এড., পি.এইচ্.ডি, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের পদার্থবিদ্যার সহকারী অধ্যক্ষ, পর্ষদ প্রকাশিত নিয়তাপমাত্রা বইটির লেখক।

ডঃ তারকমোহন দাস, এম্.এস্.সি., পি.এইচ্.ডি. (লণ্ডন), কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের অধ্যাপক এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইফ সায়েন্স সেন্টারের কনভেনার, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনার জন্যে নরসিংহদাস পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয় হ'ল উদ্ভিদের শারীরতত্ত্ব এবং পরিবেশ দূষণ।

ডঃ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, পি.এইচ্.ডি., ডি.এস্.সি., এফ্.এন্.এস্.সি., এফ্.আর.এস্.সি. (লণ্ডন), কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক এবং বর্তমানে বিভাগের প্রধান ও ইণ্ডিয়ান কেমিকেল সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট, অজৈব রসায়নে জটিল যৌগের বিক্রিয়া কৌশল পদ্ধতির ওপর মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন।

ডঃ মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালরের ইনঅরগানিক কেমেস্ট্রী বিভাগের রিডার।

ডঃ সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, পি.এইচ.ডি., ডি.আই.সি., স্পেশাল অফিসার, কৃষি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ডঃ অরবিন্দ দাশ, এম্.এস্.সি., এম্.এস্., পি.এইচ.ডি., বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের লেকচারার। গবেষণার বিষয় বৈশ্লেষিক রসায়ন ও পরিবেশ দূষণ ; বাংলা ভাষায় স্নাতক ও বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের লেখক।

ডঃ অসিত কুমার মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞানের রীডার।

শ্রীবিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়, আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত এবং আপেক্ষিকতাবাদ সংক্রান্ত একটি সমস্যা নিয়ে গবেষণারত, বিভিন্ন পত্র পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

অধ্যাপক রামনারায়ণ চক্রবর্তী, পি.আর.এস্., ডি.এস্.সি., এফ্.আর.এস.সি., এফ্.এ.এস্., এফ্.এন্.এ., কোলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের রসায়নের অধ্যাপক (১৯৪৮-৬৮), ও পরে ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব্ এক্সপেরিমণ্টাল মেডিসিনের অধিকর্তা (১৯৬৮-৭৬) ছিলেন। বর্তমানে ইনি দেজ মেডিক্যাল ষ্টোর্স (ম্যানুফাকচারিং) লিমিটেডের গবেষণা ও প্রগতির অধিকর্তা। (১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি এঁকে 'পদ্মভূষণ' প্রদান করেন)।

ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য, এম্. বি. বি. এস., পি. এইচ. ডি., কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব মেডিসিনে অণুজীববিদ্যার অধ্যাপক, পর্ষদ প্রকাশিত রোগ ও তার প্রতিষেধ বইটির লেখক ডাঃ ভট্টাচার্য পর্ষদ প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকা "আমাদের বিজ্ঞান জগৎ"-এও জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রবন্ধ লিখে থাকেন।

শ্রীঅসীম বর্ধন, এম্.এড.এস্.এ., পি.এইচ্.ডি.,

ডঃ দিলীপ বসু, ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রীসংকর্ষণ রায়, ভূ-বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞান লেখক, ভারতীয় ভূ-বৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ বিভাগে বর্তমানে কর্মরত। মাটির ওপরে গাছপালার সমাবেশের মধ্যে মাটির তলার খনিজ ভাণ্ডারের প্রতিফলন নিয়ে গবেষণা করেছেন, পর্ষদ প্রকাশিত ভূ-তাত্ত্বিকের চোখে বিশ্ব প্রকৃতি পুস্তকের লেখক।

শ্রীধ্রুবজ্যোতি ঘোষ, সি.এম.ডব্লু.এস্.এ-র অ্যাসিস্টাণ্ট চীফ এঞ্জিনীয়ার এবং কনসালটাণ্ট ইকোলোজিস্ট।

শ্রীমতী কণিকা সরকার, সি.এম্.ডি.এ.

শ্রীঅমিতাভ রায়, শিক্ষায় ও বৃত্তিতে ইলেকৃট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। বর্তমানে সি ই এস সি-র লোড ম্যানেজম্যাণ্ট-এর কাজে নিযুক্ত।

ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব উপাচার্য, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক অরুণ কুমার শর্মা, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালরের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স এ্যাকাডেমীর সভাপতি।

শ্রীঅনীশ দেব, এম্.টেক্ (ফলিত পদার্থবিদ্যা)। বর্তমানে কোলকাতা বিজ্ঞান কলেজের ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগে গবেষণারত।

ডাঃ মনীশ প্রধান, এম্.ডি., টি.ডি.ডি., এফ.সি.সি.পি., আর.জি.কর মেডিকেল কলেজের রীডার ও বক্ষ বিভাগের প্রধান চিকিৎসক। পর্ষদের 'হাঁপানি রোগ' বইটির লেখক।

ডঃ গোরাচাঁদ কুণ্ডু, এম্.এস্.সি., পি.এইচ.ডি., (কলিকাতা) ; এম.বি., পি.এস্.এস্ (লণ্ডন); এম্.আই.সি.সি.পি. (হঙকঙ) ; এম.আই.এস্.পি. (ইউ. এস্. এ.) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনোবৈজ্ঞানিক।

ডাঃ প্রদীপকুমার দাস, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সিনিয়র হাউস ফিজিসিয়ান, বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন।

পর্ষদ প্রকাশিত দর্শন, সংস্থ

১। চার্বাক দর্শন
[Philosophy of Charbaka]
দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

২। নন্দনতত্ত্ব
[Aesthetics]
সুধীরকুমার নন্দী

৩। ফ্রয়েড
(জীবনী ঃ মনঃসমীক্ষণ)
[Freud]
[Life : Psycho analysis]
সুনীলকুমার সরকার

৪। ন্যায় দর্শন
[Nyaya Darsan I Vol.]
(১ম খণ্ড)
ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

৫। বিধেয় ন্যায়
[Predicate Logic]
ইন্দ্রকুমার রায়

৬। ন্যায় দর্শন
[Nyaya Darsan III Vol.]
(৩য় খণ্ড)
ফণিভূষণ তর্কবাগিশ

৭। ব্যাপ্তি-পঞ্চক
[Vyapti Panchaka]
রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

৮। সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শন
[Philosophy of Sankhya Pa
কনকপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়

৯। অন্নং ভট্টের তর্কসংগ্রহ
[A Premier Nyāya Vaisesi
Philosophy by Annam Bhat
সবিতা মিশ্র

১০। পূর্বমীমাংসা দর্শন
[Purvamimansa Darsana]
সুখময় ভট্টাচার্য

ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য, এম্. বি. বি. এস., পি. এইচ. ডি.
অব মেডিসিনে অণুজীববিদ্যার অধ্যাপক, পর্ষদ প্রকা
লেখক ডাঃ ভট্টাচার্য পর্ষদ প্রকাশিত বিজ্ঞান প
জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রবন্ধ লিখে থাকেন।

শ্রীঅসীম বর্ধন, এম্.এড.এস্.এ., পি.এইচ্.ডি.,

ডঃ দিলীপ বসু, ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ব

শ্রীসংকর্ষণ রায়, ভূ-বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞান লেখক, ভার
বর্তমানে কর্মরত। মাটির ওপরে গাছপালার সমা
ভাণ্ডারের প্রতিফলন নিয়ে গবেষণা করেছেন, পর্ষদ
বিশ্ব প্রকৃতি পুস্তকের লেখক।

শ্রীধ্রুবজ্যোতি ঘোষ, সি.এম.ডব্ল্যু.এস্.এ-র এ্যাসিস্টাণ্ট চীফ
ইকোলোজিষ্ট।

শ্রীমতী কণিকা সরকার, সি.এম্.ডি.এ.

শ্রীঅমিতাভ রায়, শিক্ষায় ও বৃত্তিতে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়
লোড ম্যানেজম্যাণ্ট-এর কাজে নিযুক্ত।

ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব উপাচার্য, কোলকাত

অধ্যাপক অরুণ কুমার শর্মা, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ
ন্যাশনাল সায়েন্স এ্যাকাডেমীর সভাপতি।

শ্রীঅনীশ দেব, এম্.টেক্ (ফলিত পদার্থবিদ্যা)। বর্তমানে কো
পদার্থবিদ্যা বিভাগে গবেষণারত।

ডাঃ মনীশ প্রধান, এম্.ডি., টি.ডি.ডি., এফ.সি.সি.পি., আর
রীডার ও বক্ষ বিভাগের প্রধান চিকিৎসক। পর্ষদের 'হাঁপ

ডঃ গোরাচাঁদ কুণ্ডু, এম্.এস্.সি., পি.এইচ.ডি., (কলিকাতা);
এম্.আই.সি.সি.পি. (হঙকঙ); এম.আই.এস্.পি. (
খ্যাতিসম্পন্ন মনোবৈজ্ঞানিক।

ডাঃ প্রদীপকুমার দাস, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হ
ফিজিসিয়ান, বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রব

t. 14.6.83
Six only
4
Three only
Begal State Book Board, Arya Mansion (8th
d Scheme of production of books and litera
y of Education and Social Welfare (Departm
00 067